যত দূরে চাই

শক্তিপদ রাজগুরু

ডি.এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট · কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ :
ভাদ্র ঝুলন, ১৩৬৭ সাল

৪২, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬ হইতে শ্রীগোপাল দাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীমুদ্রণালয়, ১২, বিনোদ সাহা লেন, কলিকাতা—৬ হইতে শ্রীসরোজ কুমার রায় দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ

পরমশ্রদ্ধেয়

শ্রীমনোজ বসু

অগ্রজপ্রতিমেষু

এই লেখকের

অন্তরে অন্তরে, সন্ধ্যাসাগর কুলে, সোমনাথ, বর্ণান্তর, বাসাংসি জীর্ণানী, মণিবেগম, কুমারী মন, অনেকবসন্ত একটি ভ্রমর, মেঘে ঢাকা তারা, যদি জানতেম, জনম অবধি, রূপবদল, অন্য কোনখানে, মুক্তি-স্নান, সামনে সাগর, জাগৃহী, চেনামুখ, কেউ ফেরে নাই, নীল সমুদ্র সবুজ দেশ, যৌবনের নায়িকা, রঙ্গবল্লরী ইত্যাদি।

নাটক : জীবনকাহিনী, মসনদ, প্রজাপতি, প্যালারাম নিরুদ্দেশ, মেঘে ঢাকা তারা, মণিবেগম।

জমজমাট সংসার।

দে গাঁয়ের গোঁসাই বাড়ির নাম ডাক চারিদিকে। দীর্ঘ দিন ধরে তাঁরা এখানে বাস বেঁধেছেন, বেশ কয়েক পুরুষ আগে থেকেই। কর্তারা বলেন—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরবর্তী কালেই তাঁরা এসেছিলেন এখানে। বন কেটে বাস পত্তন করেন সেই আমল থেকে।

এ নিয়ে একটা কাহিনীও প্রচলিত আছে।

মল্লভূমের রাজা তখন বীর হাম্বীর। বিষ্ণুপুর থেকে সবে এসে তিনি নতুন রাজধানী করেছিলেন এখানে। হাম্বির হাটি নামে এখনও সেই গ্রাম রয়ে গেছে। চারিদিকে তার শালবন। ওই গহন বনের বুক চিরে রাস্তাটা চলে গেছে। ওই ছিল নীলাচল থেকে বৃন্দাবনধাম তীর্থযাত্রীদের পথ। এই পথেই শকট বোঝাই হয়ে আসছিল বৃন্দাবন থেকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সারা জীবনের সাধনায় রচিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি।

ডাকাতরা হানা দিল সেই শকটে। কাঠের বাক্সের মধ্যে কি মহামূল্য সম্পদ আছে মনে করে তারা সেটাকে লুঠ করে নিয়ে চলে গেল।

সংবাদ পৌঁছল চারিদিকে। বৃন্দাবনধামেও।

রাজা হাম্বীরের কাছেও এল ভক্ত বৈষ্ণবদের অনেকেই, সেটাকে উদ্ধার করার প্রার্থনা নিয়ে।

বহু চেষ্টায় বহু অনুসন্ধানের পর সেই পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেছিলেন তিনি। তার পাঠ শুনে রাজা হাম্বীরও মন্ত্র-মুগ্ধ হয়ে নিজেই বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিলেন।

তাঁরই আগ্রহে এই মল্লভূম অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সেই যুগ থেকেই অনেক বৈষ্ণব সজ্জন রাজার আগ্রহে আর তাঁর অনুগ্রহ লাভ করে এই অঞ্চলে এসে বসবাস সুরু করলেন।

গোঁসাই প্রভুদের পূর্ব পুরুষরাও এসেছিলেন সেই সময়। আজ থেকে কয়েক শতাব্দী আগে। রাজ অনুগ্রহে তাঁরা এখানে বাস-স্থাপন করেন। দেবোত্তর—ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি, মহাল-পরগনাও পেলেন।

আজও তাই দে গাঁয়ের একটা অঞ্চলকে গোঁসাইপুর বলা হয়। বিরাট কয়েকটা দীঘি—উর্বর শস্য শ্যামলা ক্ষেত, বাগান—তার ফাঁকে ফাঁকে মাথা তুলেছে মন্দিরচূড়া।

সন্ধ্যার সময় ফিকে তারাজ্বলা অন্ধকারে ভেসে আসে খোল-কত্তাল এর শব্দ, শঙ্খ ঘণ্টার সুর।

নাটমন্দিরে রাধামাধব বিগ্রহের সামনে আরতি হচ্ছে।

যত্নু গোঁসাই নাম গানে বিভোর। কপালে চন্দনের ছাপ, গলায় দুলছে সদ্য গাঁথা যূথির মালা—নধর শরীর। দুচোখ বুজে নাম গান করছেন বড় গোঁসাই যত্নুগোপাল-এ বাড়ির কর্তা।

বয়স হয়েছে তবু এখনও দেহে মনে বয়সের সেই ছাপ নিবিড় হয়ে জেঁকে বসেনি। আরও অনেকেই গলা দিয়েছে নাম গানে।

ওপাশে থামের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছেলেটি। এ বাড়ির আরও পাঁচজনের মত ভোগালো নিটোল দেহ তার নয়। শীর্ণ, নাকটা লম্বা, দুটো চোখ জ্বল জ্বল করে জ্বলছে।

—কই রে, নাম গান কর প্রাণগোপাল?

প্রাণ সরে গেল। মনে মনে সে বিরক্ত হয়ে উঠেছে। জানে ভোগমন্দিরে থরে থরে সাজানো ওই গাওয়া ঘিয়ের লুচি-মালপোয়া-সন্দেশ-পরমান্ন সবই যাবে তাদের বাড়িতেই।

এই ভক্ত দর্শকদের কাছে তার ছিটে ফোঁটাও আসবে না। মাত্র কয়েকটা বাতাসা বিলি করা হবে।

এনিয়ে প্রাণ শুধিয়েছিল বাবাকে।

—এসব বিলি করা হয় না কেন? প্রসাদ—

হাসেন যদুগোপাল। কথা চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন তিনি।

—বুঝলে প্রাণ, ঠাকুরের মহাপ্রসাদ পাবার ভাগ্য কি সকলের হয়! এ বংশের এই প্রথা।

—কিন্তু দিন বদলেছে,

ছেলের কথায় যদুগোপাল চমকে ওঠেন। তবু তার শান্ত মুখে রাগ রোষ কোন কিছুরই ছায়া পড়ে না। অন্তরের সব ভাবকেই ভণ্ডামির মুখোস দিয়ে ঢেকে রাখতে পারেন তিনি।

শুধু হাসেন।

—তাই নাকি! স্কুলে বোধহয় এইসব কথা শেখানো হয়? কোন্ মাষ্টার শেখান?

যদুগোপাল চুপ করে থাকে।

এমন কথা ইতিপূর্বে তাঁর কানে এসেছে। স্কুলের ব্যাপারটা তাঁর পছন্দ হয় না। বিশেষ করে ওই ইংরাজী পড়াটা। গোঁসাইদের ঘর, সংস্কৃত কাব্য ব্যাকরণ ন্যায় এসব নিয়ে থাকাই ভালো।

স্কুলে ওই এক বেঞ্চে সকলের সঙ্গে বসাটাকেও তিনি সমর্থন করেন না, বিশেষ করে ইতিজাতের ছেলেদের সঙ্গে মেশাটাও তাঁর কাছে ভালো ঠেকে না।

তাই প্রাণ কথাটা শোনে পরদিনই বাবার কাছে।

—স্কুলে আর যাবে না তুমি, টোলেই পড়বে। কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতি-শাস্ত্র। হিন্দুধর্মের মূলকথাই জানা দরকার। ম্লেচ্ছ শিক্ষার কোন প্রয়োজন নেই। মহাপ্রভুর করুণায় তোমাকে চাকরী করতে হবে না কোনদিনই।

প্রাণগোপাল সামনের বার এন্ট্রাস পরীক্ষা দেবে। দশম

শ্রেণীতে উঠবে এইবার। তার কিশোর মনে অনেক আশাই ছিল। বাবার কথায় সে সব কেন্ শূন্যে মিলিয়ে যায়।

প্রাণগোপাল সেইটা সইতে পারবে না। ও দেখেছে এ বাড়ির ওই প্রেম ভক্তির অতলে জমে ওঠা লোভ আর পাপটাকে।

মা ছেলেবেলাতেই মারা যায়। মায়ের মৃত্যু নিয়ে অনেক কাহিনী সে শুনেছে বিন্দী বুড়ির কাছে।

সে সব কথা কাউকে জানানো যায় না। পোড়া আংরার জ্বালার মত সেই কঠিন সত্য ঘটনাগুলো প্রাণগোপালের মনে ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। এতদিন তবু সয়েছিল সে, মনে মনে এবাড়ির সবকিছুর উপর সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল।

তাই অসীমবাবুর কথাগুলো ওর মনে গভীর ভাবে ছায়াপাত করেছিল।

নতুনদিন আসছে। মানুষ আর চুপ করে সবকিছু সইবে না, অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে, দরকার হলে সব জমা পাপ আর স্বার্থকে নিষ্ঠুর আঘাতে চুরমার করে দিয়ে নিজেই নতুন করে সমাজ ব্যবস্থা গড়বে।

বিদেশী ইংরেজের শাসনও তারা মানবে না। স্বাধীন একদিন হবেই। বলিষ্ঠ ওই মাষ্টার মশাইকে প্রাণগোপাল মনে মনে শ্রদ্ধা করে। নতুন ভাবে কথা বলেন তিনি।

বাবার ওখান থেকে বের হয়ে এল প্রাণগোপাল। বাড়ির একদিকে কাছারি বাড়ি। ওরা বলে দেবোত্তর এস্টেটের খাজনাখানা। সামনে বিস্তীর্ণ পাঁচিল ঘেরা খামার বাড়ি। তখনও নতুন ধান ওঠেনি।

তবু এখানে ধানের অভাব নেই। উঠানে ধানের বড় জড়ানো বিরাট বিরাট মরাইগুলো থেকে ধান যেন ফেটে পড়ছে, খড়ের পালুইগুলো বিরাট দোচালার মত উঠে গেছে। হাজার হাজার মন ধান—কতো কাহন খড় আছে তার ঠিক নেই।

খাজনাঘর থেকে তখন যদুগোপালের হুঙ্কার ভেসে আসে। —ওকে-একটু প্রসাদ দে রে নিতাই! রাতটা প্রভুর কৃপাতেই থাকুক এখানে।

কোন গরীব প্রজা খাতক খাজনা দিতে পারেনি, তাই কাছারিতে ধরে এনে শাসাচ্ছে তাকে। যদুগোপাল বলেন।

—ওরে অঙ্গসেবাও করবি বাবা। যাও হে গতিলাল, সবই প্রভুর কৃপা।

এই কৃপার অর্থ জানে প্রাণগোপাল। কাছারির ওদিকে বাগানের অন্ধকারে কয়েকটা বদ্ধঘর আছে, কোন অবাধ্য প্রজাকে সেই ঘরগুলোতে আটকে রাখে ওরা, নির্দয়ভাবে মারধোর করে, ওদের ওই আর্ত চীৎকারে লুকিয়ে লুকিয়ে অনেকদিন শুনেছে প্রাণগোপাল।

সেই নিষ্ঠুর অত্যাচারকেই এরা মধুর নাম দিয়েছে কৃপালাভ করা, অঙ্গসেবা ইত্যাদি। বৈষ্ণবী বিনয়টুকু এদের শয়তানির মন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—জয় নিতাই, জয় গৌর! তোমার ওয়াশীল নেই কেন হে? দেবতা কি উপোস দেবেন তোমাদের জন্যে?

আবার কাকে নিয়ে পড়েছেন যদুগোপাল।

সরে গেল প্রাণগোপাল। নিজের কথাটা মনে পড়ে! তারও সবকিছু কেড়ে নিতে চায় ওই ধূর্ত লোকটা। তার জীবনের সব আশাকে ব্যর্থ করে দেবার চক্রান্ত করেছে সে।

সন্ধ্যা তখনও হয়নি।

গ্রামের প্রান্তে গেরুয়া প্রান্তরে বৈকালের পড়ন্ত রোদ মিষ্টি সোনালী আবেশ এনেছে। কয়েকখানা গ্রামের মধ্যে নির্জন ঢালু এই প্রান্তর। মাঝে মাঝে দু চারটে তালগাছ নির্জন শুকনো বনগড়ানি খালের ধারে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে।

ওপাশে গোঁসাই প্রভুদের আমবাগান, কাঁঠাল গাছগুলো ঘন কালো পাতার আবরণে কি আঁধার রহস্যের সৃষ্টি করেছে। পাখপাখালিগুলো কলরব করে ওই রিক্ত ডাঙ্গার পাশে ঘন সবুজের মধ্যে।

ওই শালবন থেকে ডাঙ্গাটা বের হয়ে এসেছে। ওদিকে ঘন বন। গোঁসাইদের এলাকায় এই বন। তারা গাছপালা কাটতে দেন না। বিস্তীর্ণ এলাকায় চড়াই উৎরাই এর বুকে সতেজ শাল গাছগুলো মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

এই অরণ্যসীমার ধারেই গড়ে উঠেছে স্কুল, বোর্ডিং-এর লম্বা খড়ের চাল দেওয়া ঘরগুলো। টানা লম্বা পাঁচীলগুলোয় সাদা খড়িমাটির প্রলেপ লাগানো, সামনে কয়েকটা আম, কাঠাল, কৃষ্ণচূড়ার গাছ।

ওপাশে বাউরী বাগ্দীদের নুইয়ে পড়া ঝুপড়িগুলো থেকে ধোঁয়া উঠছে। দিনের কাজ থেকে ফিরে তারা এইবার সিনান ভাতের যোগাড় করে। জানে প্রাণগোপাল গোঁসাই প্রভুদের বাঁধ কাটা হচ্ছে ডাঙ্গার ওদিকে। সেই শক্ত কঠিন পাথুরে মাটির বুকে গাঁইতি দিয়ে মাটি পাথর আর কাঁকর তুলেছে তারা গলদঘর্ম হয়ে। পেয়েছে তিন সের করে ধান--দিনান্তের ওই মজুরি।

ধানের মণ মাত্র পাঁচসিকে। তাদের মজুরি কতটুকু সে হিসাবও কষে নেয় প্রাণগোপাল।

কিন্তু! তার!... তার জন্য ভবিষ্যতে সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে। তাকেও ওই চক্রে পড়ে মালা ধারণ করতে হবে, কপালে লম্বা তিলক ছাপ এঁকে নামাবলী গায়ে অদৃশ্য কোন প্রভুর বিরহে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হবে, আর অন্তরের শয়তানির ছুরিতে বালি শান দিতে থাকবে কাদের বলিদান দেবার জন্য।

ওরা প্রেমিক ঠাকুরের চ্যালা!.. ভাবতেও গা জ্বালা করে প্রাণগোপালের।

বাঁশ বনের মধ্যে ঘেরা একটু ঠাঁই। তারই মাঝে মাটি কুপিয়ে নরম করে সেখানে গড়ে উঠেছে কুস্তির আসর। ওপাশের দিকে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, সেখানে লাঠি খেলার শব্দ উঠছে ঠক্ ঠক্ ঠকাস্!

কয়েক প্যারালাল বারও রয়েছে, সেখানে দুহাতে ভর দিয়ে সারা দেহটাকে তুলে ব্যায়াম করছে ছেলেরা।

--হল না শুভো! দ্যাখ!

অসীমবাবু নিজেই সহজ ভাবেই প্যারালাল বারে উঠে ফিগারটা দেখিয়ে দেন।

খদ্দরের ধুতি আর হাফসার্ট পরা, মালকোচা মেরেই কাপড় পরেন তিনি। হাফসার্টের কনুই থেকে ব্যায়ামপুষ্ট হাত দুটো বের হয়ে থাকে।

প্রাণগোপালকে দেখে এগিয়ে আসেন তিনি।

—কিরে, তোর দেরী কেন?

প্রাণগোপাল জবাব দিতে পারে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ওদিকে শুভো বার থেকে নেমে এগিয়ে আসে। ওদেরই বাড়ির ওপাশেই শুভব্রতের বাড়ি।

গোঁসাইদের দৌহিত্র বংশ ওরা। শুভব্রতের পিতামহ গোঁসাইদের ন'তরফের জামাই ছিলেন। ন'তরফের পুত্রসন্তান ছিল না, একমাত্র মেয়েই সম্পত্তির ওয়ারিশান হয়, তাই শুভোর পিতামহ এইখানেই বসবাস করেন।

ক্রমশঃ তার ছেলে বিনয়বাবুও মানুষ হয়ে ওঠেন। গোঁসাই বাড়ির দৌহিত্র ওই বিনয়বাবু লেখাপড়া শিখেছিলেন। এ অঞ্চলে তখন স্কুল ছিল না, হাই স্কুল বলতে পাঁচ মাইল দূরে সোনামুখী না হয় মালিয়াড়া, সেখানের স্কুলে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন বিনয়বাবু;

কলেজেও পড়েন, মিশনারী কলেজে। সেই সময় স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়েছে। বিনয়বাবু তাদের সঙ্গে মিশে যান। পুলিশের খাতায় নাম ওঠে। দেখেশুনে তাঁর বাবা ছেলেকে এনে কারবারে বসিয়ে দেন। টুকটাক বাসন তৈরীর কারখানা। ক্রমশঃ মাল তৈরী করানো, কেনাবেচা করায় ধীরে ধীরে রপ্ত হয়ে ওঠেন বিনয়বাবু। কারবারও বাড়তে থাকে।

শুভব্রত ওই বিনয়বাবুর ছেলে।

শুভো আজ ওদিকে গেছল প্রাণগোপালের সন্ধানে। ওখানে গিয়ে কাছারি বাড়ির বাইরে থেকে ওর বাবার কথাগুলো শুনেছে।

শুভব্রত বলে।

—ওর বাবা ওকে স্কুলে আসতে নিষেধ করেছেন স্যার!

—কেন?

অবাক হন অসীমবাবু। প্রাণগোপাল পড়াশোনায় ভালো। তাছাড়া এই অঞ্চলে এসে দেখেছেন অসীমবাবু মানুষের নগ্ন অভাব আর দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর ছবিটা। মন্বন্তর এখানে চিরসঙ্গী। কঠিন রুক্ষমৃত্তিকা, ফসল এখানে কম ফলে। তারপর আছে জমিদার-জোতদারদের অত্যাচার। চাষীদের দুঃখের শেষ নেই। যা হয় সবই তাদের খামারে তুলে দিয়ে ঋণের খাতায় কিছুমাত্র ওয়াশীল দিয়ে আবার ধার করে ধান নিয়ে আসে শুধু মাত্র টিকে থাকার জন্য আর ওই ধার শোধ দেবার জন্য। অবশ্য সেই ধার জীবনেও কোনদিন শোধ হয় না।

তাদের ঘরের ছেলেদের দেখেছেন—বুদ্ধি আছে। পড়া শোনায় আগ্রহ আছে। দু'চার বছর কোন রকমে পড়ার খরচ যুগিয়ে আর পারে না। মাঠে এক জন মজুরের রোজকার তখন তাদের সংসারে কিছু সাশ্রয় আনে। তারা তাই অভাবের চাপে পড়া ছেড়ে দিয়ে দিনমজুরের সংখ্যা বাড়ায় মাত্র।

এমনি করে অনেক ছেলেকেই মাঝপথে থেমে যেতে দেখেছেন।

কিন্তু প্রাণগোপাল তাদের দলের নয়। ওরা অবস্থাপন্ন লোক জমিদারই বলা যেতে পারে। তাই তার পড়ার নিষেধ শুনে অবাক হয়েছেন অসীমবাবু। জিজ্ঞাসা করেন তিনি।

—সত্যি নাকি প্রাণগোপাল ?

প্রাণগোপাল ঘাড় নাড়ল। সেও অবাক হয়েছে এসব শুনে। শুভোই বা এই সময়ের মধ্যে এটা জানলো কি করে তা ভাবতেই পারে না সে।

অসীমবাবু শুধোন।

—কিন্তু বাবা কেন বললেন এ কথা ?

শুভব্রত সব কথা শোনেনি। তাই সঠিক জবাব দিতে পারে না সে। প্রাণগোপালের দিকে চেয়ে রইল। প্রাণগোপাল আজ মনে মনে চটে উঠেছে বাবার উপর। সে ওই বিধান মেনে নিতে পারবে না এত সহজে। তাই জবাব দেয়।

—বললেন ম্লেচ্ছদের শিক্ষা, এতে নাকি তাঁর সমর্থন নেই। বললেন – কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতি এইসব পড়তে হবে আমাদের বাড়ির টোলে। তাছাড়া—

আর যে কথাটা বাবা বলেছিলেন ওই অসীমবাবুর সম্বন্ধে সেটা সে বলতে পারে না। কোথায় তার বাধে।

অসীমবাবু ওইটুকু শুনেই বিস্মিত হয়েছেন। প্রাণগোপাল মেধাবী, তীক্ষ্নবুদ্ধি। তাদের পড়ার সামর্থ আছে। এভাবে ভবিষ্যৎ নষ্ট করার কোন অধিকার ওর বাবা ওই যদুবাবুর নেই।

অসীমবাবু বলেন।

—তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলবো আমি। না না, তুমি পড়বে। স্কুলে পড়বে পাশ করে কলেজে যাবে। এভাবে ফুরিয়ে যাবেনা তুমি। এ হতে পার না।

গ্রামেও কথাটা ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, বিনয়বাবুও শুনেছেন

কথাটা। শুভব্রতের কাছে সব কথাগুলোই শোনেন তিনি। এমনিতে ব্যস্ত মানুষ।

সামান্য ভাবে ব্যবসা শুরু করেন আগে।

কথায় বলে—স্বজন, জামাই, ভাগ্‌না, তিনজন নয় আপনা। বিনয়বাবুর বাবা পরিতোষ মুখুয্যে ছিলেন গোঁসাইদের ন'তরফের জামাই। এমনিতে নীচু থাকের বামুন ওই গোঁসাইরা, কুলীন তো দূরের কথা, বংশজ হবারও গৌরব নেই।

তাই ওরা কুলীন মুখুয্যে দেখে জামাই করে নিজের কাছেই রেখেছিলেন পরিতোষবাবুকে। এনিয়ে অবশ্য পরিতোষবাবুকে গোঁসাইদের অন্য তরফের কত্তারা দু-একটা ফোড়ন দেওয়া কথা শুনিয়েছিলেন। পরিতোষবাবু রসিক মানুষ ছিলেন, তিনি তাঁর জবাব দেননি বিশেষ, রসিকতা বলেই ধরেছিলেন।

বিনয় তখন ছোট্ট।

অবশ্য গোঁসাইদের বিশেষ করে যদুগোপাল গোঁসাইজীর উষ্মার কারণ ছিল। ওই ন'তরফের বিষয়-আশয় তিনিই গ্রাস করতেন সবকিছু। যেহেতু কাগজপত্র দলিল কড়চা সবই তার দখলে। ন' গোঁসাই ও সাতে পাঁচে থাকতেন না।

কিন্তু ফাঁক থেকে জামাই গেড়ে বসায় সেটা হ'ল না পুরোপুরি। তবু চেষ্টার ত্রুটি করেননি ওদের বঞ্চিত করার। অপমানও করেছেন এদের, বিনয়বাবুও সেই অপমান ভোলেন নি।

দুর্গাপূজার সময় গোঁসাই বাড়িতে সমারোহে পূজা হয়। অনেকেই নিমন্ত্রিত হন। বিনয়বাবুও গেছেন সেবার, তখন বিনয়বাবু সবে ব্যবসা পত্তন করেছেন।

সহর থেকে গরুর গাড়িতে করে বস্তাবন্দী হয়ে আসে ভাঙ্গা পিতল কাঁসার বাসন, দস্তার বাট। এখানের কিছু কামারদের সেই মালপত্র আর মজুরী দিয়ে নতুন বাসনপত্র তৈরী করিয়ে বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুরে চালান দেন। কিছু কিছু গামছা, বিছানার চাদর

ও তাঁতিদের দাদন দিয়ে তৈরী করান; ক্রমশঃ বাইরে এখানের জিনিসপত্রের একটা চাহিদা হচ্ছে।

তবে বাসনের ব্যবসাটাই জমেছে বেশী।

পঞ্চগ্রামের ব্রাহ্মণরা এসেছেন। এরা এই একটি দিনই এখানে পাতা পাড়েন, মায়ের প্রসাদ তাই আজ কুলিন পতিতের বিচার নেই। তবু তাঁদের আসন হবে স্বতন্ত্র।

বিনয়বাবু অন্যবারের মত উপরে ব্রাহ্মদের মধ্যে বসেছেন। পাতা হয়ে গেছে। গাওয়া ঘিয়ে ভাজা লুচি-বেগুন ভাজা-শাক ভাজা পড়েছে।

হঠাৎ যদু গোঁসাই অবাক হন।

—একি করেছো বিনয় বাবাজি?

বিনয়বাবু অবাক হন—কেন মামা!

সম্পর্কে বিনয়বাবুর মামা হন ওই যদু গোঁসাই। গোঁসাই প্রভু দুহাত যোড় করে স্মরণ করেন।

—রাধামাধব হে!

কপালে তিলক সেবা, দুই বাহু মূলে গোপীতালাও এর পীতাভ মৃত্তিকাতিলকের আভা,...যদুগোপাল বলেন।

—তা বাবাজি একটু ভুল হয়ে যাচ্ছে যে। এটা ব্রাহ্মণ সমাজের পঙতি! এখানে কর্মকার তন্তুবায়বৃত্তির লোকদের তো ঠাঁই হবে না, ওনারা আপত্তি তুলবেন। ওরে কে আছিস—বাবাজীর জন্যে ভিন্ন আসন এনে দে। আর হ্যাঁ—রূপোর থালাতেই দেবার ব্যবস্থা কর। হাজার হোক ভাগ্নে—অবশ্য আমার পিতৃদেব কুলিন দেখেই কন্যাদান করেছিলেন। অদৃষ্ট মন্দ, এক পুরুষেই সেইকুল একেবারে হুড়মুড়িয়ে ভেঙ্গে পড়ল ওই নীচে।

এত লোকের সামনে ওর ব্যবসার কথা তুলে গোঁসাই প্রভু এমনি জঘন্য মন্তব্য করতে পারেন তা ভাবেন নি বিনয়বাবু।

পঞ্চদেবতাকে আহার্য উৎসর্গ করবার জন্য গণ্ডুষের জল

নিয়েছিলে বিনয়বাবু, ওই কুটিল লোকটি সেই মুহূর্তে পঞ্চ গ্রামের ব্রাহ্মণদের সামনে এমনি ভাবে তাঁকে অপমান করেছেন। হাতের জল ফেলে দিয়ে উঠে পড়েন বিনয়বাবু, হ্যাঁ হ্যাঁ করে ওঠেন সকলেই।

বিনয়বাবু শোনান।

—ওই রূপোর বাসনে আর দরকার নেই মামাবাবু, আপনাদের ওই রূপোর থালা বাসন যেদিন এই কর্মকার বৃত্তির লোকের কাছে বিক্রী করতে হবে সেইদিন এখানে অন্ন গ্রহণ করবো— অবশ্য সেই বস্তু তখনও যদি আপনাদের ঘরে থাকে। তার আগে নয়।

বিনয়বাবু সেই অপমানের কথা ভোলেন নি আজও।

ওই অপমানই তাকে কোন দুরন্ত জ্বালার আবেগে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। আজ সেই ছোট্ট কারবার তাঁর বড় হয়ে উঠেছে। সদরেও বিরাট গুদাম দোকান করেছেন। এখানের কারখানাতেও কয়েক শো লোক কাজ করে। তাঁতের কারবারও বেড়ে চলেছে। নিজে দাদন দিয়ে কয়েকশো তাঁতিকে রকমারি তাঁত বসিয়ে দিয়েছেন। ইচ্ছে আছে যদি সুযোগ হয়, একটা মিলই করবেন।

...বিনয়বাবু শুভোর মুখে শোনেন ওই প্রাণগোপালের সম্বন্ধে কথাটা। ইতিমধ্যে ওই যদুগোপালের সঙ্গে কয়েকটা মামলাই চলছে। দু একবার ফৌজদারিও হয়ে গেছে কোন বাগানের দখল নিয়ে।

বিনয়বাবু ক্রমশঃ জিতছেন এইবার।

কারবার বাড়ছে। ফুলে উঠছেন তিনি। গোঁসাই প্রভুদের সেইদিনের কথাটা মনে পড়ে। এখনও সেই রূপার বাসনপত্র তার গুদামে আসেনি।

তবে দেখা যাক পাল্লা কোনদিকে যায়।

কি ভাবছেন বিনয়বাবু।

আকাশে বাতাসে ওঠে কারখানার বাসন পেটার শব্দ। বড় বড় শালে বিরাট মুছিতে কাঁসা গলানো হচ্ছে। কালো ধোঁয়া উঠছে চিমনি থেকে।

গোঁসাই প্রভুরা বলেন।

—গাঁ থেকে ওই ফাটা বাসনের শব্দে মা লক্ষ্মী এইবার পালাবেন।

...বিনয়বাবু এই সুযোগে বাজি মাৎ করতে চেয়েছিলেন। তাই বোধ হয় শুভব্রতকে দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিলেন ওই প্রাণগোপালকে।

...প্রাণগোপাল প্রথমে ঠিক বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা।

বিনয়বাবুর সম্বন্ধে একটা ধারণা তার ছিলই। প্রাণগোপাল দেখেছে তাঁর ধূর্ত কৌশলী বুদ্ধিটা।

ইতিমধ্যেই বিনয়বাবু প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েৎ হয়েছেন।

তাঁর হাল বদলে গেছে। সাবেকী বাড়ির বাইরে ওই গোঁসাইদের বাগানের অর্দ্ধেক দখল করে সেখানে পাঁচিল ঘিরে সুন্দর বাংলোর মত বাড়ি করেছেন, ওপাশে একটা পুকুরও আছে, তার ধারে নানা ফুল গাছ লাগিয়েছেন,...একটা রাস্তাও তৈরী করিয়েছেন ইউনিয়ন বোর্ডের পয়সায়। ওই বাগানের দখল নিয়েও অনেক মামলা হয়েছিল। কিন্তু প্রাণগোপাল দেখেছে বিনয়বাবু ওদের হারিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাইই নয় গ্রামের বৃহত্তর একটা শ্রেণী ধীরে ধীরে বিনয়বাবুর দিকে ঢলে পড়েছে।

বিনয়বাবুর ওখানেই আসেন সার্কেল অফিসার, ছোট খাটো হাকিমরা—মায় সেদিন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট খাস লাল মুখ এক সাহেবও এসেছিলেন ওর বাংলোয়, এখানের বনে শিকার করতে এসে ওরই বাংলোয় ডেরা গেড়েছিলেন।

গোঁসাই প্রভুরা বিশেষ করে যদুগোপাল গোঁসাই ভেট পাঠিয়েছিলেন ঘি-সন্দেশ-দই।

তবে তুলনায় বিনয়বাবুর মাংস আর পানীয়ের প্রয়োজন বেশী ছিল সাহেবের। ওগুলো শেষকরে সঙ্গী চাকর চাপরাশির দল। সাহেব নিজে সে সব ছোননি।

কথাটা গোঁসাই এর কানেও উঠেছিল। যদু গোঁসাই গর্জন করেছিলেন—মেলেচ্ছ যবন আর কাকে বলে ?

বিনয়বাবু দাবা খেলার প্রতি দানেই যেন কিস্তীর আয়োজন করে চলেছেন। যদু গোঁসাই শুধু সামলে চলেছেন মাত্র কোনমতে। কথাটা ভাবতেও গা জ্বালা করে তার।

বৈষ্ণবী বিনয়ের আড়ালে চাপাপড়া হিংস্র জানোয়ারটা যেন জেগে উঠবে এইবার। তবু তাকে চেপেই রেখেছেন যদুগোপাল।

এই বিনয়বাবুই ডেকেছেন প্রাণগোপালকে।

এ বাড়ির হালচালই আলাদা তাদের থেকে। প্রাণগোপাল দেখছে ওর বাইরের বাড়ির ঘর খানাকে। ওপাশে কারখানার অপিসমত লম্বা খড়ের চালা, ওটায় মালপত্র থাকে। বিরাট গুদামে মালপত্র রাখা হয়। কারখানার কিছুটা এখানে রয়েছে।

বাংলোর একটু দূরে ওসব। বাংলোর এখানের পরিবেশ আলাদা। ফুলবাগান করেছেন বিনয়বাবু। নানা মরশুমী ফুলের চারা লাগানো হয়েছে। রঙ্গীণ ফুলও ফুটেছে। লাল মাটিকে ওরা কুপিয়ে সার দিয়ে উর্বর করে তুলেছে। গোলাপ ফুটেছে, লাল হলদে-গোলাপফুলে ছেয়ে গেছে বাগানটা।

বিনয়বাবু শুধোন প্রাণগোপালকে—কেমন দেখছো ফুলগুলো ?

প্রাণগোপাল ওর দিকে চাইল। ও জানে এই বিরাট চৌহদ্দী ছিল তাদের বাগানের মধ্যে। জোর করে দখল নিয়েছেন বিনয়বাবু। গোঁসাইদের পাশে এইবার আর একটি গাছও মাথা তুলছে ধীরে ধীরে। গোঁসাই বংশ এখন বনস্পতি—হয়তো বা বৃদ্ধ বনস্পতিতে পরিণত হতে চলেছে। তবু তার জাঁক-জমক-নামডাক আছে। অনেক ডালেই ওর ঘুণ ধরেছে। কোনটা বা ভেঙ্গে

পড়েছে। কোনটার ঝুরিই অন্য এক বিরাট মহীরুহে পরিণত হতে চলেছে। হয়তো তখন মূল কাণ্ডটার কোন দামই থাকবেনা।

বিনয়বাবুকে দেখে মনে হয় ওর মনের সেই পাটোয়ারী বুদ্ধিটাই তাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

বাইরের ঘরখানায় চেয়ার পাতা। এটা সাহেব সুবোদের জন্যে। দেওয়ালে ঝুলছে কিং এডোয়ার্ড ··মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ছবি।

দিল্লির দরবারের একটা বড় ছবি টাঙ্গানো. ফুলদানিতে বাগানের কয়েকটা গোলাপ সিজন ফ্লাউয়ার, টেবিলটা দামী বনাতে মোড়া। ওই চেয়ার গুলো সবুজ গদি আঁটা।

এ ঘরটার রূপই আলাদা।

—বসো।

প্রাণগোপাল সঠিক অনুমান করতে পারেনি বিনয়বাবু কেন তাকে ডেকেছেন। এই পরিবেশের মধ্যে এসেও প্রাণগোপাল তার মনের এই ঋজুতা হারায় নি। ওটা বোধহয় তার রক্তের ধারাতেই মিশে আছে। কাউকে সহজেই সে আপন করে নিতে পারে না, নিজের মনের সেই গঠনটা তাকে ভেবে চিন্তে নিয়ে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহায্য করে।

—চা খাবে ?

প্রাণগোপাল বিনয়বাবুর কথায় বলে।

—চা আমি খাই না!

হাসছেন বিনয়বাবু। ওই ছেলেটির কণ্ঠস্বরে কি যেন কাঠিন্য আছে। চুলগুলো ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মত সামনের দিকে আঁচড়ানো, সুন্দর টকটকে গায়ের রং, গোঁসাই বাড়ির ওইটাই বিশেষত্ব।

বিনয়বাবু আড়ালে বলেন রাঙ্গা মূলোর ঝাড়। বিনয়বাবু একটু যেন ঘা খেয়েছেন ওর প্রথম জবাবেই। তবু বলেন।

—ওসব এইবার চলছে হে। বিশুদ্ধ পানীয়। যাক, যার জন্য ডেকেছিলাম তাই বলি।

বিনয়বাবু ধীর কণ্ঠে কথাটা পাড়েন। ওর বাবার সেই কথাটাই। বিনয়বাবু কারবারী মানুষ। কথা বলতে জানেন। প্রাণগোপাল তাঁর ও আত্মীয় স্নেহভাজন পুত্রতুল্য।

প্রাণগোপাল কথাটা শুনে চমকে ওঠে। বিনয়বাবু যে তাঁকে এত ভালবাসেন এ খবর তার জানা ছিল না। তাই সেই তথ্যটা জেনে সে অবাক হয়েছে।

বিনয়বাবু বলেন।—তুমি কৃতী ছাত্র। সদর সহরে আমার একটা বাড়ি আছে। থাকা খাওয়ার কোন অসুবিধা হবে না। যদি এখানে মামাবাবু তোমাকে পড়াতে না চান—তুমি স্বচ্ছন্দে ওখানে থাকতে পারো। আদর্শের জন্য যে মাথা তুলে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে আমি চিরকাল তাকে শ্রদ্ধা করি—যথাসাধ্য সাহায্যও করি।

প্রাণগোপাল জানে তাদের দুই পরিবারের মধ্যে নীরব সেই সংঘাতের কথা! দুটো ভিন্ন আদর্শের লোক ওরা। বিনয়বাবুর লোভী স্বার্থপর নিষ্ঠুর সত্তাটাকে সে-ও দেখেছে অনেকবার। আজ তার মুখে এই কথা শুনে প্রাণগোপাল উঠে দাঁড়ায়।

— তাহলে পরে দেখা করো, তুমিও ভাবো এ নিয়ে।

প্রাণগোপাল জবাব দেয়।

—আমার পক্ষে এই সাহায্য নেওয়া সম্ভব নয়।

ওর কঠিন স্থির কণ্ঠস্বর শুনে অবাক হন বিনয়বাবু।

—কেন?

প্রাণগোপাল জবাব দেয়।

—আমাদের সবকিছুই আপনি কিনতে চান—হয়তো ছিনিয়ে নিতে চান, মায় রূপো কাঁসার বাসন পত্র অবধি। এই আপনার শপথ। এটি কি তারই একটা চাল?

—প্রাণগোপাল? রেগে উঠছেন বিনয়বাবু! দুচোখ দপ্ করে জ্বলে ওঠে। ওই ছেলেটাও যে তাঁর মনের গোপন সেই সংবাদটা জেনে ফেলবে তা ভাবতেও পারেন নি বিনয়বাবু।

প্রাণগোপাল ও দেখেছে লোকটাকে।

অযাচিতভাবে এই উপকার করার স্পৃহাতেই তার সন্দেহ হয়েছিল।

প্রাণগোপাল বলে।

—আমাকে ভুল বুঝবেন না। এই সাহায্য আমি নিতে পারবো না।

জবাব দিয়ে মাথা উঁচু করে বের হয়ে এল সে।

বিনয়বাবু পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন। নীরব রাগে ফুলছেন তিনি। ওই ছেলেটা যেন বাড়ি বয়ে এসে তার গালে সপাটে দুটো চড় কসে দিয়ে গেছে।

—শয়তানের বাচ্চা।

বিনয়বাবু ওদের কাছে কোথায় বার বার ঘা খেয়ে চলেছেন, আর ততই রেগে উঠছেন।

গঙ্গাধর ওর সঙ্গেই এসে হাজির হয়েছিল বিনয়বাবুর বৈঠক-খানার দাওয়ায়। সে নিঃশব্দেই এসেছিল আজ প্রেসিডেণ্টের কাছে নালিশ দায়ের করতে। তার নালিশ সকলের বিরুদ্ধেই।

শীর্ণ লম্বাটে চেহারা, কপালে সিন্দুরের টিপ। কখনও সাইকেলে কখনও হেঁটে সে চষে বেড়ায়, তার তপস্যার সিদ্ধাই ঘোষণা করে।

জল চাই—সে তপস্যা করে জল এনে দেবে।

জোরে বৃষ্টি নেমেছে। যাকে বলে কাড়ান নামা, অপরিয্যাপ্ত বৃষ্টি। বীজধান হেজে যাবে রোয়াধানের গলা ডুবে গেছে, পচে যাবে।

গঙ্গাধর হাজির। তপস্যা করে বৃষ্টি বন্ধ করে দেবে।

মনু আথুলি বয়স্ক প্রবীণ লোক, সে থাকলে যাহোক কিছু দিয়ে বামুনকে বিদায় করতো, কিন্তু তার ভাইপোরা এই কাজের দিনে ওমনি ঝামেলায় রেগে ওঠে।

দুএকটা কথা কাটাকাটির পরই গঙ্গাধর পৈতে বের করে দুচোখ কপালে তুলে গর্জায়।

—ভস্ম করে দেবো ব্যাটা তেলিকে। ব্রহ্মশাপ দোব—

তারপরই মন্নু আখুলির যোগ্য ভাইপো দ্বিজু কোদালের পাশা তুলেছিল

—বেহ্মহত্যাই করে দোব এইবার। দাও দিকি শাপ মণ্যি! বামুন! বামুন না কচু!.... মুদ্দফরাস ডোম!

গঙ্গাধর চলে এসেছে সেখান থেকেই। তখনও রাগটা থেকে থেকে উথলে উঠছে। বামুনকে অপমান—প্রজাপতি ঋষিকে সে কিনা কোদাল তুলেছিল!

এর বিচার চাই!

কিন্তু এখানে এসেই থমকে দাঁড়িয়েছে ঘরের ভিতরের ওই কথাগুলো শুনে। প্রাণগোপালকে আদর করে ডেকে এনেছেন বিনয়বাবু, একেবারে নর্থপোল আর সাউথপোল এক হয়ে যাবে!

গঙ্গাধর এদিকে খুব টাটোয়ার লোক। সব বদ বুদ্ধিই তার খুব তীক্ষ্ণ। ওই প্রজাপতি ঋষির বাতিকটুকুই তার বোকামির লক্ষণ। অবশ্য ওটা তার এখন ভিক্ষার ছলও হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কান পেতে শুনছে গঙ্গাধর ওদের কথাগুলো।

গ্রামের সব খবর তার নখদর্পণে, এমনকি মহকুমার খবরও। সেখানেও তার যাতায়াত। প্রাণগোপালের স্কুল ছাড়বার কথাও শুনেছে সে।

তাই নিয়ে এমনি নাটক হবে তা জানতো না। এ খবরটার গুরুত্ব আছে যদুগোঁসাই-এর কাছে।

তাই চুপচাপ নেমে এল গঙ্গাধর। না; এসময় এদিকে কেউ নেই। লোকজন এদিকে না ডাকলে এখন আসবে না। গঙ্গাধর চুপিসারে বের হয়ে চলে এল সোজা গলিপথে।

দাঁড়িয়ে মজা দেখবে কিনা ভাবছে। হঠাৎ কথাটা তার মনে হয়। পা পা করে এগিয়ে চলে।

দুটো আলাদা পাড়াই। গোঁসাইরা এখানের আদি বাসিন্দা,

তাঁদের পাড়াটাই প্রথমে গড়ে উঠেছিল। এদিকে তখন বাস করতো কিছু কামার, কুমোর এইসব জাত। আর ছিল প্রভুদের বাগান-পুকুর, ফলের বাগান এইসব।

এখন এইখানেই মাথা তুলেছে বিনয়বাবুর বিরাট বাড়ি ওই বাংলো, বাগান আর কারখানা।

. আকাশ বাতাসে বাসন তৈরীর শব্দ ওঠে ঘট-ঘটাং-ঠং-ঠাং।

মাঝখানে বিরাট বাঁধ!... কালো জল টলটল করছে। গঙ্গাধর বাঁধের পাড় ধরে এগিয়ে চলে।

বৈকাল হয়ে গেছে।

যতুগোঁসাই-এর দিবা নিদ্রার অভ্যাস নেই। ওটা শাস্ত্র বিরুদ্ধ কাজ। ব্রাহ্মণত্বে দীক্ষা নেবার সময় সেই শপথ করতে হয়েছে। মা দিবায়াং স্বপ্সি।

দিবানিদ্রা তিনি উপভোগ করেন না।

খাওয়া-দাওয়াও নিরামিশ। গোবিন্দ-ভোগ চালের সাদা মিহি সুবাসিত অন্ন প্রসাদ। খাঁটি গাওয়া ঘিয়ে তার রং হয়ে উঠেছে পীতাভ। কাঁচকলা, উচ্ছে, মশলাদার বড়ি নধর বেগুন দিয়ে খাঁটি সরষের তেলে ভাজা শ্রী রসা, ডালও তুরকম। ভাজা-ভুজি চার পাঁচ পদের। তারপর ছানার কালিয়া, অম্বল, মিষ্টি, দই আর কামিনী ভোগ চালের খোসবুদার তুগ্ধপক্ক পরমান্ন তাতে কিসমিস থাকবে নিদেন আধপোয়াটাক। তার উপর ঘরের তৈরী গোটা তুই নধর সাইজের সন্দেশ।

এসব অবশ্য গৃহদেবতাকে নিবেদন করেই প্রসাদ পান গোঁসাই-প্রভু। তারপর দাওয়ায় একটা ছোট তোষকে বসে বালিশ হেলান দিয়ে একটু চটকা ভেঙ্গে নেন। নিদ্রা একে বলা যায়না, বিশ্রামই।

সেই সময় বাঁকুড়াদর্পণ হিতবাদী তুএকটা বাসি কাগজ আসে, সহর কলকাতার খবরও থাকে তাতে।

যত্নগোঁসাই বিস্মিত হয়ে পড়েছেন। কাগজে ও খবর বেরুচ্ছে, কোথায় চট্টগ্রামের ছেলেরা ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করে চট্টগ্রাম কেড়ে নিয়েছিল। পাল্টা লড়াই-এ অবশ্য হেরে গেছে।

কিন্তু বীরের মত লড়েছে তারা বন্দুক-গুলি-বারুদ দিয়ে।

কলকাতা, চন্দননগরেও তাদের ঘাঁটি আছে। কলকাতাতেও অনেক সাহেবদের উপর হামলা করেছে তারা। পুলিশের কোন্ হোমরা-চোমরাকে খুঁজে খুঁজে বের করে মেরেছে।

চারিদিকে ওরা ছড়িয়ে আছে। কোথায় কখন দেখা দেবে জানে না কেউ। তাছাড়া আজকাল ছেলেদের মধ্যেই তাদের বেশী উৎপাত। প্রাণগোপালের জন্যই ভাবনায় পড়েছেন তিনি।

ছেলেটা এমনিতেই বেবশ। বুনো ঘোড়ার মত স্বভাব। বৈষ্ণবের ঘরে এমনি একটি কঠিন প্রকৃতি নিয়ে এমন ছেলে জন্মায় কি করে জানেন না তিনি।

ওই অসীমবাবুকে তার সন্দেহ হয়। বাইরের থেকে মাষ্টারী করতে এসেছেন এই অজ পাড়াগ্রামে। লেখাপড়া জানা লোক, এরই মধ্যে আশে-পাশের গ্রামের লোকদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। ছেলেরাও তার কথায় ওঠা বসা করে। প্রাণগোপালও ওর কাছে যায়।

এইসব ভেবেচিন্তেই স্কুলের পরিবেশ থেকে ছেলেকে সরিয়ে আনতে চান তিনি।

বাড়িতে খোঁজ করেও প্রাণকে পাওয়া যায় না।

বিন্দী বলে—খেয়ে দেয়ে কোথায় বেরিয়ে গেল।

—এই দুপুরে। তুই কিছু বললি না?

বিন্দী বহুকালের মানুষ। সে জবাব দেয়।

—আপনি কি সব বলছেন, ইস্কুলে যাবি না। পড়বি না। ও ছেলেমানুষ, নেকাপড়া করবেক নাই? বাবাজীগিরি করবেক এখন থেকেই আর ওই সব শিখবেক? মরণ—

বিন্দীর ইঙ্গিতটা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ আর স্পষ্ট। যদুগোপালবাবু ওকে থামাবার চেষ্টা করেন।

—থাম দিকি তুই।... বাড়ি ফিরলে প্রাণকে পাঠিয়ে দিবি কাছারি বাড়িতে!

গঙ্গাধর ওঁৎ পেতেছিল।

যদুগোপাল কাছারি বাড়িতে পা দিতেই সামনের বকুল তলা থেকে এগিয়ে আসে। দুচার জন প্রজা পাটক অপেক্ষা করছে প্রভুর জন্য।

গঙ্গাধরকে দেখে যদুগোপাল বিরক্ত হন।

—তুমি!

গঙ্গাধর শোনায়।

—আজ্ঞে বিনয়বাবুর ওখানে পানুকে দেখলাম!

—পানুকে দেখলে ওখানে?

যদুগোপাল বিস্মিত হয়েছেন। বিনয়বাবুকে এমনিতে তিনি সহ্য করতে পারেন না। হালি বড়লোক হচ্ছে, ওর মনের সেই জ্বালাটার খবরও তিনি রাখেন।

ও তিলে তিলে বিষ সংগ্রহ করছে, একদিন গোসাঁইদের উপর সেই বিষ উগরে দেবে। তবু গঙ্গাধরের কাছে সেই মনোভাবটা প্রকাশ করেন না তিনি। ও দু গর্তের চ্যাং—এখুনি দুটো টাকার লোভে বিনয়বাবুকে গিয়ে সাতখান করে লাগাবে।

গঙ্গাধর শোনায়।

—আজ্ঞে। বোধহয় পড়াশোনার ব্যাপার নিয়েই কথা বলছেন পানুকে, তিনি নাকি সদরে তাঁর বাড়িতে রেখে পড়াবেন।

যদু গোঁসাই সোজা হয়ে বসলেন।

তাঁর সেই বৈষ্ণবী বিনয়ভরা হাসিটা মিলিয়ে যায়। গঙ্গাধর দেখছে প্রভুকে। তার নিজের সেই অপমানের কথাটা মনে পড়ে এতক্ষণে। নিবেদন করে।

—ওই বিনয়বাবুর চাষী বহড়ার মনু আথুলির ভাইপো দ্বিজু আজ আমাকে চরম অপমান করেছে প্রভু। বলে কিনা বামুন শালাদের মুখে মারি কোদালের পাশা।··· কচু, কচু সবাই। বলে বেহ্মহত্যাই করবে সে। ওই বিনয়বাবুর লোক—ও জানে আপনি স্নেহ করেন আমাকে তাই।···কথাটা শুনছেন যদুগোপাল। বলেন,

—বিষ্টু···গঙ্গাধরকে একটা টাকা আর তুসের চাল দাও, যাও হে—হ্যাঁ, পরে দেখা করো। আর অসীম মাষ্টারের ব্যাপারটা কিছু জানো?

গঙ্গাধর একটু বিপদে পড়ে।··· অসীমমাষ্টারও তাকে দায়ে অদায়ে সাহায্য করে। তাই এড়িয়ে যায় আপাততঃ।

—আজ্ঞে খবর একটু নিতে হবে। বলেন তো দারোগা বাবুর কাছে না হয় সদরেই যাবো।

গঙ্গাধরের সর্বত্র অবারিত দ্বার। ওই প্রজাপতি ঋষি সেজে সে যত্রতত্র যায়। মান অপমান বোধ নেই লোকটার। মাঝে মাঝে লম্বা ছড়া লিখে বাঁকুড়াদর্পণের সম্পাদকের কাছে গিয়ে হত্যা দেয়। এটা ছাপাতে হবে।

তাতে থাকে নানা জনের কেচ্ছা কাহিনীর খবর। তবু প্রজাপতি ঋষিকে ওরা চেনে।

যদুগোঁসাই ওকে তাই হাতে রাখতে চান।

—ঠিক আছে। বিষ্টু, গঙ্গাধরকে দুটো টাকাই দাও ওই খয়রাতি-খাতে, আর তুসের চাল। রাধামাধব!

অসীমবাবুও কথাটা ভেবেছেন।

যদুগোঁসাইদের জায়গাতেই স্কুল। অবশ্য ওঁদের তার জন্য কোন মাথাব্যাথা নেই। কোনরকমে টিমটাম করে স্কুল চলছে।

বিনয়বাবুই এখন স্কুলের সেক্রেটারী। তারপর থেকে যে কোন

কারণেই হোক তার নজর পড়ে এর উপরে। স্কুলটা ক্রমশঃ বাড়ছে। তবে অসীমবাবুও বুঝেছেন বিনয়বাবুর দেশসেবা সমাজ সেবার এটা একটা ছল মাত্র। ওর কারবারের সুবিধাও হবে এর থেকে। সদরের উপরওয়ালা মহলে এই সুবাদেও প্রতিপত্তি বাড়াতে চান।

দু-একবার দেখেছেন তিনি স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবসে স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে নিয়ে এসেছেন বিনয়বাবু, স্কুলের ছেলেদের দিয়ে হাতজোড় করে রাজবন্দনা স্তোত্র গাইয়েছেন।

অসীমবাবু এইটিই পছন্দ করেননি। কিন্তু হেডমাষ্টার জয়গতি-বাবু স্বয়ং সেক্রেটারী সাহেবকে খুশী করার জন্য এটার সাজেশন্ দিয়েছিলেন।

জয় প্রভু ইংল্যাণ্ডেশ্বর
করুণার ঈশ্বর,
মহাব্যোমে জলে স্থলে
আকাশে ভূধরে
স্মরিত তোমার নাম বার বার।
লহ গো প্রণতি মোদের,
মোরা মুর্খ ভারতবাসী
তোমারে প্রণাম করি
লুভিনু নোতুন জন্ম বারংবার,
জয় প্রভু ইংল্যাণ্ডেশ্বর ॥

—একি ব্যাপার জয়গতিবাবু?

অসীমবাবু বিরক্ত হয়েছিলেন। বিনয়বাবু অবশ্য খুশী হন এই স্তুতিতে। তিনি রায়বাহাদুর হবার জন্য চেষ্টা করছেন। জয়গতিবাবুর মাইনেও বাড়বে এতে। তাছাড়া সাহেবদের সঙ্গে ইংরাজিতে কথা বলবেন এটা জয়গতিবাবুর এলেমের পরিচয়ই, সেটা গ্রামের, আশপাশের গ্রামের সকলকে দেখাতে চান।

তাই জয়গতিবাবু অসীমবাবুর কথায় বলেন,

—আরে মশাই, চেপে যান না। তাছাড়া ওঁরাই তো রাজা—রাজদর্শন, রাজবন্দনা পুণ্যকর্ম ! সবাই করছে ভাগ্য ফিরিয়ে নিচ্ছে তাদের ওই করে। আপনি আমি করলেই যত দোষ ? ওসব নিয়ে ভাববেন না। যান, দেখবেন ছেলেদের খাবারের সব লুচিই যেন ভাজানো হয়। ঘি আগে থেকেই খানিকটা সরিয়ে রাখুন। ওই ঘি আর মিষ্টি। পাঁচুকে পাঠাচ্ছি ওর হাতে দিয়ে দেন !

পাঁচকড়ি জয়গতিবাবুর সুযোগ্য সন্তান। বর্তমানে স্কুলের কেরানীপদ অলঙ্কৃত করে আছে। ওরই হাত দিয়ে মালটা জয়গতিবাবু নিজের বাড়িতে পাচার করে নিতে চান।

অসীমবাবুর ঘেন্না করে এসব কথা নিয়ে আলোচনা করতে। ছেলেদের খাওয়াবার জন্য জিনিসপত্র থেকেও চুরি করে নিজের জন্য নিয়ে যান জয়গতিবাবু। তাছাড়া মাইনে জমা নেবার ব্যাপারেও কারসাজি আছে। এসব বিনয়বাবুও জানেন।

অসীমবাবুই সেদিন গোঁসাই প্রভুর ওখানে যান।

বৈকালের ম্লান আলো নেমেছে। এখানকার পরিবেশটাই আলাদা।

ছায়াঘন ঠাঁই ! কোথায় বকুল মাধবীলতার ফুলের মিঠে গন্ধ ওঠে, কাঁঠাল গাছগুলো ঘন পাতার আবরণ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরের চূড়াগুলোয় বিষ্ণুপুরের নবরত্নমন্দিরের প্রভাব।

ওপাশে কাছারিবাড়ির দিকে এগিয়ে যান অসীমবাবু। এখানে দু-একবার এসেছেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। আজ কথাটা বলতে এসেছেন নিজেই।

যদু গোঁসাই ভাবতেও পারেননি অসীম মাষ্টার নিজে এখানে আসবে। তাই আপ্যায়ন করেন।

—এসো মাষ্টার। ওরে কে আছিস, মাষ্টারের জন্য একটু প্রসাদ এনে দে।

—আবার অসময়ে ওসব খাবো ? অসীমবাবু আমতা আমতা করেন। হাসেন যত্নগোপাল।

—সাহেব বাড়ির খাওয়া নয় হে, ছানার মালপো তায় প্রভুর প্রসাদ, অমৃতসমান, নাও !

অসীমবাবু খাওয়ার পর কথাটা পাড়েন।

—ওই প্রাণগোপালের কথা বলছিলাম।

যত্নগোপাল ভাবলেশহীন চোখ মেলে ওর দিকে চাইলেন। ওর কথাগুলো শুনে চলেছেন। অসীমবাবু বলেন,

—মেধাবী ছাত্র। তাছাড়া ইংরাজী এখন শিখতেই হবে। চাকরী বাকরী না করুক এষ্টেটের কাজ দেখতে হবে। আপনাদের জমিদারীর ব্যাপারে জেলার কর্তাদের সঙ্গে দহরম মহরম রাখতে হবে, তাছাড়া আইনগত মামলা তো আছেই। বাড়িতে উকিলও একজন দরকার।

কথাটা যত্ন গোঁসাই এর মনে ধরে। এ নিয়ে ভাবছেন তিনি। ওই স্বদেশী ছেলেদের কথাটা জানাতে পারেন না যত্নগোঁসাই, তবু ব্যাপারটাকে ভালো লাগে তার।

মনে হয় বিনয়বাবুর বিরুদ্ধে একেই কাজে লাগানো যেতে পারে। সে বুদ্ধি জনপ্রিয়তা তার আছে। বিনয়বাবু ও প্রাণকে ডেকে নিয়ে গেছেন, বোধহয় টোপ দিয়েছেন।

শয়তান !

তার পিতৃপুরুষ খাল কেটে ওই কুমীর ঘরে এনেছিলেন। আজ তাদেরই উপর হানা দিয়েছে ওই ধূর্ত মানুষটা। পঞ্চগ্রামের বামুন সজ্জনের সামনে জলগণ্ডুষ হাতে নিয়ে শপথ করে গেছে তাদের সর্বস্ব সে ছিঁনিয়ে নেবে।

তার ছেলেকেই আজ তাই তার দলে টেনে নিতে চায়।

এর জবাবই দেবেন গোঁসাই প্রভু। এদিক নিয়ে মাথা ঘামান নি তিনি।

এতদিন তার দরকার বোধ করেন নি।

এইবার সেইটাই করতে হবে। অসীমবাবু বলে চলেছেন।

—আপনিও কথাটা ভেবে দেখবেন একটু।

—ঠিক আছে। এখুনিই কিছু করছিনা। পরে জানাবো।

সন্ধ্যা নামছে। ভিজে বাতাসে ওই বকুলফুলের গন্ধটা যেন মাখামাখি হয়ে গেছে। প্রাণগোপাল বাড়ির দিকে ফিরছে। দিঘীর কালো জলের বিস্তারে কোথায় একটা জলপিপি ডাকছে একটানা করুণ সুরে। শালবনের দিক থেকে ভেসে আসে শিয়ালের ডাক।

ওই বিনয়বাবুকে মনে হয়েছে ধূর্ত শিয়ালের মতই চতুর আর সাবধানী।

প্রাণগোপাল এখনও ঠিক করতে পারেনি কি করবে সে।

হঠাৎ ওই অন্ধকারে কাকে দেখে দাঁড়াল। মরা অশ্বত্থগাছের নীচে দিয়ে কে আসছে। চমকে ওঠে প্রাণগোপাল। ওপাশেই শ্মশান। তবু অজানা ভয়ে তার বুক কেঁপে ওঠে।

—তুমি!

কার ডাক শুনে থমকে দাঁড়াল প্রাণ। তারার আলো পড়েছে পুকুরের জলে, তারই আভায় দেখা যায় ওর দুটো চোখ।

—রমা!

—কেন? তুমি কি ভেবেছিলে ভূত পেত্নী কিছু?

—না। এই সন্ধেবেলায় কোথায় গিইছিলে?

চুপ করে দাঁড়িয়েছিল রমাদের বাড়ির কিরষান বুড়ো যগিন্দর। ওষুধের শিশিটা তার হাতে। যগিন্দর বলে,

—চল কেম্নে গো।

রমার ওদিকে খেয়াল নেই। কথাটা সেও শুনেছে। আজ

বৈকালে চণ্ডীতলায় গঙ্গাধর হেঁকে হেঁকে কথাটা বলেছিল সবাইকে।

—বুঝলে গোঁসাই বুড়ো ওল্ড, কট্ ভীমরতি। প্রাণকে নাকি ইংরাজী পড়তে দেবে না, ইস্কুল ছাড়িয়ে নেবে। ওদিকে বাবা বিনয়বাবু দ্যাট বাঘাতেঁতুল, সেও খাপ পেতে বসে আছে।

রমার কথায় হাসে প্রাণগোপাল,

—তুই ও শুনেছিস কথাটা?

—হ্যাঁ। একি অন্যায়। পড়বে না ওই বাবাজিগিরি করবে, আর গুপ্তবৃন্দাবন গড়ে রাসলীলা চালাবে? বাঃ। এবার না ফার্স্ট হয়ে উঠছো ক্লাসে?

প্রাণগোপাল হাসছে ওর কথায়।

গুপ্তবৃন্দাবন! রমা কথা বলে ভালো। তেজী বেপরোয়া মেয়ে। বাবা কোথায় মাস্টারি করেন। দেশের বাড়িতে সামান্য জমি জমা আছে। তাই নিয়ে মা মেয়েতে গ্রামে থাকে।

রমা বলছে।

—তুমি পড়া ছাড়বে না।

ওর কণ্ঠস্বরটা যেন একটু জোরেই শোনা যায়।

দিঘীর অন্য পাড়ে গোঁসাইদের বাড়ী। জলের বুকে ওর তীক্ষ্ণ গলার শব্দটা ভেসে ভেসে যায়। প্রাণগোপাল বলে,

—দেখা যাক না কি হয়? এই বাড়ি যা, মায়ের ওষুধ রয়েছে সঙ্গে। কাল দেখে আসবো মাসীমাকে।

ওরা চলে গেল।

রমার কথাগুলো ভাবছে সে। বাবার মতের বিরুদ্ধেই দাঁড়াবে সে। এই অন্যায়টাকে মেনে নেবেনা। গুপ্তবৃন্দাবন! রাসলীলা এনিয়ে অনেক কথাই কানে আসে। কিছু কিছু দেখেছে, প্রাণগোপাল। তাদের বাড়ির প্রভুদের অন্তরের এই জঘন্য ভিতরের দিকটাও জানে সে।

এ তারই লজ্জা। রমার কাছেও এসব তথ্য গোপন নেই।

কিন্তু পথ পায় না প্রাণগোপাল।

বাড়িতে ঢুকতেই সামনেই দেখে বাবা তখনও বসে আছেন। কাছারির বারান্দায় সিলিং থেকে একটা চৌদ্দবাতির সাবেকি লণ্ঠন টাঙ্গানো। তারই আলো পড়েছে যত্নগোপালের মুখে। অন্যদিন তিনি এতক্ষণে লোমবস্ত্র পরে মন্দিরে চলে যান—কিন্তু আজ চুপ করে বসে আছেন।

—শোন!

বাবার গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে প্রাণ।

আজ সেও কঠিন হয়ে উঠেছে। এগিয়ে গেল বাবার দিকে। ওই মানুষটির সামনে আজ প্রথম মুখোমুখি দাঁড়ালো সে।

—বিনয় কি বলেছে তোমাকে?

চুপকরে থাকে প্রাণগোপাল। যত্ন গোঁসাই রাগে গর্জন করে ওঠেন।

—জবাব দাও।

প্রাণগোপাল শোনায়,

—তাকে জবাব দিয়ে এসেছি ওর সাহায্য আমি নোবনা। আমার বিবেকে বাধবে।

একটু চমকে ওঠেন যত্ন গোঁসাই ওর কণ্ঠস্বরে। কঠিন নিষ্পন্দ কণ্ঠস্বর।

—তাহলে কি করবে?

—এখনও ঠিক করিনি। তবে পড়া ছেড়ে দেবার ইচ্ছে আমার নেই।

—রাধামাধব!

গাত্রোত্থান করলেন গোঁসাই প্রভু। এখুনি এর জবাব তিনি দিতে চান না। তবে একটা দিক ভেবে তিনি মনে মনে খুশী

হয়েছেন, প্রাণগোপাল বিনয়ের সাহায্য নেবেনা। তাকেও সে মনে মনে ঘৃণা করে। এইটুকু জানবারই দরকার ছিল তাঁর।

চুপকরে দাঁড়িয়ে থাকে প্রাণগোপাল।

বাবা ভিতরে চলে গেলেন তার কথার জবাব না দিয়েই। আঁধার নামছে।

তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে কি ভাবছে প্রাণগোপাল।

গোঁসাই পাড়ার ওপাশেই শালবন। বনের দিক থেকে একটা জল গড়ানি খাত বয়ে এসেছে। বর্ষায় ওই দিকে বনের গেরুয়া ঢল নামে, নরম মাটির বুকে গভীর খাতের সৃষ্টি হয়েছে ওই জলধারার প্রকোপে।

অন্যসময় ওর বুকে কোথাও একটু জলভিজে পাথুরে বালির ফাঁকে ফাঁকে জমে থাকে। ডোম পাড়ার কাছে এসে সমতলে নেমেছে ওটা ঝর্ণার আকারে। দুদিকে কদম জাম গাছ; সরবনে পাখীগুলো কলরব করে মাঝে মাঝে।

ওরই ধারে এসে শেষ হয়েছে গোঁসাইদের বিস্তীর্ণ বাড়ির এলাকা। এপাশটায় গোয়াল ঘরের সারি।

চাষের বলদ-ও আছে আট দশ জোড়া, তাছাড়া মোষ, দুধেল গাইও আছে।

এদিকে ওদিকে সার গোবরের স্তূপ, মাটিতে ডোবার মত খুঁড়ে রাশি রাশি গোবরপচা খড় ওখানেই ফেলা হয়। জলে জলে পচে সার হয়ে ওঠে সেগুলো। মাঠেই লাগে ওইসব সার।

অন্ধকারে এখান থেকে গোঁসাই পাড়াকে অন্য রকম দেখায়।

মন্দিরের চূড়াগুলো আঁধারে আকাশের দিকে ঠেলে উঠেছে।

বড় বড় বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে কঙ্কালের মত, অনেক দিনের তৈরী ওগুলো, চুনকাম করারও বিশেষ রেওয়াজ নেই।

বাড়ি চুনকাম করানোও হয়ে ওঠেনি। ইটগুলো বের হয়ে আছে। তাতে শেওলার ছোপ ধরে রং ও বদলে গেছে। লালচে কালোয় মেশা সেই রং। আঁধারে ঘন কালো হয়ে গেছে। এপাশে দোলমঞ্চ, রাসমঞ্চ।

ওর আশপাশেই দুএকটা শাল বকুল অশ্বত্থগাছ দেখে ওদের বয়স ঠিক করে নেওয়া যায়। মাধবীলতার কুঞ্জ একদিন তৈরী করেছিলেন ওঁদের পূর্বপুরুষ। আজও সেই লতা রয়ে গেছে। বয়সের গিঁট পড়েছে ওর সর্বাঙ্গে।

ওপাশের পাঁচিল ঘেরা কয়েকটা খড়ের বাড়ি।

রাতের অন্ধকারে তারাও সুপ্তিমগ্ন।

তবু ওই ঘুম ঢাকা বাড়িটা থেকে হাসির শব্দ ওঠে।

হাসছে ললিতা। হ্যারিকেনের আলো পড়েছে ওর মুখে, আলুথালু বেশ বাস। সারাদেহে যৌবনের ঢল। উপচে পড়ে ওর যৌবন। নাক আর দুটো চোখ যেন তুলি দিয়ে আঁকা, ফর্সা হর্তেলের মত মসৃণ রং, ওর দেহের উপর এই আলোটুকুর ঔজ্জ্বল্য স্নিগ্ধ একটু মিষ্টি আভা এনেছে। গায়ের কাপড় চোপড় ও অসংযত। আঁটসাঁট ভাব নেই। লজ্জার কোন কারণ নেই এখানে। তাই ঢিলে ঢালা যৌবনের অফুরন্ত প্রকাশময় ওই দেহটা বাঁধভাঙ্গা নদীর মত উচ্ছল উদ্দাম। একরাশ কোকড়ানো কালোচুল ঝাঁপিয়ে এসে যেন ওর উদ্ধত বুকের উপর পড়েছে। সেই কালো চুলের চিকের আড়ালে দুটো টলটলে ধারালো চোখের চাহনি যেন তীরের মত ছিটকে আসে।

—মরণ!

হাসছে ললিতা। গোঁসাই পাড়ার রূপবতী ললিতা সখি।

গোঁসাই প্রভুর দুচোখে মিটি মিটি চাউনি। সেই কাছারি বাড়ির মিষ্টি শয়তানি হাসিভরা লোকটা এখানে এসে বদলে গেছে। নাটমন্দিরে হরিনাম শুনে যে যদু গোঁসাই মূর্হুঃমূর্হু হরিধ্বনি করে ওঠে এ সেও নয়।

নোতুন একটি মানুষ। ললিতা হাসি থামিয়ে গোঁসাই প্রভুর কাছে এসে বসল। এ ঠিক বসা নয়, আলতোভাবে ওই বরতনু সমর্পণ করার ভঙ্গিতে সে এসে বসেছে। দুচোখে ফুটে ওঠে কৌতুকের আভা।

—তাই নাকি গো! এই পাড়ায় তো অষ্টসখীর নিবাস।

নোতুন কেষ্টোদেরও সখীর অভাব হবেক নাই। ওই তো বিশাখা আছে নীলা কদম বকুল কতোজন রয়েছে।

গোঁসাই প্রভু হাসছেন।

—কি যা তা বলিস ললিতা?

হাসছে ললিতা। জিব কেটে বলে,

—হেই মাগো, গোঁসাই প্রভুর সামনে যা তা বলতে পারি? পাপ হবেক নাই?

কর্তাদের আমলে এদের দুচার জনকে এনে আশ্রয় দিয়েছিলেন কর্তারা। জানতেন অর্থবান লোকের এসব বদখেয়াল একটু হবেই। গ্রামের বাজে পল্লিতে গিয়ে নোংরামি করার চেয়ে তবু এখানে সীমিত পরিবেশে এটা সীমাবদ্ধই থাকবে।

জীবে প্রেম দেখিয়ে দুস্থ সমাজপতিত তাদের কয়েকজনকে এইখানে আশ্রয় দিয়েছিলেন কর্তারা। তাদের জন্য কিছু জমি জারাতের ব্যবস্থাও ছিল। তাছাড়া ঠাকুর বাড়িতে নাম গানও করে তারা। রসকলি আঁকে তিলকসেবা করে, গলায় কণ্ঠী দেয়, এরা দেবতার দাসী।

অবশ্য এটা বাইরের পরিচয়। আড়ালের খবর ও রাখে অনেকে। তাই এই পল্লীর নাম দিয়েছে তারা গুপ্ত বৃন্দাবন।

এখানের রূপের হাটে অনেকেই বিকিকিনির পশরা সাজায়। যত্নগোপাল ও আসেন।

এই ললিতাকে নিয়ে ও অনেক ইতিহাস রচিত হয়েছিল এককালে। পাশের গ্রামের বৌ ছিল ললিতা, ওর স্বামী হরিনাথ সামান্য ঘরামির কাজ করতো। স্বভাব বাউলের মতই ছিল তার ধারা।

দুচার দিন কাজ করতো আর গান গেয়ে বেড়াতো।

কোথায় কোন বাউল সিদ্ধ পুরুষ আছে ঘুরতো তারই সন্ধানে আর গাজা খেতো এন্তার।

ললিতার তখন ভর যৌবন। উদাসী আধপাগল লোকটাকে ঘরে মজাতে পারেনি সে। মাঝে মাঝে রাতদুপুরে খালি বাড়িতে একাই পড়ে থাকে ললিতা। হরিনাথ নেই, কোন সদ্‌গুরুর সন্ধানে গেছে।

বাইরের অন্ধকারে শোনা যায় শিষের শব্দ। কে যেন দরজায় কড়া নাড়ছে ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্।

ললিতার ভয় করে। বন্ধ জানলায় দুএকটা কাঁকর পাথর এসে লাগে।

ওটা সঙ্কেত। প্রেমিকের দল রাতের অন্ধকারে হন্যে হয়ে ঘুরছে।

এমনি সময় যদু গোঁসাই এর নজরে পড়ে ললিতা। এখানে ঠাকুর দেখতে এসেছিল ঝুলনে। মন্দিরে কীর্তন হচ্ছে। যদুগোঁসাই বসে আছেন শিবনেত্র হয়ে। গলায় সোনার হার, নধর পুষ্ট দেহে একটা রেশমী চাদর জড়ানো। কীর্তনের ফাঁকে ফাঁকে আহা হা করে ভাব দিচ্ছেন।

মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল ললিতা।

মাথার চুলগুলো চুড়ো করে বাঁধা, ডাগর কালো দুচোখে কি বিস্ময় ফুটে ওঠে।

নিটোল দেহের বাঁধন ভেঙ্গে যেন নদীতে বান ডেকেছে। ভরা ভাদরের নদীর উথল আবেশ ওর সারা দেহ জুড়ে।

রাধিকার রূপ বর্ণনা করছেন কীর্তনীয়া।

বঙ্কিম ছাদে কবরী, তাতে ফুল সাজ, দুচোখে কাজল রেখা, যেন মেঘ ভাঙ্গা চন্দ্রিমা।

—আহা! হা!···

চোখ খুলতেই চমকে উঠেছিলেন সেদিন যদুগোসাঁই,···ওকে দেখছেন—দেখছেন ললিতাকে দুচোখ ভরে।

ললিতা সরে এলো। ওর সারা দেহে ওই চাউনি যেন বিঁধছে। সে অনেকদিন আগেকার কথা।···

তারপর একদিন হরিনাথ ঘরামী সদ্‌গুরুর সন্ধানে বের হয়ে আর ফেরে না। কয়েকদিন পর তার অর্দ্ধভুক্ত মৃতদেহ পাওয়া যায় সুদিপুরের ঘন শাল জঙ্গলে। বোধহয় বাঘেই ধরেছিল তাকে।

ললিতা ক'মাসপরই অন্য কোথাও ঠাঁই না পেয়ে এইখানেই আশ্রয় পেয়েছিল। ক্রমশঃ চিনেছিল ওই গোসাঁই প্রভুদের।

ছেলেটাকে নিয়ে ভাবনায় পড়েছিল যদুগোঁসাই। ওই প্রাণকে সামলানো দায় হয়ে উঠেছে। কোথায় একটা ভয় ও রয়েছে যদু গোঁসাই এর, সে বোধহয় তার এই রাতের স্বরূপটাকেও চেনে। তাই মনে মনে ঘৃণা করে প্রাণগোপাল যদু গোঁসাইকে।

খিলখিলিয়ে হাসছে ললিতা। হাসলে ওকে আরও সুন্দর দেখায়। চুলে কি যেন মিষ্টি গন্ধ তেল মেখেছে ললিতা; গায়ে চন্দনের হালকা সুবাস, ঠাণ্ডা নরম গা।

যদুগোঁসাই বলেন।

—বুঝলি, ছেলেটার বড় দেমাক। ব্যাটা আমার শুকদেব গোঁসাই হবেন?

—তাই নাকি! এই যে দৈত্যকুলের পেহ্লাদ গো! মরে যাই। বলবো নাকি বিশাখাকে? ছুড়ি কিন্তু ভারি টাটোয়ার, কচি হলে কি হয়, খেলুড়ে বটে। এরই মধ্যে—

হাসছে ললিতা।

ওর হাসিটা যেন নেশার মত পেয়ে বসে যত্ন গোঁসাইকে।

চড়াই উঠে গেছে। দিগন্তের তারাজ্বলা আকাশের পানে উঠে গেছে শালবন সীমা। ঘন গহিন শালবন।

এদিকে দামোদর নদ। দুর্গাপুর স্টেশনের ছোট্ট ঘরটার সামনে দু-একটা প্যাসেঞ্জার গাড়ি দাঁড়ায় দু এক মিনিটের জন্য। কয়েকজন যাত্রী নামে,—বৈকালের দিকে সেখানে ভয়ে কেউ আসে না।

ট্রেনখানা শালবনের গভীরে হারিয়ে যায়। আর এক্সপ্রেস-মেল ট্রেন গুলোর সঙ্গে এখানের কোন সম্বন্ধ নেই। তারা যেন ভয়ে এর সীমানা ছাড়িয়ে ছুটে পালায়।

শালবন সুরু হয়েছে ওইখান থেকে—মাঝে দামোদর। বর্ষায় তার উন্মত্ত রূপ—শীত গ্রীষ্মে ক্লান্ত রিক্ত বালুচর ধূ ধূ করে মাইল দুয়েক জুড়ে। তারপর আবার সুরু হয়েছে শালবন।

ওরা বৈকালের ট্রেনে নেমে এগিয়ে আসে হাঁটা পথে। অনাদি চলেছে আগে আগে পথ দেখিয়ে। জনমানব নেই। সন্ধ্যা নামে—রাত্রি বাড়ে।

বনে বনে—পাতায় পাতায় শিশির পড়ছে। শিশিরকণা জমে জমে টুপ-টাপ ছন্দে জলকনা হয়ে ঝরে পড়ে। শান্ত স্তব্ধ বনানীর বুকে মাতন তোলে দু একটা বন শূয়োরের পদশব্দ—সাবধানী

ভালুক আঁধারে মিশে এগিয়ে চলে গ্রামের দিকে, নীল চোখ দুটো জ্বলছে তাদের। শুকনো পাতায় পায়ের ক্ষিপ্র শব্দ তুলে দু একটা নেকড়ে না হয় চিতা বাঘ লম্বা হয়ে এগিয়ে চলে শিকারের সন্ধানে।

অসীমবাবু জানতেন ওরা আসবে। অনাদিকে তিনি পাঠিয়েছেন স্টেশনে। বিশ্বস্ত ছেলেটিকে এ ভার দিয়েছেন। ঢাকা থেকে কলকাতা চন্দননগর হয়ে দুর্গাপুরে নেমে জঙ্গলের পথে তাঁরা এই দিকে আসবে। গন্তব্যস্থল মেদনীপুর হিজলী—ওই অঞ্চলে। ওদিকে ট্রেনে যাবার উপায় নেই। সতর্ক প্রহরা। পুলিশের বেড়াজাল পাতা আছে। তাই এই ঘুর পথে দুর্গম বন জঙ্গল পার হয়েই যেতে হবে তাদের।

রাত কত জানে না। গ্রামের বাইরে ডাঙ্গার ধারে বোর্ডিংটা ছুটির সময়ে ফাঁকা। ছেলেরা বাড়ি চলে গেছে। অসীমবাবুর দুর্জয় সাহস। একাই থাকেন তিনি।

একটা শিয়াল ডাকছে। অন্ধকারে একটা টর্চ একবার জ্বলে উঠে আবার নিভে গেল।

এগিয়ে গেলেন অসীমবাবু।

নাঃ, এখানে কেউ তার দিকে চেয়ে নেই। সূচিভেদ্য অন্ধকার। থানা পুলিশ এখান থেকে সাত মাইল দূরে। মধ্যে ঘন বন। তাদের আসার কোন কারণ ও নেই। অসীমবাবু সব দিক দেখেই এখানে এই নির্জনে কাজ নিয়ে রয়েছেন। এখানের শান্ত এই বন রাজ্যে গড়ে তুলেছেন বিপ্লবীদের একটি শাখা, ধীরে ধীরে নোতুন ছেলেও সংগ্রহ করছেন। প্রস্তুতি চলেছে গোপনে।

অন্ধকারে কার কণ্ঠস্বর শোনা যায়। অনাদি এগিয়ে আসছে।

অসীমবাবু ওদের চিনতে পারেন।

ওরা এসে ঢুকলো। ক্লান্ত ক'টা মানুষ। ক্ষুধার্তও।

খাবারের ব্যবস্থা করাই ছিল। খিঁচুড়ি আর ডিম ভাজা কাঁচা শালপাতায় ঢেলে দিয়েছে খাবারটা।

ওরা গোগ্রাসে গিলছে।

অসীমবাবু ওদের দেখছেন। এক একটি দুর্জয় মানুষ সর্বস্বপণ করে ওরা পথে বের হয়েছে। কোন বাধাই ওর মানবে না।

ইংরেজের দম্ভের জবাব তারা দিয়েছে—আবার দেবে। বাইরে রাত্রির অন্ধকার নেমেছে।

হঠাৎ কার পায়ের শব্দ শোনা যায়, চমকে ওঠে ওরা অসীমবাবুও। বাইরে কে যেন কড়া নাড়ছে। চকিতের মধে কে ফুঁ দিয়ে আলোটা নিভিয়ে দেয়।…ওরা খাওয়া ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে, কোমর থেকে রিভলবার গুলো বের করে ওরা ৫ তৈরী হয়।

অসীমবাবু দরজা খুলে পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দিয়ে বাইরে আসেন। সামনেই অন্ধকার দাঁড়িয়ে আছে প্রাণগোপাল হাঁপাচ্ছে সে।

—তুমি!

রাতের অন্ধকারে প্রাণগোপাল ফিরছিল; তাকে অসীমবাবু পাঠিয়েছিলেন বেলেতোড়ে এক ভদ্র লোকের কাছে কি একট ব্যাগ পৌঁছে দিতে।

সন্ধ্যার অন্ধকারেই বের হয়েছিল সে। অসীমবাবু বার বা করে তাকে সাবধান করেন।

—খুব সাবধানে যাবে। নৃপতিবাবুর বাড়ি গিয়ে তার হা দেবে। ওর দেখা না পেলে ফিরে আসবে। অন্য কেউ জিজ্ঞাস করলে ও কিছু বলবে না। এড়িয়ে যাবে।

আর তিনি যদি কিছু দেন—সেটাও নিয়ে এসে আমাকে পৌঁছে দিয়ে যাবে।

প্রাণগোপাল জানে ওই ব্যাগের মধ্যে কি আছে। তবু এ নিয়ে কোন প্রশ্ন করা উচিৎ নয়। এমন জিনিষ পত্র মাঝে মাঝে আসে আবার চলে যায়।

এ সব খুবই গোপনীয় ব্যাপার। যে কোন কারনেই হোক অসীমবাবু আজ তাকেই পাঠিয়েছেন এই কাজে।

রাত্রি হয়ে গেছে। কাজ শেষ করে ফিরছে প্রাণগোপাল। ঘন শালবন। তবু এই অন্ধকারেও তার ভয় করে না। কি এক দুর্বার সাহসে তার বুক ভরে ওঠে।

সাইকেলটা বাড়িতে রেখে বের হয়ে এল।

খবরটা অসীমবাবুকে পৌঁছে দিতে হবে।···অন্ধকারেই চলছে সে।

জঙ্গল থেকে পায়েহাঁটা পথটা এসে ডাঙ্গায় উঠেছে ওই খানে। ক'জন ছায়া মূর্তিকে দেখে অবাক হয় সে।

অন্ধকার গাছের আড়ালে দাঁড়াল প্রাণগোপাল। লোক কজন উঠে স্কুলের দিকে চলে গেল। ওদের একজনকে চিনেছে সে। কামারপাড়ার অনাদি।

চকিতের জন্য ওদের কথাটা কানে আসে।

অসীমবাবুর নাম করে কি বলছিল ওরা। বোধহয় ওঁর কাছেই যাবে। তার অনুমান সত্য। বোর্ডিংএর ঘরের দিকেই এগিয়ে যায় ওরা।

প্রাণগোপালের কথাটা স্মরণ হয় নি। মনে হয়েছিল অসীম বাবুর আত্মীয় তারা। বাড়ি ফেরার মুখে বিনয়বাবুর বাংলোর সামনে এসে দাঁড়াল প্রাণগোপাল। অন্ধকারে টর্চ জ্বলছে। ডাঙ্গায় ভারি জুতোর শব্দ ওঠে।

মচ্ মচ্ মচ্

বিনয়বাবুর বাংলোতে আলো জ্বলছে। বিনয়বাবুও নিজে বের হয়ে এসে অভ্যর্থনা জানান।

—আসুন ছোটবাবু। অসময়ে দলবল নিয়ে?

বিনয়বাবুর এখানেই এসে ওঠে কর্তা ব্যক্তিরা। ইংরেজ শাসকদের এইটাই এখানকার আস্তানা।

ছোটদারোগাবাবু পথশ্রমে হাঁপাচ্ছেন। গোলগাল পিপের মত মানুষটি। কনেষ্টবল ক'জনও খুশী হয়নি এখানে আসার ব্যাপারে।

ছোটবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন।

—আর বলেন কেন স্যার? খবর আছে একটু। স্কুল বোর্ডিংএ যেতে হবে। অসীমবাবু কে আছেন? যতো সব স্বদেশী ব্যাপার—ওরা চীজ সাংঘাতিক মশাই!

চমকে ওঠেন বিনয়বাবু সে কি!

কথাটা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে শোনে প্রাণগোপাল। সেও দেখেছে কাদের যেতে। বোধহয় ওদের সন্ধানেই এসেছে ওই পুলিশদল, সরে গেল প্রাণগোপাল। বুক কাপছে! তবু না এসে পারেনি।

সোজা গলিপথে খানাখন্দ ভেঙ্গে এসেছে। সে বলে।

—পুলিশ এসেছে স্যার।

চমকে ওঠেন অসীমবাবু— সেকি!

—বিনয়বাবুর বাড়িতে এসে পৌঁছেছে তারা বোধহয় এখুনিই এসে পড়বে এখানে।

প্রাণগোপাল বুঝতে পারে ভিতরে কাদের সাড়া ওঠে। অসীমবাবু বলেন।

—ঠিক আছে। এখুনি চলে যাও তুমি। কাল সকালে একবার আসবে। হ্যাঁ, এসব কথা কাউকে জানাবে না। যাও।

প্রাণগোপাল সরে গেল।

ছায়ামূর্তির দলও ঘর থেকে বের হয়ে রাতের অন্ধকারে আবার বনের গহণে ঢুকে গেল।

প্রাণগোপাল দূর থেকে দেখলো বেশ করে। ওরা কোন অদৃশ্য জগতের মানুষ। ঘর নেই, আত্মীয়-স্বজন নেই, শান্তি নেই, বিশ্রাম কাকে বলে জানে না, রাতের গহণে ওরা কোন সাধনমন্ত্রের নীরব সাধক।

মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ওই অন্ধকারের দিকে। মনে হয় তার কাছে জীবনের আজ একটা অর্থ পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে। এতদিন তার সামনে আদর্শ বলে কিছুই ছিল না, বাবা জ্যেঠাদের দেখেছে। দেখেছে তাদের সেই নীচতা আর পাপটাকে। মনে হয়েছিল বিনয়বাবুই বোধহয় এদের থেকে অনেক ভালো।

ব্যবসাতে নাম করেছেন, জেলার কর্তাদের সঙ্গে ভাবসাব। ইংরেজীতে কথা বলেন তাদের সঙ্গে।

ওকেই আদর্শ বলে মনে করেছিল। কিন্তু সেখানেও ঠকেছে সে নিদারুণ ভাবে।

আজ অন্ধকারের অতলে ওই তারার আলোর জীবনের পরম জিজ্ঞাসার একটা সঠিক উত্তর যেন খুঁজে পেয়েছে প্রাণগোপাল।

অন্ধকারে বাড়ির দিকে পা বাড়ালো প্রাণগোপাল।

পিছন দিয়ে ফিরছে অন্ধকারে। ওপাশের বড়ো বাড়িটা থেকে ধারালো হাসির শব্দ শুনে চমকে ওঠে প্রাণগোপাল। হাসছে ললিতা।

জানলার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় অল্প আলোয় তার হলুদ শাড়িটা যেন গায়ের সঙ্গে মিশেছে। যদুগোপালের জড়িত কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

প্রাণগোপাল সরে এলো।

জীবনে অনেক কিছুই দেখছে সে। একদিকে ভোগলালসার আগুনে পুড়ছে ধর্ম—বিবেক মনুষ্যত্ব। মনে হয় পৃথিবীতে কোথাও কোন সত্য-কোন কল্যাণ চেতনাই বোধ হয় নেই। তবু দেখেছে আছে আজও ক'টি মানুষ। তারা নিশীথ রাত্রের জাগর সত্বার মতই সাধনায় মত্ত। মনে হয় এই ভণ্ডামির মুখোসটাকে সে টেনে খুলে ফেলবে একদিন। তছনছ করে দেবে সবকিছু।

বিনয়বাবু অবশ্য এই মৌকায় উপর মহলে কিছু খাতির জমিয়ে নেবার চেষ্টা করতে কসুর করেন নি।

চারিদিকে দাবানল জ্বলে উঠেছে। চট্টগ্রাম ঢাকাতে আগুন জ্বলেছে। রংপুরে ও ডাকতি হয়ে গেছে। সরকারের ডাক লুট হচ্ছে এখানে সেখানে।

কলকাতায় বিপ্লবীরা কত ঘাঁটি গড়েছে তার ঠিকানা নেই। ইচ্ছে করলে কলকাতা বোমা মেরে নাকি উড়িয়ে দিতে পারে।

পশ্চিমবাংলার অদূরে ধিকি ধিকি জ্বলছে আগুন। মেদনীপুরে তারই সূত্রপাত হয়েছে। কোন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে তারা হত্যা করেছে প্রকাশ্য দিবালোকে।

চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে বিপ্লবীর দল, গান্ধীজীর কথাও লেখা হচ্ছে কাগজে—এদিকে সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে ইংরেজ তটস্থ হয়ে উঠেছে।

বিনয়বাবুর এসব ভালো লাগেনা। বেশ শান্তিতে বাস করছিল মানুষ। তাঁদেরই সুবিধা হচ্ছিল। অভাব তো থাকবেই কিছু তাই বলে ইংরেজকে তাড়াবার জন্য এসব সুরু না করলেই ছিল ভালো। বিনয়বাবু অন্ততঃ তাই ভাবেন।

গঙ্গাধর ও বলে।

—রাইট। লং লিভ দি কিং। ইংলণ্ডেশ্বরো জগদীশ্বরো বা। গড।

বুঝলেন দাদা? আমিও তপস্যা করে জেনেছি এসব স্রেফ নস্যি হয়ে যাবে। আরে বাবা বন্দুক কামানের সামনে তুটো বোমা! ফুঃ। অল ননসেন্স দাদা।

বিনয়বাবুর ওখানে সকালে চায়ের আসর বসে। গ্রামে তিনিই চায়ের আমদানী করেছেন। তু'দশজন জোটে।

এ হেন বিনয়বাবু আজ সন্ধ্যায় ওই স্বদেশীদের খবর পেয়ে চমকে ওঠেন। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।

তাঁরই এলাকায় এই সব কাণ্ড হবে তা ভাবতেই পারেন নি। তবু যদি হাতে নাতে ধরতে পারেন হয়তো রায়বাহাতুর খেতাবই মিলে যাবে।

তাই রাতত্নপুরেই অন্ধকারে ওদের সঙ্গে এগিয়ে চললেন।

ছোট দারোগাবাবু বলেন।

—একটু সাবধানে যাবেন স্যার। আর্মস্ ছাড়া ওরা চলে না।

বিনয়বাবু ঘাবড়ে যান। জীবনে তার অনেক চাওয়া—অনেক স্বপ্ন রয়ে গেছে, তাই বলেন তিনি।

—কনেষ্টবল তুজন বরং আগে যাক।

তোড়যোড় করে গিয়ে হানা দিয়েছিলেন তারা। বিনয়বাবুর মনে কত আশা! হাতেনাতে ধরবেন এইবার বিপ্লবীদলকে।

কিন্তু কোথায় কি!

অসীমবাবু ঘুম চোখে বের হয়ে এসে দাঁড়ালেন।

—আপনারা এসময়ে?

—ঘরে কেউ নেই?

ঘুমুচ্ছিলেন অসীমবাবু?

অবাক হন তিনি।

জবাব দেন না। বিনয়বাবু প্রশ্ন করেন—কেউ আসেনি?

– না তো!

নিরাসক্ত কণ্ঠে জবাব দেন অসীমবাবু।

তবু কনেষ্টবল দুজনকে নিয়ে বিনয়বাবুই ঘরের ভিতরে ঢুকলেন। অসীমবাবু বাধা দেন না। দেখছেন।

শূন্য মনে ফিরে এসেছিল সেদিন বিনয়বাবু। অসীমবাবুর ঘর তল্লাসী করে ও কাউকে পাওয়া যায় না।

ছোটবাবু বলেন—কিন্তু ওরা নেমেছিল ট্রেন থেকে। এই পথে এসেছে।

—বোধহয় এতদূরে আর আসেনি।

বিনয়বাবু আড়ালে বলেন।

—অসীমবাবুকেই এ্যারেষ্ট করবেন নাকি ?

অর্থাৎ ওটা হলেই বিনয়বাবু খুশী হন। কিন্তু ছোটবাবু মাথা নাড়েন।

—উহু ! সে রকম অর্ডার নেই। জাল পাতা থাক স্যার নজর রাখুন। পাখী একদিন জালে আসবেই। শুধু গুটিয়ে তোলার ওয়াস্তা। আপনাকেই কথাটা জানিয়ে রাখলাম।

বিনয়বাবু খুশী হয়েছেন। তাই সায় দেন।

—ঠিক আছে। মাঝে মাঝে খবর দোব। এত রাতে আর ফিরে কি করবেন ? চলুন, গরীবের বাড়িতে যা হয় শাক ভাত দুটো মুখে দিয়ে রাতটা কাটিয়ে যান। বড়বাবুকে বলবেন কথাটা।

অতিথি সৎকারের কোন ত্রুটিই করেন না বিনয়বাবু। সব ব্যবস্থা তাঁর আছে। সামনেই পুকুরে মাছ জিয়ানো থাকে। জাল ফেলতেই দু তিনসের করে মাছগুলো ধরা পড়ে দু পাঁচটা। ঘিয়ের অভাব নেই।

পোলাও তৈরী করতে দেরী হয় না। পোলাও আর মাছের কালিয়া শীতের রাতে ভালোই জমে ওঠে।

বিনয়বাবু পদাধিকার বলে এখানের দণ্ড মুণ্ডের কর্তা তাই এই স্বদেশীদের কায়দা করার দায়িত্ব তার আছে। সেই ভাবেই চলবেন এবার থেকে।

যদুগোপাল সেদিনের পর আর স্কুলে যাবার জন্য নিষেধ করেননি প্রাণগোপালকে। ওই কথাটা তিনি যেন বলেনেই নি।

প্রাণগোপালও স্কুলে যাচ্ছে।

ব্যাপারটা দেখেছেন বিনয়বাবুও। সেদিন ওই ছেলেটার তেজ দেখেছেন। গোঁসাই বাড়ির ছেলেদের মধ্যে ও যেন ব্যতিক্রম। তারা সাধারণতঃ মুখ তুলে কথা বলে না। তাদের যত বদবুদ্ধি ওই পেটে পেটে।

ওই প্রাণগোপাল মুখেই সাফ কথা বলে। নাকের উপরে তাঁকে অপমানই করে গেছে ওই ছেলেটা। তিনি দেখেছেন অসীমবাবুর সঙ্গে ওর বেশী মেলামেশা।

অসীমবাবুও প্রাণগোপালকে পেয়ে খুশী হয়েছেন। পড়াশোনায় ভালো। তাছাড়া কঠিন একটি সত্তা আছে ওই ছেলেটির মধ্যে। বাবার অন্যায়কে ও সহ্য করে না। বিনয়বাবুর সাহায্য ও হেলায় অবহেলা করে এসেছে। তাদের বাড়ির সেই ভোগবিলাস আর উচ্ছৃঙ্খলতাকে মনে মনে ঘৃণা করে।

তাই বোধহয় নোতুন পথের সন্ধানে সে এগিয়ে এসেছে এই বিপ্লবের পথে। সাহসী-কর্তব্যনিষ্ঠ ও। সেই রাতে প্রাণগোপাল যদি নিজের জীবন বিপন্ন করে এখানে এসে সংবাদ না দিতো, কি সর্বনাশ ঘটতো তা কল্পনা করতেও শিউরে উঠেন অসীমবাবু।

ইতিহাসের পাতায় আর কোনদিনই আর স্বাক্ষর রাখতে পারতো না মুষ্টিমেয় ক'টি তরুণের সেই বিদ্রোহ আর বীরত্বের কথা। মেদিনীপুরের মাটিতে তারা অত্যাচারী ইংরেজের দম্ভের জবাব দিয়েছে একবার নয়, পর পর তিনবার।

অন্তরালে প্রাণগোপালের দান কতখানি তা একমাত্র জানেন অসীমবাবু।

প্রাণগোপালের অক্লান্ত পরিশ্রমে আর সংগঠনী শক্তিতে তিনি বিস্মিত হয়েছেন। ধান চাল টাকা পয়সাও এসেছে, আরও আসছে। তারই পরিকল্পনা ওই লাইব্রেরীর।

পড়াশোনার আরও বিস্তার করার দরকার। মানুষের নৈতিক জোর তাতেবাড়ে। সে ন্যায় অন্যায়কে সহজে চিনতে পারে। প্রতিবাদ করতে পারে অন্যায়ের, সেই প্রতিবাদ হয় আরও জোরদার।

দত্ত বাড়ির নিতুই শোনায়।

—বিনয়বাবু লোক সুবিধের নয়। বোধহয় পুলিশের কানে যা তা লাগিয়েছে আমাদের ক্লাবের নামে।

অসীমবাবু কথাটা শোনেন মাত্র। বিনয়বাবুর পরিচয় তিনি জানেন। সেই রাত্রে বিনয়বাবুও পুলিশের সঙ্গে এসেছিলেন এখানে। সে কথা তিনি গোপনই রাখেন, প্রাণগোপালও চুপ করে থাকে।

অসীমবাবু বললেন।

—বলুক যে যা বলে। দেশের লোক জানে তোমরা কি করো।

তারা দমেনি। গ্রাম থেকে চাঁদাও ওঠে বেশ। যদুগোঁসাইকে ওরা প্রেসিডেন্ট করে সেদিন চণ্ডীতলায় সভা করে।

গঙ্গাধর বানের আগে ভেসেআসা খড়-কুটোর মত ঠিক এসে হাজির হয়েছে। কপালে রক্তচন্দনের দাগ, শিখায় একটা গাঁদাফুল বাঁধা। হাতে পুরোনো একটা বাঁকুড়াদর্পণ। তাতে তার একটা স্বরচিত কবিতা ছাপা হয়েছিল কয়েক বছর আগে। ওইটাই সে সভায় পাঠ করে ঘোষণা করবে এ অঞ্চলের সেইই একমাত্র তাবড় ব্যক্তি সাহিত্যের কমলবনে যার স্বচ্ছন্দবিহার, সুতরাং সেই অধিকারে পাঠাগারের অন্যতম কর্মকর্তা হবার দাবী সে রাখে।

গঙ্গাধর সোৎসাহে জানায়।

—এতো শুভ লক্ষণ। আনন্দের কথা। পাঠাগার তৈরী হবে। মা সরস্বতীর সেবা করবে। আমি জ্যোতিষশাস্ত্র ঘেঁটে দেখেছি এই অঞ্চলে মা লক্ষী এবং সরস্বতীর পদার্পণ ঘটবে।

আড়াল থেকে কোন ফচ্‌কে ছোঁড়া সুর করে বলে ওঠে।

ওঁ প্রজাপতি ঋষি, গায়ত্রীছন্দ—হোমগ্নে বিনিয়োগঃ। অর্থাৎ প্রজাপতি ঋষিকে হোমের আগুনে ফেলে দাও!

—এ্যাও! ইষ্টুপিড, ননসেন্স, শূয়ার, ড্যাম্ রাস্কেল।

গঙ্গাধর দপ্ করে খড়ের নুড়োর মত জ্বলে ওঠে। জ্বলে উঠলেই তার মুখ থেকে গালাগালের তুবড়ি ছোটে। রাগের চোটে লাফায় তিড়িক্ তিড়িক্ করে—কাছা কোঁচা খুলে যায় তার।

প্রাণগোপাল ওদের থামাবার চেষ্টা করে।

গঙ্গাধর গর্জন করে।

—থাক, থাক। জুতো মেরে গরুদান করতে হবে না। সব্বাইকে দেখে নোব আমি।

আগুনে ঘি পড়ে। কোন কিল্লী ছেলের দল চীৎকার করে ওঠে। —বন্দেমাতরম্!

গঙ্গাধর এইটাই সহ্য করতে পারে না। সে জেনে ফেলেছে এই সব ক্লাবের মূল ব্যাপার কি। তাই শাসায় সে।

—অলরাইট! দেখে নোব সবাই'কে। কোমরে দড়ি পরাবো।

বিনয়বাবু সবই লক্ষ্য রাখছেন। প্রেসিডেন্ট ইলেকশনের জন্য তৈরী হচ্ছেন সবে মাত্র। কিন্তু মধ্যে থেকে ওই সমিতি আর কিছু ছেলের দল এই অঞ্চলের জনমানসে একটা সাড়া জাগিয়েছে। এতদিন বিনয়বাবুর ছিল এ ব্যাপারে একছত্রাধিপত্য, ওরা মুখ বুজে শুনেছে তাঁর কথা। বিনিময়ে তিনি ওদের দুমুঠো ধান কাউকে বা

কারখানায় বাটি পেটার চাকরী, কাউকে বা চাষের জন্য কিছু সামান্য ধান দাদন দিয়েছেন, এবং তা সুদে মূলে তিনগুণ করে উশুল করে ছেড়েছেন।

তবু সময়ে তারা যাহোক কিছু সাহায্য পেয়েছিল ভবিষ্যতে হয়তো পেতে পারে এই ভেবেই তাঁর কথা তারা মেনেছে।

এবার তারাও যেন উল্‌টো সুর গাইছে। কিছু কারিগর দেনা-পাওনার হিসাবে ভুল ধরে তাদের পাওনা নিয়ে সেদিন মুখের ওপর শোনায়।

—বাকী টাকা ঠকিয়ে নিয়েছেন বাবু। তুসনের বানি এককলমের খোঁচায় গায়েব হয়ে গেল ?

বিনয়বাবুকে ওরা প্রকারান্তরে চোরই বলে। বিনয়বাবু গর্জে ওঠেন।

—ঠিক আছে। হিসাব মত ওই নিবি নে—না নিবি কাজ করিস না।

পীতাম্বর জগাকর্মকার তখনকার মত চলে গেল, কিন্তু ওরা সেইখানেই থামেনি। দল বেঁধে কাজ বন্ধ করে দিল কারখানার। অর্ডার রয়েছে মালের, বিয়ের লগনসা সামনে। বিনয়বাবুর গুদামেও মাল নেই।

চমকে উঠেন তিনি, ওরা ধর্মঘটই করবে। খোঁজ খবর নিয়ে টের পান পিছনে সমিতির সাহায্যও রয়েছে। ওরা নইলে না খেয়ে মরতো কদিনেই।

বাধ্য হয়েই বিনয়বাবু ব্যাপারটা মিটিয়ে নিয়েছিলেন তখনকার মত। কিন্তু রাগটা তার বেড়ে ওঠে।

ওরা তাকে অগ্রাহ্য করে চলেছে, ভোটের সময়ও এইবার বোধহয় বিনয়বাবুর এতদিনের রাজ্যপাটও লাটে তুলে দেবে। ভাবনায় পড়েছেন তিনি।

এমন সময় বিনয়বাবুর বৈঠকখানাতে গঙ্গাধর এসে হাজির হয় মুক্ত কচ্ছ অবস্থায়। ঘামছে সে।

—সর্বনাশ কাণ্ড বিনয়বাবু স্যার! অল্ এর্ণাকিষ্ট। বলে কিনা বন্দেমাতরম্! এই গ্রামের মধ্যেই এসব আপনি বসে বসে দেখবেন ওন্‌লি।

বিনয়বাবু অবাক হন।

—কি হয়েছে?

—কি হয়নি তাই বলুন?···ওই অসীম মাষ্টারের দল প্রকাশ্যে রেভলিউশন করছে। আর শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে ঢুকেছে ওই যদুগোপাল গোঁসাই! বুঝলেন বিনয়বাবু, পুরোপুরি স্বদেশী দল গড়ে উঠল এইবার এই খানেই! বোমা, পিস্তলও নাকি আমদানী হয়।

রাতের অন্ধকারে শালী নদীর ধারের জঙ্গল থেকে গুলির আওয়াজ শোনেননি?

বিনয়বাবু কথাটা শুনেছেন। মাঝে মাঝে দু একটা গুলির শব্দ তার কানে এসেছে। কিন্তু ওসব যে ওদেরই কাজ তা ভাবেন নি। অবাক হয়েছেন তিনি। পাকা ব্যবসাদার লোক, তাই মনের ভাবটা সহজে কারও কাছে প্রকাশ করেন না।

বরং উল্‌টো কথাই শোনান।

—তাতে কি হে! ভালোই তো, পল্লী সমিতি গড়ে উঠল।

লোকে বিপদে আপদে সাহায্য পাবে। আমরা তো কোনো কাজে আসি না তাদের।···এ নিয়ে এত মাথা গরম করছ কেন?

তবু বিনয়বাবু খুশী হননি।

তাঁকেও এড়িয়ে গেছে তারা সব দিক দিয়ে। গঙ্গাধরকে হাতে রাখতে চান তিনি। আরও খবরাখবরের দরকার। তাই বলেন, —বসো, চা খাও গঙ্গাধর। আর শোন এখুনিই মাথা গরম করো না। একটু নজর রাখো, বিশেষ করে রাতের অন্ধকারে ওরা কি করে তারও খবর নাও। ওরে কে আছিস, গঙ্গাধরের বাড়ীতে আজ প্রসাদ ভোগ দিয়ে আসিস, ঠাকুর বাড়ীতে বলে দে।

অর্থাৎ আজকের তার পরিবারের খাবার ব্যবস্থা তিনিই করে দিলেন। বেশ যুৎ করেই ভোগটা হবে আজ।

গঙ্গাধর চোখ বুজে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে।

শিবথানের ওই বিরাট সমাবেশের একপাশে রমাও এসে দাঁড়িয়েছিল। আজ তার দাদা বিষ্টুপদোর কথা মনে পড়ে।

ম্যাট্রিক দেবার পরই মেতে উঠেছিল বিষ্টুপদও। রমার মনে পড়ে দাদাকে। তকলি-চরকা কাটতো। সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা। অসীমবাবু তখনও এই এলাকায় আসেন নি। বিষ্টুপদই ছিল এখানের আন্দোলনের মূল নেতা।

রাতের অন্ধকারে বের হয়ে যেতো প্রায়ই। কোন কোনদিন ফিরতো না। দু একদিন পরে ফিরলো তাও কিছুক্ষণের জন্য। চোখ মুখ লাল চুলগুলো উস্কোখুস্কো।

মা ছেলের দিকে চেয়ে থাকে।

অল্প বয়সে বিনোদিনী ওই ছেলে আর মেয়েকে নিয়ে বিধবা হয়েছিল। সামান্য জমি-জায়গা যা ছিল তার থেকেই দুবেলা দুমুঠো জুটতো। তবু বিনোদিনী ভেবেছিল ছেলে পাশ করে চাকরী করবে। বাইরের দুটো পয়সা ঘরে এলে তার দিন বদলাবে। কিন্তু বিষ্টুপদ সেই দিক দিয়েই যায় নি।

মা কাঁদতো—কতকাল আর সংসারের ভার বইবো। একটা বোন রয়েছে—

বিষ্টুপদ মায়ের কথায় বলতো।

—আগে বড় কাজটা শেষ করি মা।

সেই কাজের নেশাতেই সে জড়িয়ে পড়েছিল। ঘরের বাঁধন তাকে বাঁধতে পারেনি। মেদনীপুর, হিজলী, চন্দন নগর থেকে খবর আসতো। সেই অগ্নিযুগের দিনে অনেকেই হারিয়ে

গেছল। বিষ্টুপদও ঘর ছেড়ে ফেরার হয়েছিল। রমা শুনেছে তার দাদা এখন কোথায় রাজস্থানের জেলে বন্দী হয়ে আছে।

এখানের মাটিতেই সেই একটি মানুষের প্রাণ ব্যর্থ হয়নি।

রমা প্রাণগোপালকে দেখছে। তার দাদার কাছেও আসত পানুদা, তখন থেকেই প্রাণগোপালের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ট হয়ে ওঠে। পড়াশোনায় ভলো সে, রমাকেও পড়াতো মাঝে মাঝে। দাদা ফেরার, বন্দী হবার খবর এলে কেঁদেছিল রমা; সেদিন কি ভয়ে তাদের বাড়িতে কেউ আসেনি। এসেছিল প্রাণগোপালই। রমাই জানতো প্রাণগোপালের সেই গোপন পরিচয়ের কিছুটা।

বাধা দিতে পারেনি রমা।

বলিষ্ঠ সেই তরুণটিকে দেখছে সে। ওর দলবলের খবর ও জানে।

সেবার মহামারীর সময় ওরাই বাড়ি বাড়ি সেবা করেছে। ওষুধপথ্যের ব্যবস্থা করেছে। দাহ করেছে সেই মৃতদেহগুলোকে নিজেরাই। রাত্রির অন্ধকারে মৃত্যুর বিভীষিকাময় গ্রামে পথে ওরা ফিরেছিল জীবনের অভয় মন্ত্র নিয়ে।

সেবার মিত্তির বাড়িতে আগুন লেগেছিল। সর্বনাশা আগুন।

ওরাই এগিয়ে আসে। সেই আকাশছোঁয়া লেলিহান শিখা যেন সারা গ্রামকে গ্রাস করছে! অসহায় মানুষগুলো আর্তনাদ করে।

ওরাই ওদের প্রাণে নোতুন সাড়া আনে।

হাঁড়ি কলসী বালতি বালতি জল তুলেছে ওরা। পাশের বটগাছ ওপাশের ঘরের চাল থেকে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে ওরা যুদ্ধ করেছিল সেই আগুনের সঙ্গে।

পোড়াছাই, আংরাঙ্গ কালো হয়ে গেছে তারা, তবু জলঢালার বিরাম নেই। ওই প্রাণগোপাল, অসীমবাবু অনাদি কামার কতজন সেদিন অসম্ভবকে ও সম্ভব করেছিল।

সেই সর্বগ্রাসী আগুনকেও হার মানতে হয়েছিল ওদের কাছে।

তার দাদা থাকলে সেও এগিয়ে আসতো। বিষ্টুপদ কোথায় হারিয়ে গেছে।

আজ আবার নোতুন রূপে দেখছে রমা প্রাণগোপালকে। বলিষ্ঠ একটি তরুন। এবার ভালো ভাবে পরীক্ষা দিয়েছে, পাশ করবে। কলেজে পড়তে যাবে। ওকে কেন্দ্র করে তার মন কি যেন আশার স্বপ্ন দেখে।

রমার সারা মনে বিচিত্র একটি সুর জাগে, গুন গুনানি সুর।

—কিরে?

পাশেই দাঁড়িয়েছিল মুখুজ্যেদের মিনু। তার ডাকে চমক ভাঙ্গে।

—হাঁ করে দেখছিস কি?

রমা যেন একটু লজ্জায় পড়ে। মিনতির বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে। সামনের মাসেই তার বিয়ে। তাই মিনতি বোধহয় প্রেমের ব্যাপারে ইতিমধ্যে অনেক কিছু জেনে ফেলেছে। শোনায় মিনতি—পানুর লভে পড়ে গেলি নাকি রে? খুবতো ভাব তোদের।

'লভ' কথাটার মানে জানে রমা। কথাটা শুনে লজ্জায় পড়ে সে।

—ধ্যাৎ। কি যে বলিস?

—তবে হাঁ করে কি ছাই পাঁশ শুনছিস? চল, বাড়ি চল।

রমার তবু থাকবার ইচ্ছে একটু ছিল। কিন্তু মিনতির ওই ধারনাটা যে একেবারে অর্থহীন মিথ্যা, সেই কথাটাই বোঝাবার জন্য রমা বলে,

—চল।

দুজনে বের হয়ে আসছে।

ওখানে একটা মাধবীলতা উঠেছে নিমগাছের ডালে, ছায়া নেমেছে, ওখানে দাঁড়িয়ে আছে গোঁসাই পাড়ার নববৃন্দাবনের বাসিন্দারা। তারাও সাজগোজ করে দেখতে এসেছে শিবনাথের ওই মিটিং। কে বলে

—কই গো পিসী, গান হবেক বলেছিল, তা কই সে সব?

রমা মেয়েটির দিকে চাইল। কালো মাজা মাজা গড়ন। টিকলো নাক, সুন্দর চোখ, বয়সও বেশী নয়, তবু ওর দেহে যৌবনের ঢল নেমেছে, নোতুন বর্ষার ছোঁয়ার মত সেই ঢল ওর সারা দেহে এনেছে কি লাবণ্য।

মেয়েটিকে চেনে রমা। বলে।—

—গান এরপর হবে বিশাখা।

ললিতাও এসেছিল, তার পরণে সাদা খোলের একটা শাড়ি। নাকে রসকলির ঝরে পড়া একটু দাগ। গলায় কণ্ঠী।

—কিগো রমাদি, বাবুদের বক্তিমে শুনতে এসেছিলে বুঝি? বিশাখা বল্লেক গান হবেক, তাই এলাম। এসেতো দেখি সেই বক্তিমেই চলছে। মরণ! ওদের কথার কি দাম আছে গো! ছাই! চলো পিসী, চলো!

ললিতার কাছে ওদের অনেকেরই মূল্য যাচাই করা হয়ে গেছে।

চেয়ারে বসে আছে গলায় মালা পরে ওই যদু গোঁসাই।

ওর মনের সব প্রবৃত্তি গুলোর খবরই জানে ললিতা। তার সামনে ওদের সব মুখোস খসে পড়েছে।

বিশাখার ভাল লাগছিল তবু তাকে যেন জোর করেই ওরা টেনে নিয়ে চলে গেল।

মিনতি হাসছে। বাঁশ বনের আড়ালে ধুলোমাখা পথের উপর এক ঝলক হলুদ রোদ এসে পড়েছে। কতকগুলো চড়াই পাখী দলবেঁধে ওই ধুলোয় নেমে ডানা দিয়ে ধুলো ছিটাচ্ছে আর নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে চলেছে।

মিনতির হাসির শব্দে রমা চমকে ওঠে।

—হাসছিস যে?

—দেখলাম ওদের। গোঁসাই পাড়ার ওই সখীদের। সাজ-বেশ দেখলি? রূপের গুমোরে মাটিতে পা পড়ে না। তবু যদি তেমনি হতিস? সব তো—

রমার কাছে ওই হাসিটা ভালো ঠেকেনা। মিনতি অনেক খবর রাখে যা তার অজানা। রমা জিজ্ঞাসা করে।

—কিরে? কি বলছিস?

মিনতি হাসে,

—ওমা তুই জানিস না? ওদের মালাবদল ঘর সংসার সবই ওই উপরেই! বুঝলি ভিতরে ভিতরে ওরা বেউশ্যে! ওই গোঁসাই প্রভুদের সেবাদাসী?

রমা কথাটা শুনে অবাক হয়—যাঃ।

মিনতি বলে।

—ওরা ওমনিই! তোর ওই প্রাণের প্রাণগোপাল ও বাদ যায় না। শুধোস না তাকে।

রমার ভালো লাগেনা এসব কথা।

চুপ করেই থাকল সে।

মিনতি বলে,

—তবে প্রাণগোপালকে আর বেশীদিন থাকতে হবে না গাঁয়ে! এইবার বাছাধনকে ওই বিনয় কাকাই শ্রীঘরে পাঠাবে বুঝলি!

—জেলে কেন? অবাক হয় রমা—ও জেলে যাবে কেন?

মিনতি অনেক খবরই জানে। তাই সগৌরবে সে শোনায়।

—ওই বিনয় কাকাই বলছিল, স্বদেশী ডাকাতদের সঙ্গে ওর খুব ভাবসাব। ও নাকি বোমা তৈরী করে, দারোগাবাবু ও জানে।

রমা চমকে ওঠে কথাটা শুনে।

তার দাদার কথা মনে পড়ে। ওরা একদিন জিতবেই। যতই বন্দী করে রাখুক, তবু ওদের দলবল বসে নেই। চট্টগ্রামে স্বদেশী ছেলের দল যুদ্ধ করেছে বন্দুক বোমা নিয়ে ব্রিটিশের সঙ্গে। পুলিশ মিলিটারিকে হারিয়ে তারা সারা সহর দখল করে নিয়ে তেরঙ্গা পতাকা তুলেছিল। প্রাণ দিয়েছে গুলিতে তবু হার মানেনি।

ঢাকা সহরে ও ছেলেরা ক্ষেপে উঠেছে। মেতে উঠেছে মেদনীপুরের ছেলেরা। দিনের বেলায় তারা গুলি করে মেরেছিল ম্যাজিস্ট্রেটকে। এসব তার দাদাও বলতো।

এখানেও এই শান্ত সবুজ গ্রামের বুকে ধীরে ধীরে আগুন জ্বলে উঠেছে। কে জানে প্রাণগোপাল তাদেরই একজন কিনা?

মিনতি চলে গেছে।

সামনের মাসে তার বিয়ে। ক' দিন পরেই সে পরের ঘরে চলে যাবে। তার স্বামী নাকি পুলিশের ছোট দারোগা। বিরাট চেহারা—এইবার দারোগাই হয়ে যাবে।

মিনতি তাই এখন থেকেই ওই স্বদেশীমার্কা ছেলেদের দেখতে পারে না। মানুষের দোষটাই তার নজরে পড়ে সবচেয়ে আগে।

সন্ধার পরে বাড়ি ঢুকলে কৈফিয়ৎ দিতে হবে তাকে।

তাই চলে গেছে মিনতি।

ঝিকিমিকি বেলা গড়িয়ে আঁধার নামছে। প্রাণগোপাল আজ সারাদিন খেটেছে ওই মিটিং এর ব্যাপারে। এতখানি সাড়া পাবে গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে তা ভাবেনি।

ওরা দেখেছে প্রাণগোপালের দলের নিঃস্বার্থ সেবা। তাই ওদের উপর ভরসা করে এগিয়ে এসেছিল তারা।

হেডমাষ্টার জয়গতিবাবুও এসেছিলেন মিটিংএ। তাঁর কেমন ভালো লাগেনি এসব। তবু প্রাণগোপাল আর ছেলেদের কথায় তিনি এসেছিলেন।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

এবার সামনে কাযের একটা প্রশস্থ ধারা পেয়েছে প্রাণ গাপাল। এগিয়ে যেতে হবে। টাকাও বেশ কিছু এসেছে। আরও আসবে।

অসীমবাবু, ছেলেরাও সব ফিরে গেছে আজকের মত।

প্রাণগোপালের মনে নানা পরিকল্পনা। একটা ডাক্তারখানাও খুলতে হবে। তবু লোকের উপকার হবে তাতে। সামান্য হোক তবু প্রাথমিক চিকিৎসা হবে ওদের।

ধরণী ডাক্তারও রাজী হয়েছে, বিনা পয়সায় সেখানে সকালে বসবে, ওষুধের দরকার।

নির্জন পথ দিয়ে আসছে প্রাণগোপাল।

হঠাৎ কাকে দেখে দাঁড়াল সে।

—তুমি!

রমা এগিয়ে আসে। সে ওর জন্যই যেন অপেক্ষা করছিল প্রাণগোপালকে দেখে এগিয়ে আসে রমা।

মিনতির কথাগুলো তার মনে জেগে আছে। আজ রমা ও নিজের চোখে দেখেছে প্রাণগোপালের ওই তেজদৃপ্ত চেহারা বিনয়বাবু আসেন নি মিটিং-এ। বলে রমা।

—এসব কি করছো? তুমি নাকি স্বদেশীর দলে ভিড়ছো?

প্রাণগোপাল কথাটা শুনে একটু চমকে ওঠে। তবু সহজ হবার চেষ্টা করে।

—কে বল্লে তোকে?

—সবাই জানে। পুলিশের কাছেও নাকি খবর গেছে।

প্রাণগোপাল সেই রাতের ঘটনাটা ভোলেনি। অন্ধকারে

ছায়ামূর্তির দল চলেছে দুর্জয় শপথ নিয়ে। চোখে তাদের দীপ্তিমান কি অদম্য সাহস। মনে পড়ে বিষ্টুদাকে। সেও ওদের মতই সর্বস্ব ত্যাগ করেছে ওই মন্ত্র সাধনের জন্য। আজ সে কোথায় জানে না। ফেরার হয়ে আছে বোধ হয়।

প্রাণগোপাল তাদেরই একজন হবার স্বপ্ন দেখে।

রমার কথার জবাব দেয়।

—ও নিয়ে ভাবিস না রমা। তোর দাদার কথা মনে পড়ে? বিষ্টুদা নিশ্চয়ই ভুল করে নি?

রমা প্রাণগোপালের দিকে চেয়ে আছে। কি কঠিন শপথ ওর সারা মনে। এই প্রাণগোপালকে যেন চেনে না রমা। বলিষ্ঠ একটি চেতনার প্রতীক ও। মুগ্ধ বিস্ময়ে রমা ওর দিকে চেয়ে থাকে। কোথায় দুজনের মনের গভীরে একটা মিল রয়ে গেছে।

—রাত হয়েছে বাড়ি যা রমা। একা যেতে পারবি তো?

রমার আত্মসম্মানে বাধে। সে জবাব দেয়।

—কেন পারবো না?

সেও ওই প্রাণগোপালের মতই সাহসী হতে চায়। মনে মনে সেও আজ একটা নোতুন চিন্তার পথ পেয়েছে। মেয়েদের অনেকে ওই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে। চট্টগ্রামের সশস্ত্র বিদ্রোহে মেয়েদেরও দান কম নয়।

রমার মনে হয় সেও আজ নিজের অজানতেই তার অন্তরের সেই ঘুমন্ত শক্তিটাকে চিনেছে নোতুন করে।

ললিতা কিন্তু যদুগোপালের কথা ভোলেনি।

প্রাণগোপালের ওই বেপরোয়া ভাবটা ঘুচিয়ে দেবে। এই বয়সে মানুষের মন কি চায় তা জানে ললিতা।

মনে মনে তাই হাসছে ললিতা। আজ দেখে এসেছে ওদের কাণ্ড।

বিশাখাকে বলে ললিতা

—কি লো কেমন, দেখলি নাগরকে ?

বিশাখার মনে সবে যৌবনের রং ধরেছে। নেশালাগা মন কি স্বপ্ন দেখে। প্রাণকুমারকে চেনে সে। কতোদিন দেখেছে তাকে ঠাকুরবাড়িতে আরতির সময়।

সুন্দর সুগৌর বর্ণ। মুখে মিষ্টি হাসির আভা।

বিশাখার ইচ্ছে হয় ওর সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলতে।

দু একদিন প্রসাদী মালা হাতে নিয়ে কি ভেবেছে বিশাখা, এ মালা নিজের গলায় দিতে চায় না।....তার কি দাম আছে ?

একদিন তাই চাঁদনী রাতে প্রাণগোপালকে ঠাকুর বাড়ির নির্জন গলিপথে দেখে বুক কেঁপে উঠেছিল। চাঁদের আলো পড়েছে গলিতে। একপাশে দেওয়াল—অন্যদিকে কাছারি বাড়ির সীমানা। রাস্তাটা ও এইটুকু। দুজন কষ্টে সৃষ্টে যাতায়াত করতে পারে।

ওকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল প্রাণগোপাল। তার হাতে চাদরের তলে কতকগুলো কি কাগজপত্র। অসীমবাবু ওগুলো প্রাণকে রাখতে দিয়েছেন। সাবধান করে দিয়েছেন—খুব গোপনীয়। কারোও হাতে যেন না পড়ে।

···কিছু বই পত্তর ও দেন তিনি প্রাণগোপালকে।

রক্তে মাতনআনা সেই সব বই। দেশ বিদেশের মুক্তি সংগ্রামের নেতাদের জীবনী।···প্রাণগোপালের হাতে আজও তেমনি বই কাগজ পত্র আছে।

পথের মধ্যে বিশাখাকে দেখে দাঁড়াল।

—কি ব্যাপার ?

বিশাখার বুক কাঁপছে। ডাগর ছুচোখের পাতায় কি আবেশ নামে। হাতের সেই প্রসাদী মালাটা ওর হাতে তুলে দেয়।

—তোমার জন্য এনেছিলাম।

প্রাণগোপাল ওর দিকে চাইল। মেয়েটাকে এত কাছ থেকে কোনদিনই দেখেনি। আজ ওকে দেখেছে খুব কাছ থেকে।

খোঁপায় ছুটো রজনীগন্ধার সাদা ফুল, ডাগর কালো ছুচোখে চাঁদের টলটলে আভা পড়েছে। মাথায় চুলের মিষ্টি গন্ধ মিশেছে ওই রজনীগন্ধার সুবাসে।

বিশাখা বলে।

—ও মালা কাছে রাখলে ভাল হয়। ঠাকুর খুসী থাকেন।

প্রাণগোপাল ওসবে আজ ঠিক বিশ্বাস করে না। নিজেও অনেক কিছু দেখেছে। ঠাকুরের দোহাই দিয়ে এ বাড়ির লোভী মানুষগুলোর সেই আকাশ ছোঁয়া লোভকেও চিনেছে সে। ঠকিয়েই চলেছে তারা। বই এও তাই পড়েছে।

প্রাণগোপাল বলে।

—ঠাকুর! ওতো পাথরের মূর্তি! কারো ভালো মন্দ করার সাধ্য ওর নেই। প্রাণহীন পাথর মাত্র।

বিশাখার এতদিনের সব ধারণার মূলে কে যেন কঠোর একটা আঘাত করেছে। এ সে মানতে চায় না। তাই ব্যাকুল কণ্ঠে বলে।

—ও সব কথা বলতে নেই। ছিঃ ছিঃ। কি ডাকাবুকো ছেলে তুমি! গোঁসাই প্রভু হয়ে এই সব কথা বলো? মাগো—

বিশাখা ছুহাত তুলে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে।

—মাপ্ করো দ্যাবতা। ছিঃ ছিঃ। স্বদেশী হলে এমনি ধারা কথা বার্তা বলে না গো?

হাসে প্রাণগোপাল। শোনায়।

—এক একজনের কাছে ঠাকুরের মূর্তি এক এক রকম। একটা

কিছুকে মানুষ পূজো করবেই। তুই পূজো করিস ওই রাধা-মাধব নামক পাথরের মূর্তিকে। আমি ও পূজো করি, তবে ওই ধাপ্পা দেওয়া পাথরকে নয়, আমি পূজো করি দেশকে—দেশের মানুষকে।

—ছাই! না, ললিতা পিসী তাই বলে তোমার নাকি মাথা বিগড়ে দিয়েছে ওই স্বদেশীওয়ালারাই।

—তা হবে!

বিশাখা আরও কি বলতে চেয়েছিল, কিন্তু দাঁড়ায়নি প্রাণগোপাল। সে বাড়ির দিকে চলে গিয়েছিল।

বিশাখা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

বিশাখার বয়স বেড়েছে, তার আগেই তার মন অনেক তৈরী হয়ে উঠেছে। ও দেখেছে এ পাড়ায় রাতের সেই অন্ধকারের জীবনটা, গ্রামের অন্যদের জীবনের সঙ্গে তাদের মেলে না।

এরা যেন বহুভোগ্যা হয়েই জন্মেছে। কোন ভবিষ্যৎ নেই, আছে শুধু বর্তমান। সেই বর্তমান ও নোংরা আর আবর্জনায় ভরা।

তারই মাঝে ওই বিশাখা যেন স্বপ্ন দেখে। একটি ঘরের স্বপ্ন।

মিনতিকে চেনে সে, গ্রামের আরও অনেক মেয়েকে দেখেছে, বিয়ে থা হয়ে গেছে তাদের।

ঘর সংসারও করছে তারা। ওরা যেন ভরে উঠেছে কি সুখের স্পর্শে। বিশাখার চিরন্তন নারীমন আজ সব কিছুর মধ্যেই অমনি একটি স্বপ্ন দেখে। মিষ্টি স্বপ্ন!

বিনয়বাবুও সুযোগ খুঁজছিলেন।

এখানের স্তব্ধপ্রাণে সাড়া এনেছেন অসীমবাবু। ধীরে ধীরে এখানেও একটা কেন্দ্র গড়ে উঠছে। বিপ্লবীদের কেন্দ্র। মেদনীপুর চন্দননগরের যোগসূত্র রয়েছে এখানে। সেই রাত্রে ওরা বৃথাই হানা

দেয়নি। পুলিশও খবর পেয়েছে এই পথেই তারা গেছে। তাদেরও নজর রয়েছে এদের উপর।

হঠাৎ ভোর বেলাতেই অনাদি কামার এসে প্রাণগোপালকে ডাকছে। জানলার পাশে থেকে চুপে চুপে ডাকছে। ডাক শুনেই প্রাণগোপাল উঠে বসল।

অনাদি জানায়—সর্বনাশ হয়ে গেছে। পুলিশ সারা গ্রাম ঘিরে ফেলেছে।

অসীমবাবুর এখানে কাল রাতেই কি সব এনেছেন। সেই জন্যেই ওরা খানাতল্লাসী করবে বোধ হয়। ধরা পড়ে গেলে সর্বনাশ হবে।

ওদিক থেকে সে সব জিনিষ সরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতেই হবে। ওরা আজ বিপদে ফেলেছে তাদের। অসীমবাবু প্রাণগোপালকে তাই ডেকে পাঠিয়েছেন।

ভোর হচ্ছে। গোঁসাই পাড়ার ওদিক থেকে প্রাতঃকীর্তনের সুর ভেসে আসে। পাখীগুলো কলরব করছে। হঠাৎ প্রাণগোপালের মাথায় বুদ্ধিটা আসে। সিঁড়ি দিয়ে তর তরিয়ে নেমে এগিয়ে যায় ওই দিকে।

অনাদি অবাক হয়—কোথায় চল্লে পানুদা?

—তুই বোর্ডিং এ চলে যা। মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিয়ে ওখানে আমি যাচ্ছি। ও গেলে ওর হাতেই সবকিছু দিয়ে দিতে বলবি। ওই মালপত্র বের করে আনবে।

অনাদি চলে গেল বোর্ডিং এর দিকে, অসীমবাবুকে খবরটা দিতে হবে।

বিশাখা মাধুকরীতে বের হচ্ছে, স্নান সেরে মাথার চুলগুলো চুড়ো করে বাঁধা।

—বিশাখা।

প্রাণগোপালকে এসময় দেখে চমকে ওঠে বিশাখা। এগিয়ে এল।

—ছোট ঠাকুর ?

—একটা কাজ করতে হবে তোকে বিশাখা। পারবি ?

মেয়েটা ওর দিকে চাইল। মুখে ওর মিষ্টি হাসি। প্রাণগোপাল জানে না মেয়েটা তার জন্য সব কিছুই করতে পারে। বিশাখা মাথা নাড়ে।

প্রাণগোপাল বলে—খুব সাবধানে আনবি জিনিষগুলো। ধরা পড়লেই বিপদ!

বিশাখা হাসল মাত্র। ওর মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই।

খঞ্জনীর সুর তুলে সে এগিয়ে গেল।

বিনয়বাবুও আজ তৎপর হয়ে উঠেছেন। পুলিশ এসে ঘিরে ফেলেছে হোস্টেলের চারি দিক। জয়গতিবাবু ভাবনায় পড়েছেন। …ওদিকে অনেকেই জেনেছে খবরটা।

লোকজন যাতায়াত করছে। বোর্ডিং এর ওদিককার পাড়া থেকে কীর্তন গেয়ে আসছে বিশাখা। মুখে তার মিষ্টি হাসি—দুচোখে কি মাতাল নেশা।

অনাদি কামার খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়। অসীমবাবুর ঘর থেকে মালপত্র সরে গেছে ওরই ভিক্ষার ঝুলিতে। ওরা ওখানে আর কিছুই পাবে না।

রুদ্ধনিশ্বাসে অনাদি একটা কাঁঠাল গাছের নীচে জনতার ভিড়ে মিশে দাঁড়িয়ে আছে, মজাই দেখছে সেও।

—এই হঠ যাও।

বিশাখা কীর্তন থামিয়ে বলে হাসতে হাসতে।

—নাম গান ও করবো না সিপাইজী ? ঠাকুরের নাম ?

ওরা তাকে হটিয়ে দিল—চলা যাও হিঁয়াসে।

ওদিকে দারোগাবাবু দলবল নিয়ে বোর্ডিং এ ঢুকেছেন। মেয়েটা সরে গেল গ্রামের দিকে।

প্রাণগোপাল তাদের গোয়ালের পিছনের গোলাবাড়িতে অপেক্ষা করছিল। কাকে ঢুকতে দেখে চাইল।

—বিশাখা! এনেছিস ওসব?

হাসছে মেয়েটা। দুচোখে ওর তৃপ্তির আভা। পেট আঁচলের থেকে একটা ছোট পুঁটুলিমত বের করে দেয়।

—এই নাও। তা পুলিশগুলোই বা কি!··ওদের কাছেই দাঁড়িয়ে রইলাম!

প্রাণগোপাল ওগুলো একটা জায়গায় মাটির নীচে রেখে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে গজরায়—ধরা পড়লে একেবারে দ্বীপচালান হয়ে যেতিস। বুঝলি?

বিশাখা জবাব দেয়।

—তবু তোমাদের ধরতে পারতো না। তাছাড়া এতো জেলেই আছি গো, নাহয় অন্য কুথাও চলে যেতাম। এইতো?

—বিশাখা! চমকে ওঠে প্রাণগোপাল ওর কথায়।

মেয়েটা দাঁড়লো না। ওর দুচোখ কি অভিমানে যেন ছল ছল করে উঠে। সরে গেল সে।

প্রাণগোপাল ওর সাহসে অবাক হয়েছে। মনে হয় এ ছাড়াও ওর মনে আরও কিছু ছিল যার জন্য এত বড় কাজে এগিয়েছিল সে। মেয়েটাকে ভালো লাগে আজ।

পুলিশ খুঁজেও কিছু পেল না। আজ ও ব্যর্থ হন ওরা।

অসীমবাবু বলেন।

— এ সব খবর কোথা থেকে পান আপনারা?

দারোগাবাবুর মুখটা কালো হয়ে গেছে। এ খবর মিথ্যা নয়। কিন্তু এরা তার চোখে ধুলো দিয়েছে।

তাই রাগটা চেপে চুপ করে রইলেন দারোগাবাবু।

বিনয়বাবু বলেন ওদের।

—চলুন।

ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরছে ওরা। তবু বিনয়বাবুর দৃঢ় বিশ্বাস এ সবের মূলে নিবিড় সত্য কিছু আছে। ওদের সেই ধরার সুযোগ এবার ও হারলেন তিনি। চোখের নিমিষে ওরা মালপত্র সরিয়ে দিয়েছে।

গ্রামের অনেকেই খুশী হয়েছে মনে মনে। সাধারণ মানুষের ওই ভিড়ের মধ্যে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাসও পড়ে, ওরা হাসছে।

—কি হল সিপাইজী? সব ভোঁ ভাঁ?

ওরা চলে গেল নীরবে।

গঙ্গাধরও তফাতে দাঁড়িয়েছিল অনেক আশা নিয়ে। সেইই খবর এনেছিল আজকে। কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে গেল।

তার বরাতে কিছু বকশিস্ জুটতো কিন্তু সেটাও ফস্‌কে গেল এইভাবে। ক্ষুব্ধ হয়েছে গঙ্গাধর।

যদুগোঁসাই একা ছেলেকে ছাড়তে রাজী হননি। তাই অসীম-বাবু ও যাচ্ছেন সদরে, ওর সঙ্গে পাঠিয়েছেন প্রাণকে। তবু কলেজের হাঙ্গামাগুলো মিটোতে পারবেন অসীমবাবু।

প্রাণগোপাল গ্রামের সেই গণ্ডী থেকে বের হয়ে বৃহত্তর কোন নোতুন পরিবেশে এসে পৌঁচেছে।

অসীমবাবুর এ জগৎ চেনা। বইএর দোকানে আগে থেকেই অর্ডার দেওয়াছিল। সেখানে বইপত্র বাঁধাই রয়েছে, খেলার জিনিসপত্র ফুটবল, ভলিবল, বারবেল, ডাম্বল আর ও কি কি কেনা-কাটাতে দুপুর হয়ে গেছে।

সহরের রাস্তার লোক চলাচল কমে গেছে। দুপুরের রোদ পাথুরে রাস্তায় জ্বালা করা উত্তাপের আভাস আনে। দুজনে সাইকেলরিক্সায় করে চলেছে।

দুপাশে ফাঁকা জায়গায় বড় বড় কতকগুলো শাল মহুয়া-শিরীষ

গাছ মাথাতুলেছে। ওরা অতীতের সাক্ষী, সেদিন এখানে ছিল অরণ্যভূমি, ওরা সেই আদিম জীবনের পরিচয়টুকুকে ধরে রেখেছে এখানে।

পাখী ডাকে।

হঠাৎ কলরব ওঠে সমস্বরে—বন্দেমাতরম!

দুপুরের নিঃস্তব্ধতা খান্ খান্ হয়ে যায় ওই চীৎকারে।… সামনেই সদর কোর্ট আদালত! তারই প্রাঙ্গণ থেকে ওই চীৎকার উঠছে। সবকিছুকে অমান্য করার দৃপ্ত প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় ওদের কণ্ঠে।

কয়েকটা প্রিজন ভ্যান থেকে বন্দীদের নামানো হচ্ছে পুলিস প্রহরায়, ধারে কাছে কাউকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না।…ওই বন্দীর দল তবু প্রাণপণে ওই মন্ত্র উচ্চারণ করে চলেছে বলিষ্ঠ কণ্ঠে।

দলে ছেলে-যুবা তরুণ প্রৌঢ় সবই আছে, মেয়েরা পর্যন্ত রয়েছে।

প্রাণগোপাল চমকে ওঠে।

—ওরা যে জেলখানা ভরে ফেলবে মাস্টারমশাই?

অসীমবাবু নিস্পৃহ কণ্ঠে বলেন—জেলেও জায়গা হবে না। চল।

রিক্সাওয়ালা চলতে থাক আবার।

সহরের সীমা ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা নির্জন মাঠের গায়ে পাঁচীলঘেরা বাড়িটা। আশপাশে দু চারঘর জন বসত আছে। বাগ্দী বাউরিদের একটা পাড়াও রয়েছে।

ধুলি ধূসর পথ। এপথে রিক্সাও চলে না। ওরা পায়ে হেঁটে চলেছে।

এককালে কোন জমিদারের বাগানবাড়িই ছিল বোধহয়, আজ তা পরিত্যক্তপ্রায়। বিরাট সীমা প্রাচীরের গায়ে শেওলা জমেছে,

কোথাও কোথাও ভেঙ্গে পড়েছে খানিকটা। গাছ গাছালিগুলোর পাতায় রাস্তার একপুরু ধুলো জমে সেগুলোকে বিবর্ণ বোধহয়।

—মাষ্টার মশাই!

অসীমবাবু ওর দিকে চাইলেন। প্রাণগোপাল ঠিক বুঝতে পারে না কোথায় এসেছে। অসীমবাবু বলেন।

—চল!

বেশ খানিকটা বাগান গাছপালার অযত্নবর্দ্ধিত ঝোপ পার হয়ে একটা ভাঙ্গাবাড়িতে এসে ঢুকলো ওরা।

অসীমবাবু হাঁক পাড়নে।

—মাসীমা! দেখুন কাকে এনেছি।

বের হয়ে এলেন একটি ভদ্রমহিলা, বয়স হয়ে গেছে। চুল-গুলোয় পাক ধরেছে। গায়ের রং যেন দুধে আলতায় গোলা।

এককালে তিনি যে সুন্দরী ছিলেন তার পরিচয় আজও কিছুটা রয়ে গেছে। প্রাণগোপাল যেন এখানে খুব পরিচিত।

মাসীমা আপ্যায়ণ করেন—এসো বাবা। খাওয়া দাওয়া হয়নি বোধহয়?

তার সস্নেহ দৃষ্টি থেকে ওটা এড়ায়নি তারা। মাসীমা বলেন।

—চান টান করে নাও বাবা। পরে কথাবার্তা হবে। যা হোক দুমুঠো মুখে দাও।

প্রাণগোপাল অবাক হয়েছে।

এককালে বিরাট নাম ডাক ছিল এঁদের। জমিদারীও ছিল। কিন্তু সব কোনদিকে চলে গেছে। বিরাট আয়ের সবটাই কোন গোপনপথে চলে যায়। আজ মনে হয় প্রাণগোপালের কিছু মানুষ আছে বাইরে—যারা এই সংগ্রামকে সর্বস্ব দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

মাসীমা সেই আগুনে তাঁর সর্বস্ব সমর্পন করেছেন।

তবু কোথাও এতটুকু ক্ষোভ নেই। বলেন।

—আবার আসবে বাবা। একদিন জানি আমাদের এই সর্বস্বত্যাগ সার্থক হবে।

কথাটা কানে আসে। পুলিশ সব জেনে গিয়ে সহরের ছেলেদের এ্যারেষ্ট করে চলেছে। মেদনীপুর সহর থেকে ছেলেরা এমন কি মেয়েরা অবধি সরে গেছে। পরপর তিনজন ম্যাজিষ্টেটকে ওরা হত্যা করবার চেষ্টা করছে প্রকাশ্য দিবালোকে।

অসীমবাবু কোথায় গেছলেন। ততক্ষণ মাসীমার সঙ্গে কথা বলছিল প্রাণগোপাল। মহীপুরের জমিদার দত্ত বংশের এক সম্রাজ্ঞী তার সামনে। মাসীমা বলেন।

—তবু থামবে না বাবা, এ অঞ্চলে ইংরেজের সব অত্যাচার পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

অসীমবাবু ফিরেছেন। ওরা বের হয়ে এল। সহরের দোকান থেকে জিনিষপত্রগুলো নিয়ে আজ সন্ধ্যাতেই তারা গ্রামে ফিরবে।

প্রাণগোপাল আজ মাসীমাকে প্রণাম করে। অবাক হন তিনি।

—সেকি বাবা। আমরা যে শূদ্র।

—না মাসীমা। আপনি ব্রাহ্মণেরও বড়।

মাসীমা বলেন—আবার এসো বাবা।

অসীমবাবু কেমন যেন গম্ভীর হয়ে রয়েছেন। একটু বেশী সাবধান বলেই বোধ হয় তাকে। মালপত্র নিয়ে ওরা ফিরছে গ্রামের দিকে। সন্ধার শেষ বাসে লোকজন বিশেষ নাই।

অসীমবাবু যেন এমনি নির্জনতাই চেয়েছিলেন।

রাতের অন্ধকারে জঙ্গলের ধারে বাস থেকে নেমে ওরা এগিয়ে আসে। বাড়ির একটা মুনিষ ও ছিল তার মাথাতেই জিনিষগুলো চাপিয়ে দেয়।

লাল ডাঙ্গায় বুক চিরে লাল কাঁকুরে রাস্তাটা এগিয়ে গেছে—

দু একটা মহুয়া গাছের মাথায় চাঁদের আলো উছলে পড়ে। শান্ত স্তব্ধ গ্রামসীমা কালো রেখার মত ফুটে ওঠে সামনে। দূরে দূরে দু একটা আলো জ্বলছে।

অসীমবাবু চুপ করে রয়েছেন। প্রাণগোপাল ও অবাক হয়েছে।

—শরীর খারাপ মাষ্টার মশাই ?

—না !

আর কথা বাড়াতে সাহস করে না সে।

বিনয়বাবু ক'দিন থেকেই কথাটা ভাবছিলেন। বেশ বুঝেছেন তিনি এবার ইলেকশনে তাঁর দল তো জিততে পারবেই না, এমনকি নিজের জেতার সম্ভাবনাও কম। দাঁড়িয়ে হারতে হবে।

গঙ্গাধর ক'দিন থেকেই ঘোরাঘুরি করছে। ওদের সদরে যাবার খবর সেই ই আনে।

বিনয়বাবু থানায় খবরটা পৌঁছে দেন তার দলের বিশ্বস্ত লোকের হাত দিয়ে।

দারোগাবাবু প্রায়ই আসেন এদিকে। বিনয়বাবু অতিথি সৎকার করতে জানেন। দারোগাবাবু অন্যান্য কর্তাদের জন্য তার ঢালা ব্যবস্থা। কাছারি বাড়ির ওদিকের ঘরে খানাপিনার ব্যবস্থাও রয়েছে। গঙ্গাধরের মারফৎ ওদের সমিতির খরব পেয়ে গোপন তদন্তে এসেছেন তিনি।

বিনয়বাবু ও ইতিমধ্যে ওদের নামধাম ও দিয়েছেন।

ক্ষেত্র সবই প্রস্তুত।

দারোগাবাবু এদিকে রসিক ব্যক্তি। দীর্ঘদিন ব্রিটিশ রাজত্বের ধ্বজা ধরে আছেন, তাই এইটাকেই কায়েমী বলে মানেন। কালো মুষকো মুগুরের মত চেহারা, মুখখানা থ্যাবড়া, কালচে রং মাঝে মাঝে ফ্যাকসা মেরে গেছে ওই শ্রীমুখের উপর। নীরবে

গেলাসটা মুখে তুলে গিলে চলেছেন, সঙ্গের একটি বন্ধু বলেন বিনয়বাবুকে।

—শুধু মদ আর মাংস, আমি আবার দুই মকারের নয় স্যার, পঞ্চমকারের সাধক। নিদেন আর একটার ব্যবস্থা করুন।

বিনয়বাবু হাসছেন।

—হবে, হবে স্যার। একদিন জমিয়ে বসা যাবে। ইয়নিয়ন বোর্ডের ভোট হয়ে যাক, বিজয় উৎসব করা যাবে।

দারোদাবাবু টেবিলে থাপ্পড় মেরে নেশাজড়িত কণ্ঠে বললেন—জিতবেন মশায়। আলবৎ জিতবেন।

জেতার ব্যবস্থাই করবো।

বিনয়বাবু হাসছেন। রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

নেশার ঘোরে প্রভুদের চোখ বুজে আসছে।

একটা শিয়াল ডেকে ওঠে। বাড়ির ওদিকে ফাঁকা প্রান্তর। লাল কাঁকুরে ডাঙ্গাটা উঠে গেছে কাছিমের পিঠের মত। শেষ হয়েছে শালবনের ধারে।

তারপরই শালবন সুরু হয়েছে, অন্যদিকে ওই ডাঙ্গাটা ঢালু হয়ে নেমে সোলজমিতে পরিণত হয়েছে ওই বনভূমির কোলে কোলে।

তারার আলোয় অন্ধকার ঘনতর হয়ে ওঠে।

শিয়ালের ডাকটা আবার শোনা যায়। বিনয়বাবু বের হয়ে আসেন।

ওপাশের বন্ধ দরজাটা খুলে যায় নিঃশব্দে। ছায়া মূর্তির মত মানুষগুলো এগিয়ে আসে। ওদের কাঁধে বস্তাবন্দী জিনিসপত্র।

বোধহয় বাসন কোসনই। চাপা স্বরে শুধোন বিনয়বাবু।

—কত আছে রে বিশে?

ছায়ামূর্তিদের মধ্যে থেকে বিশে শোনায়।

—তা মণ পাঁচ হবেক। আস্ত মাল, খুঁট লয়গো। বিশেসর্দার সেদিকে শেয়ানা।

লোকগুলো হাঁপাচ্ছে। গায়ে ওদের তেল মাখানো, হাতে লাঠি। কারও হাতে বল্লম।

বিনয় বাবু একবার কাছারি বাড়ির দিকে চাইলেন। অন্ধকারে তখনও আলোটা জ্বলছে।

বিশে বলে—কত্তারা তাহলে হোই খানে রয়েছেন? ওদের একটুন সামলে রেখো, আমরাও বিনি ঝামেলায় রাতের কাজ হাসিল করে আসি।

বিনয়বাবু টাকাগুলো দেন।

বিশে গজগজ করে।

—বড্ড কমিয়ে দিছেন আজ্ঞা। দেখছেন তো কতো ঝকমারি কাজ। বন্দুক গুলোন্দারও হয়েছে আজকাল।

ডাকাতির কি কম বখেয়া, বলেন আজ্ঞে?

বিনয়বাবু ওদের মুখে এসব কথা প্রায়ই শোনেন। ওরা শোনাবেই। তবু তাকে এমনি চোরাই মালের ব্যবসা করতেই হবে। বলেন।

—সামনের বার পুষিয়ে দোব। তা হ্যাঁরে, সোনা দানা কিছু পাসনি? ভাল দামই দোব।

বিশে হাসছে—তা বলেন দোব। তবে নকড়া ছকড়ায় দিতে লারবো বাবু। ল্যাষ্য দামই দিতে হবেক।

ওদিকের কারখানায় এতক্ষণে মাল গালাই সুরু হয়ে গেছে চোরাই মাল ওই ভাবে রাখা নিরাপদ নয়। রাতারাতি গলিয়ে নোতুন ছাঁচে ঢেলে দিতে হবে আবার, তাই ওসব কাজ রাতের অন্ধকারেই শেষ হয়ে যায়, মাল গালাই ঢালাই অবধি।

বিনয়বাবু কায সেরে ফিরে এলেন গেষ্ট হাউসে।

প্রভুরা তখনও তন্দ্রাচ্ছন্ন। হাসছেন বিনয়বাবু।

সকাল বেলার খবরটা আনে গঙ্গাধর।

—সদরে গেছেন ওরা স্যার! ওই অসীম মাষ্টারের দল—পানুও গেছে।

দারোগাবাবু তখন সকালের খোঁয়াড়ি ভেঙ্গে উঠে বসেছেন। মাথাটা এখন সবে চনমন করছে। ওর কথায় বলে।

—সদরে গেছে ওরা? ফিরবার সময় নজর রাখবেন।

আর—

বিনয়বাবু মাথা নাড়েন। বড়বাবু আর তার বন্ধুকে বিদায় করতে হবে। পুকুরে জাল ফেলা হচ্ছে। দুটো বড় মাছের দরকার।

আর নগদ যেটা দিতে হবে সেটার ব্যবস্থা ও হয়ে গেছে। ওটা দিতে হবে তাঁকে।

সামনে শত্রু; এবাধা উত্তীর্ন হতেই হবে তাকে। তাই দেবতাদের খুশী রাখা দরকার।

বিনয়বাবু ভেবে বলেন।

—আর একদিন আসুন স্যার ওই দত্ত মশাইকে নিয়ে।

বড়বাবুর বন্ধু দত্ত মশায় ইতিমধ্যে সতেজ হয়ে উঠেছেন। ভদ্রলোক বনেদী খোর নাহলে এক বোতল সাদা ঘোড়া শেষ করে বেশ নিটোল হয়ে আছেন। বিনয়বাবুর কথায় তিনি বলেন।

—আসতে রাজী আছি মশাই, তবে ওই যে বল্লাম—ওটা!

বিনয়বাবু গদগদ হয়ে ওঠেন।

—আসুন তো!

গতরাতে নিদেন মণ সাতেক মাল এসেছে, কিছু সোনা দানাও। প্রতি রাতেই একদল না হয় অন্যদল নিয়ে আসে অমনি মালপত্র। ব্যবসা ভালোই চলছে।

বিনয়বাবুর দু একটা বাস পারমিটের দরকার। ওটার তার অনেক দিনের ইচ্ছে। দত্ত মশায়ের সদরের প্রভুদের সঙ্গে বেশ

দহরম মহরম আছে, তাকে হাতে রাখতে হবে। বিনয়বাবু তাই বলেন।

—আর একদিন পায়ের ধুলো দ্যান, আয়োজনের কোন ত্রুটি থাকবে না। ডি—এম সাহেবকেও আমার নমস্কার জানাবেন। এ গুলো রইল।

খুশী হন দত্ত মশায়, মাছ কটা দেখে। নধর রুই মাছ। তখন ও লাফাচ্ছে। বেশ বড় সড়ই। তা নিদেন পাঁচ সের করে হবে। সেই সঙ্গে কয়েক হাঁড়ি দই।

দারোগবাবু কি আশ্বাস দিয়ে চলে যান। সদরেও এখানকার খবর চলে যাবে।

বিনয়বাবুকে ও প্রায়ই সদরে যেতে হয়।

মালি মোকদ্দমা আছে, কায কারবার ও রয়েছে। বিশেষকরে গোঁসাইদের সঙ্গে মহাল নিয়ে দেওয়ানী চলছে, বাগান নিয়ে ফৌজদারী করেছেন নিজেই বিনয়বাবু।

বড় তরফের যদুগোপাল মেজ তরফের নন্দদুলাল গোঁসাই ছোট তরফের সন্তু গোঁসাই তিনজনের বিরুদ্ধে তাঁর মামলা। কয়েক নম্বর মামলাই চলেছে।

গোঁসাইরা বলেন—দৌহিত্র বংশ, শত্রু বংশ। চিরকালই তারা শত্রুতা করবে। পিতৃ পুরুষ খাল কেটে কুমীর এনেছিলেন, এখন উৎপাত সইতেই হবে।

বিনয়বাবু এসব কথা চুপ করে শোনেন।

তাঁর এখন কাঁচা পয়সার আমদানী আছে প্রচুর, ব্যবসা ও বাড়ছে। একদিকে দুর্গাপুর স্টেশন অন্যদিকে বাঁকুড়া সদর শহর—দুই প্রান্তে তিনি মোকাম গড়ছেন। দুর্গাপুরে তখন ঘন জঙ্গল, বসতি বলতে ওই স্টেশনের ধারে পাশে এইটুকু ঠাঁই।

স্টেশন থেকে বের হয়ে একটা রাস্তা ওই জনবসত আর সামান্য দোকান পসারের সীমানা ছাড়িয়ে চড়াইয়ের বুকে ঘন শালবন ঢাকা শাহী সড়কের দিকে চলে গেছে।

রাস্তা ও নাম মাত্র, শক্ত পাথুরে ডাঙ্গা। এমনিতেই সেটা কঠিন অনুর্বর। তার উপর রাস্তার সীমানা দিয়েই পথের রেখা চিহ্নিত করা হয়েছে। মাঝে মাঝে সামান্য কাঁকর পাথর মাটি ফেলা হয়।

স্টেশনে দুচারখানা যাত্রীবাহী ট্রেন দাঁড়ায় মাত্র, সামনেই ধূ ধূ—দামোদরের বালুচর। কাশ বিন্না ঘাসের জঙ্গল মানুষভোর মাথা তুলে শন শন শব্দে ভরিয়ে দেয় উষর বালুচর—আর এদিকের পাহাড়ি মৃত্তিকার বুকে শালবনে কি আদিম আরণ্যক পরিবেশ রচিত হয়।

…জায়গাটা বিনয়বাবুর ভালো লাগে।

ওই রাতের কারবারী মক্কেলদের এটা চারণ ক্ষেত্র। মাল গাড়ি গুলো দেশ বিদেশের মালপত্র নিয়ে যাতায়াত করে। গাঁট গাঁট কাপড় লোহা লকড়—ওষুধ পত্র—যন্ত্রপাতি—চিনি গম—চাল—ডাল নানা কিছু।

…এই জঙ্গলের মধ্যে দুদিকে উচু গর্জ, খাড়াপাহাড়ির নীচে দিয়ে লাইন গুলো গেছে চড়াই ঠেলে, এমনিতেই মালগাড়ি গুলো হাঁপিয়ে পড়ে ওই চড়াই ঠেলতে, তাই মন্থর হয়ে আসে তাদের গতি।

অন্ধকারে সেই মালগাড়িতে হানা দেয় ওই নিশাচরের দল। কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র, অভ্যস্ত হাতের আঘাতে লোহার দরজা খুলে যায়—লাইন থেকে বহু নীচে বন ভূমির মধ্যে গড়িয়ে পড়ে দামী দামী মালপত্র।

গাড়িটা মাঝে মাঝে কি অসহায় যন্ত্রনায় ককিয়ে ওঠে—আর্তনাদ করে সিটি বাজিয়ে। কিন্তু ততক্ষণে ওই নিশাচরের

দল অন্ধকার অরণ্যে উধাও হয়েছে। মালপত্রের কোন চিহ্নও নেই।

বহু নীচে সে গুলো গড়িয়ে পড়েছে—হারিয়ে গেছে।

বিনয়বাবু ব্যবসার জন্য দুর্গাপুরের বাজারেই গদিঘর খুলেছেন, বাসনপত্র—কাপড় চোপড় থাকে সামনে। কেনা বেচাও হয়, আড়ালে পেছনের গুদামে অন্য মালপত্র জমা হয়, আবার পাচার হয়ে যায় নানাভাবে।

...ধানচালের রাখিকারবারও গড়েছেন এখানে। জায়গার কোন দাম নেই। তাই ওই রাস্তার ধারে জঙ্গলের সীমানা অবধি শত খানেক বিঘে ডাঙ্গা বন্দোবস্ত করে নিয়েছেন। যদি তেমন সুবিধা বোঝেন ধানকলই খুলবেন এখানে।

বিনয়বাবুর অবশ্য এসব পরিকল্পনা রয়েছে।

তাই চারদিকে ছুটোছুটি করতে হয় তাকে, মিশতে হয় নানা সমাজে।

অন্ধকারের অতলেও তার একটা জগৎ আছে। ওই বিশে সর্দার—গুপী মাহাতো আরও অনেকের সঙ্গেই তাঁর লেন দেন আছে।

তারাই বলে

—বাবু ওসব মামলা মোকদ্দমার ব্যাপার বুঝি না আমরা। বলেন তো একদিন দিই ওই গোঁসাই প্রভুদের ঘরে ফুক্ দিয়ে। সব সাফ করে দেবো, বলেন তো ওই গোঁসাই প্রভুকেও—ইসারা করে দেখায় ওদের সেই কাযটাকে।

বিনয়বাবু জানেন এটা অতি সহজেই করা যায় এবং করে অন্য ভাবেও সেটাকে চালিয়ে দেওয়া যায়। তবে ওটা শেষ পন্থা, এখনই সেটা করতে চান না।

তাই বলেন।

—না, না। তার দরকার হবে না। তিলে তিলে মারাই

সবচেয়ে বেশী সাজা, একেবারে শেষ করে দিলে মজাটা বুঝবে কি করে বল ?

বিশেসর্দার সায় দেয়।

—আজ্ঞে তা সত্যি।

মামলা মোকদ্দমার ব্যাপার তবু চলেছে। দুপক্ষই উকিল দিয়ে লড়ছে। তবে চেষ্টাটা বিনয়বাবুরই বেশী রকম।

গোঁসাইদের নায়েব বলহরি সামন্ত এমনিতেই পাইকের লোক। সেও এতদিন ধরে গোঁসাইদের সব সম্পত্তির রসটুকু শুষেছে।

এখনও সেই শোষণ পর্ব চালাচ্ছে। ওরা পিঁপড়ের জাত, গর্তে থাকে—তবু আকাশের বর্ষা বাদলের খবর রাখে। তার পূর্বেই ডিম খাবার দাবার নিয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যায়।

বলহরি ও বুঝেছে গোঁসাইদের এবার ধ্বংসের পালা। সেবার শীতলপুরের মৌজা বাকী করের দায়ে নীলামে উঠেছিল,

বাইশ হাজার টাকার মাল্‌গুজারীর মহাল, আয়ও বেশ ভালোই। গোঁসাইদের কাছে এই নোটিশ আর পৌঁছেনি। অবশ্য বলহরি সামন্ত জানতো। সেও কানামুড়ো নাড়ে নি।

একদিন প্রকাশ্য নীলামে সেই মহাল নীলাম হয়ে গেল, খরিদ করেছিলেন ওই বিনয় বাবুই অবশ্য বেনামিদার একজন ছিল।

বলহরি সামন্তের হাতে এসেছিল নগদ কয়েক হাজার টাকা, আর খাসের একটা পুকুরের ষোল আনাই।

বিনয়বাবু কাজ করাতে জানেন, পয়সাও দেন সেই কাযের জন্য।

যখন সেই খবর এসে পৌঁছল যদুগোঁসাই এর কাছে তখন আর ছানি মামলা করার ও সময় নেই। তাছাড়া একত্রে এত টাকা বের করার সাধ্যও নেই গোঁসাইদের।

প্রাণগোপালও শুনেছে কথাটা। চমকে ওঠে খবর শুনে। শীতলপুরের মহাল সে দেখেছে। বিরাট এলাকা, ধান মাঠ কয়েক হাজার বিঘে, পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে শালী নদী। তার জলস্রোত কখনও শুকোয় না। তাতে বাঁধ দিয়ে জল আটকে ওরা আখ আলু নানা ফসলের চাষ করতো।

সোনা ধানের এলাকা এক নিমেষেই শেষ হয়ে গেল। কিছুই করার নেই।

যত্নগোঁসাই বলেন,

—ওই বিনয়ই শেষ করে দেবে আমাদের। তার শয়তানির কাছে হার মানবো আমরা।

—কিন্তু বলহরি নায়েব তো জানতো বাবা?

প্রাণগোপাল কথাটা বুঝেছে। ওই শীর্ণ লোকটাকে সে সহ্য করতে পারেনা। যত্নগোঁসাই বলেন।

—জানে বইকি! তবে কি জানো পান্নু, দুনিয়া টাকার বশ। ওর্ মুখ বন্ধ করেছিল বিনয়। তাই সব হারালাম আমরা।

প্রাণগোপাল নোতুন করে দুনিয়াকে চিনছে। দেখেছে ওই বিনয়বাবু ধীরে ধীরে সবকিছুর মধ্যেই হাত বাড়াচ্ছেন। অন্যায় পথে এগিয়ে চলেছেন তিনি।

কোন নীতির ধার ধারেন না। কোন বিবেকের বালাই নেই। রাতের অন্ধকারে তার ওই কারবারের কথাও জানে অনেকে। কিন্তু কিছু বলার নেই। জেলার কর্তাদের কাছে যাতায়াত করেন। বিনয়বাবুর থানা পুলিশের সঙ্গেও ভাব আছে।

শক্তিমান মদগর্বে বলীয়ান একটি মানুষ আজ ধীরে ধীরে তার কঠিন হাতটা বাড়িয়ে চলেছে। প্রাণগোপাল কি ভাবছে।

তার অন্তরের চাপাপড়া রাগটা মাথা তুলছে কি দুর্বার শক্তি নিয়ে। ওই গোঁসাইদের আর সকলের মত নীরবে এই

অপমান এই শয়তানি সইবে না সে। একদিন জবাব দেবেই সে যে ভাবেই হোক।

গোঁসাইপ্রভু বলেন,

—বলহরিকে জবাবই দেব ভাবছি। নইলে লোকটা আরও ক্ষতি করবে।

অবশ্য বলহরি সামন্ত এটা জানতো, তাই যা পেরেছে হাতামুঠো সরিয়ে নিয়ে সে ওখানকার কাযে ইস্তফা দিয়ে নিজেই পালিয়ে এসেছে।

এ হেন এলেমদার লোকের কাযের অভাব হয় না।

বিনয়বাবুই তাকে তাঁর সেরেস্তায় এনেছেন।

এনে ভালই করেছেন তিনি। গোঁসাই প্রভুদের বিষয় আশয়ের সব খবর ওই বলহরির নখদর্পনে। কোন সম্পত্তি কি প্যাঁচে আদায় করেছিল, কার কাছ থেকে বিনা কওলায় জোরকরে দখল করেছিল। কার খাইখালাসী জমি নিয়ে আর ফেরৎ দেয় নি ওই গোঁসাইরা এসবই জানে বলহরি।

সম্পত্তি মানেই তাই। বলহরিই বলে।

—আজ্ঞে ওসবই ওই এক ব্যাপার। বিষয় আশয় কে আর নায্যমূল্যে করেছে বলুন? তাই দেখতেই সাজানো ফুলের সাজি, নাড়া দেন ঝুরঝুরিয়ে বিবাক পাপড়ি ঝরে পড়বে।

আজ দিন বদলাচ্ছে। দুদল লাঠিয়াল তবু এনেছেন গোঁসাইরা। বাড়িতেও চাপা উত্তেজনার সুর ওঠে।

প্রাণগোপাল দেখছে ব্যাপারটা। ওই ছায়াঘন সুন্দর বাগানটা তারও প্রিয়। কত সকালের মিষ্টি সোনালী রোদে ওখানে ঘুরেছে প্রজাপতির সন্ধানে, সে আর রমা।

মন্দিরের দেবসেবায় ফুল চাই।

গাঁদা, গোলাপ, চামেলী কত রকম ফুল ফোটে সেখানে। সবুজ পাতা মেলে কনকচাঁপা গাছটা মাথা তুলেছে আকাশে, ওর ডালে পাতার আড়ালে ফোটে হলুদ সোনালী আভা নিয়ে চম্পা ফুল।

রমার নজর ওই চাঁপা ফুলের দিকে।

কত বৈকালের আবছা অন্ধকারে তারা দুজনে ওই বাগানে যেন হারিয়ে যেতো। অন্ধকার নামছে গাছ গাছালির বুকে পাখীগুলো ফিরেছে, দল বেঁধে কলরব করছে তারা। বাতাসে উদগ্র হয়ে ওঠে বাতাবি ফুলের মিষ্টি গন্ধ। বুক ভরে দম নিতে কি ভালো লাগে।

ও যেন সারা অনুভূতিতে মিশিয়ে আছে। রমার সেই খুশী খুশী স্বপ্নদেখা ভাবটা তার মনে সাড়া এনেছে।

আজও বাগানের দিকে এসেছিল ওরা। খবরটা প্রাণগোপাল ও জানে, রমাও শুনেছে।

ছায়া নামছে। আমগাছের পাতার প্রান্তে কচি হলুদ মঞ্জরী দেখা দিয়েছে। গুনগুন ওড়ে মৌমাছির দল। মিষ্টি গন্ধ উঠেছে।

রমার দুচোখে কি ভয়ের ছায়া।

—এই বাগান নাকি বিনয়বাবুরা কেড়ে নেবে বলেছে! এটাও ওদের?

প্রাণ জবাব দেয়,

—টাকা থাকলে সবই তাদের হয় গায়ের জোরে।

রমার মুখচোখ কঠিন হয়ে ওঠে।

—তাই বলে বাধা দেবেনা?

প্রাণগোপাল ভেবেছিল বাধা দেবে। এই অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবে না সে। বিনয়বাবুর এই শক্ত হাতটাকে সরিয়ে দেবে। তাই জবাব দেয় সে।

—দেখি বাবা কি বলেন?

রমার মনের অতলে একটু তেজ আছে। সে বলে।

—আমি হলে এর জন্য সব চেষ্টাই করতাম, তবু ওকে দিতাম না।

রাত হয়ে আসে। তারাগুলো জ্বলছে। প্রাণগোপালের কলেজ খুলতে দেরী নেই। এদিকে সমিতির কাযও এগিয়ে চলেছে। অসীমবাবু ও জানেন কথাটা। তিনিও বলেন,

—অন্যায় সহ্য করতে নেই। রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতা মনে পড়ে?

অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে—
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে।

তবু কি জানো? একদিন আসবে যেদিন এর কোন দাম থাকবেনা। এই বিষয় সম্পত্তি সব হবে দেশের মানুষের।

প্রাণগোপাল তার কথাগুলো শুনছিল। অসীমবাবু বলেন,

—আমাদের আরও বড় লড়াই এর জন্য তৈরী হতে হবে পানু, রাতের অন্ধকারে এখন তারই প্রস্তুতি চলেছে।

নোতুন নোতুন ছেলের দল আসে, রাতের অন্ধকারে ওরা চলে যায় শালীনদীর ধারে ঘনবনের মধ্যে। সেখানে টার্গেট প্রাকটিশ হয়। পিস্তলের সেই শব্দ দূর বনসীমা ছাড়িয়ে গ্রামের দিকে আসেনা।

ওরা তাই ওই বনরাজ্যকেই বেছে নিয়েছে। গোঁসাইদের বিস্তীর্ণ জঙ্গল। তাই অন্য কেউ ও আসে না এদিকে।

প্রাণগোপালের নিজের মধ্যে সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আর শক্তি সতেজ হয়ে উঠেছে।

আজ রমার কথায় কি ভাবছে সে।

এই বাগান ওই গাছগুলোকে সে ভালবেসে ফেলেছে নিজের অজানতেই। সেই ঠাঁইটুকুকে ছিনিয়ে নেবে বিনয়বাবু শুধুমাত্র ক্ষমতার জোরে আর সে ভীরুর মত দেখবে, তা হতে পারে না।

তাদের শীতলপুর মহাল নিয়ে নিয়েছে, বাম আমলার সব

চাষজমির দখল নিয়েছে জোর করে। প্রতারণা প্রবঞ্চনা শঠতাই তার মূলধন।

এমনি করে সব সহ্য করবেনা সে।

রমা শুধোয় প্রাণগোপালকে—কি ভাবছো?

এড়িয়ে যায় প্রাণগোপাল ওর কথাটা, বলে।

—রাত হয়েছে। বাড়ি চল!

আজ তার মনের সেই সুর ও ওঠে না। মিনতির বিয়ে হয়ে গেছে তার বরের গল্পও শুনতো রমা। মিনতিটা যেন কি! ওই হাবারাম একটা বর পেয়ে সব ভুলে গেছে। টাঁক মাথা। চোখদুটো লাল। দিনরাত বজ বজ করে পান চিবুচ্ছে।

রমার চোখের সামনে একটি পুরুষের ছবিই আঁকা হয়ে আছে, সে ওই প্রাণগেপাাল। সুন্দর বলিষ্ঠ একটি তরুণ। দুচোখে তার কোন সুদূরের দৃষ্টি। রমা বারবারই সেই ছবিটাকে মনে করেছে। আর সকলের পাওয়ার সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে মনে হয়েছে সে অনেক বড় কিছু পাবার আশা রাখে।

পায়ের নীচের ঝরা শুকনো পাতাগুলো মাড়িয়ে আসছে তারা।
—বুঝলে, মিনতিটা যেন কি। বরটা ও তেমনি। মনে হয় মদটদ খায়। চোখদুটো লাল!

প্রাণগোপাল গম্ভীর ভাবে জবাব দেয়।

—তোর বর হবে গাঁজাখোর।

—হ্যাঁ! রমা ওর হাতে একটা চিমটি কাটে। দুচোখের তারায় পড়েছে আকাশের তারার একটুকু আলোর আভা। দুচোখ নাচিয়ে বলে।

—আমার বর হবে সুন্দর। চুলগুলো কোকড়ানো আর ডাগর দুটোচোখ, দেখতে।

প্রাণগোপাল ওর দিকে চাইল।

রমাও স্বপ্ন দেখে। প্রায়ই বলে সেই স্বপ্নের মধুর স্মৃতির কথা।

প্রাণগোপাল জানেনা ওর অতল মনের রহস্যের কথা। কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে ওই মেয়েটি।

এত দিন ধরে যে মেয়েটিকে চিনেছিল, মিশেছিল তার সঙ্গে এ সেই মেয়ে নয়। আজ সন্ধ্যার অস্পষ্ট রহস্যময় আলোয় ওকে দেখে কি বিচিত্র রূপে।

রমার মাথার চুলে গোঁজা ওই কনকচাঁপার মিষ্টি গন্ধ। কোথায় রাতজাগা একটা পাখী একবার ডেকে থেমে গেল। প্রাণগোপালের সারা শরীর ওর নিটোল দেহের ঘনিষ্ঠ স্পর্শ তার সারামনে কি আবেশ আনে।

আজ সব পেতে চায় সে।

বিশাখার কথা মনে পড়ে। সেও এমনি এগিয়ে এসেছে বার বার। পুরুষের কাছে আজও কিছু নিতে চায় তারা।

রমার চোখে ওই মসৃণ মুখে সেই পাবার দুরন্ত কামনা।

—রমা।

ওকে কাছে টেনে নেয় প্রাণগোপাল। রমার সারাদেহ কাঁপছে। আয়ত দুচোখের পাতায় কি আবেশ নামে।

নিজেকে সঁপে দেয় ওই প্রাণগোপালের বলিষ্ঠ দু হাতের মধ্যে। এই যেন তার সবচেয়ে বড় পাওয়া। ঠোঁটে গালে লাগে ওর ঠোটের উত্তপ্ত স্পর্শ।

...হাঁপাচ্ছে প্রাণগোপাল।

চকিতের মধ্যে সরে দাঁড়াল ওকে ছেড়ে দিয়ে, কি যেন একটা অন্যায় করেছে সে। এতদিনের সাধনা এক নিমেষের ভুলে সে নষ্ট করে দিতে বসেছিল।

মনেপড়ে অন্ধকার রাতে সেই ছায়ামূর্তিদের কথা। ঘর নেই আশ্রয় নেই আছে শুধু সারা মনে দুর্বার একটি শপথের উত্তপ্ততা। একটি কঠিন সাধনায় তারা আত্মবলি দিয়েছে।

রমা ওর দিকে চেয়ে থাকে।...তার দুচোখে—সারা মনে

তখনও সেই নিভৃত একটি সুরের রেশ বাজে।

প্রাণগোপাল বলে।

—চল। রাত হয়ে গেছে!

ও সরে এল নিজের চিন্তার জগতে। সেইখানে এই লুকিয়ে পাওয়া তৃপ্তির কোন দাম নেই। এ শুধু নিমেষের ভুলমাত্র।

রমা খোঁপাটা ঠিক করতে থাকে, নিটোল দুটো হাত উপরে তুলে মাথার খোঁপাটা গুছিয়ে নিচ্ছে, ওর অসংযত দেহের সুন্দর রেখা-গুলো আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

প্রাণগোপাল ওদিকে চাইতে পারে না। জীবনের ওই পরম পাবার অধিকার তার নেই।…তার সামনের জীবনপথ কুসুমাকীর্ণ নয়, সে পথ বন্ধুর—দুর্গম—বাধাময়। মনের অতলের সেই কাঠিন্যটা জেগে ওঠে। এই অন্যায়ের প্রতিবাদ অন্ততঃ সে করবে।

সেদিন বিনয়বাবু সারাগ্রামের লোকদের জানান দিয়েই গোঁসাইদের বাগান দখল নিতে আসছেন। বিনয়বাবু হুঁশিয়ার লোক, তাই আগে থেকে থানা পুলিশেও ব্যবস্থা করে রেখেছেন। যদুগোঁসাই ও খবর পেয়ে ডায়েরী করতে পাঠিয়েছেন থানায়, একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারী করতে পারলে তার দিকে একটু সুবিধা হয়।

কিন্তু গোপাল সরকার ফিরে এসে খবর দেয়।

—ওরা কেউ থানায় নাই, ছোটবাবু বললেন ডায়েরী লিখছি। এলে খবর দোব।

যদু গোঁসাই অসহায়ের মত চাইলেন প্রাণগোপালের দিকে। তাঁর করার কিছুই নেই। তবু বাধা দেবেন তিনি।

যে কজন পাইক লগদি আছে নিয়ে যাও গোপাল। তারপর যা হয় দেখা যাক।

সরে এল প্রাণগোপাল। সে জানে এবার কি হবে

বাইরে তখন ঢোল সহরৎ করে বিশেসর্দার গুপীমাহাতো দলবল নিয়ে বাগান দখল করতে চলেছে। সঙ্গে কুড়ুল নিয়ে চলেছে বেশকিছু লোক। ওরা বাগান দখল নিয়ে গাছ কেটে কায়েম করবে তাদের দখলীস্বত্ব।

রাস্তায় লোক জমে গেছে। পঞ্চগ্রামে খবর রটে গেছে তারাও দেখতে এসেছে দলে দলে। গোঁসাইদের এতদিনের প্রাধান্য আর প্রতিষ্ঠাকে শুধু মাত্র গায়ের জোরে হারিয়ে ওরা দখল নেবে।

বিশাখার ও কানে গেছে খররটা। লতিকা আরও অনেকেই চুপকরে আছে। এ যেন তাদেরই অপমান। বিশাখা বলে।

—বাবুরা কিছু বলবে না?

লতিকা চুপকরে থাকে। দলবেঁধে বিশেসর্দার চলেছে।

বিশাখা দেখছে ওই বাগানের দিকে লোকজনদের। হঠাৎ কাকে দেখে এগিয়ে আসে। প্রাণগোপাল ও দাঁড়িয়ে আছে।

—ওরা সব কেড়ে নেবে?

বিশাখার কণ্ঠে কি বেদনার সুর। প্রাণগোপাল চেয়ে থাকে ওর দিকে। বিশাখার কথায় বলে সে।

—জোর আছে তাই যা ইচ্ছে করবে।

—কোন কথাই বলবে না?

প্রাণগোপাল চুপ করে থাকে। বিশাখা বলে।

—আমি হলে ছাড়তাম না। কিছুতেই না। ওদের লোভ ক্রমশঃ বেড়েই যাবে দিন দিন।

প্রাণগোপাল কি ভাবছে। বাগানে জয়ধ্বনি ওঠে। বিশেসর্দার গুপীমাহাতো মালকোচা দিয়ে কাপড় পরেছে; মাথায় বেঁধেছে লাল শালুর ফালি। হাতে তেলপাকানো লাঠি নিয়ে গোঁসাইদের বাগানে ক'জন পাইকের উপর চড়াও হয়েছে, ওই লোকগুলোর উপর লাঠি চালাচ্ছে নির্দয়ভাবে।

—খবরদার।

প্রাণগোপাল লাফ দিয়ে ওঠে। সারা শরীরে তার উষ্ণ রক্ত স্রোত বয়ে যায়। লোকগুলোর আর্তনাদ কানে আসে।

ওরা বাগানের ফুল সমেত চাঁপা গাছটাকেই কাটছে। বিরাট গাছটায় ওরা কুড়ুল চালাচ্ছে, ওর আঘাতে আর্তনাদ করে ওঠে গাছটা কি নিদারুণ যন্ত্রনায়। ওরা জয়ধ্বনি করছে। কাম ফতে।

হঠাৎ বৈকালের স্তব্ধতা খান খান করে একটা বন্দুকের শব্দ শোনা যায়। দর্শকরা শিউরে ওঠে। বিশেসর্দার আর্তনাদ করে ছিটকে পড়ে মাটিতে। আর একটা শব্দ, এবার গুপীমাহাতের পালা, তার গুলি লেগেছে ডান হাতে। সে উবু হয়ে বসে পড়েছে।

বিশেসর্দারের রক্তাক্ত দেহটা বার কয়েক নড়ে চড়েই স্থির হয়ে যায়। গুপীমাহাতো গর্জাচ্ছে,

—হুঁসিয়ার। হুঁসিয়ার—

লোকগুলো হকচকিয়ে ওঠে।

কোন দিক থেকে আক্রমণ আসবে তা ভাববার আগেই বিপর্য্যস্ত ওই বাহিনীর উপর চড়াও হয় গোঁসাইদের লাঠিয়ালরা।

এবার হারার পালা। ওরা বেদম লাঠির ঘায়ে এদিকে ওদিকে ছিটকে পড়ে, কুড়ুল ফেলেই পালালো ওরা।

বলহরিও ভাবেনি এমনি কাণ্ড ঘটে যাবে। দুচোখ তার কপালে উঠে গেছে। দৌড়েছে সে ডাঙ্গা পথ দিয়ে। পেছনে কাদের কলরব শোনা যায়। বলহরির চোখের সামনে প্রাণ-গোপালের তেজদৃপ্ত মূর্তিটা জেগে ওঠে। তার দিকেই বন্দুক তুলেছিল সে। পড়ে রইল বিশে সর্দারের মৃতদেহ। বিনয়বাবুকে আজ চরম আঘাত দিয়েছে প্রাণগোপাল। বাগানের দখল তিনি নিতে পারেন নি। ওরা তার শক্ত পাঞ্জাটাকে হারিয়ে দিয়েছে।

হঠিয়েছে মাত্র একটি মানুষ একা। সে ওই প্রাণগোপাল। সে স্থির থাকতে পারে নি। তাই নিজেই বাবার ঘর থেকে বন্দুকটা নিয়ে বের হয়ে আসে।

এভাবে সব কিছু সহ্য করবে না সে।

তারপর আর মনে নেই। বন্দুক ছোঁড়া তার অভ্যাস আছে। লক্ষ্যও অভ্রান্ত। বিশে সর্দারকেই গুলি করেছিল প্রথম।

—প্রাণগোপাল। পানু।

প্রাণগোপাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বন্দুকটা তখনও তার হাতে। যদুগোপাল সবই দেখেছেন। এমনি করে একটা সর্বনাশ ঘটে যাবে তা স্বপ্নেও ভাবেননি তিনি। ওরা হেরে গিয়ে পালাচ্ছে, বাগানের দখল পায়নি বিনয়বাবু! জিত হয়েছে ওই গোঁসাইদের।

যদু গোঁসাই আর্তকণ্ঠে বলেন।

—একি সর্বনাশ করলি পানু? খুন করলি শেষকালে ওই বিশেকে?

প্রাণগোপালের কানে যেন কোন কথাই ঢুকছে না। তার চোখের সামনে ওই রক্তাক্ত দেহটা পড়ে আছে। কার আর্তনাদ কানে আসে। গুপীমাহাতো কাতরাচ্ছে।

চোখের সামনে সব কেমন উত্তপ্ত জ্বালাকর বোধ হয়।

—প্রাণগোপাল!

প্রাণগোপাল বাবার কথায় জবাব দেয়।

—বিনয়বাবুকেই মারতে চেয়েছিলাম, ওর সব লোভ খিদে মিটিয়ে দিতাম। সেটা আর আপাততঃ হোল না। বলহরি কোথায়?

তখনও তাকে খুঁজছে প্রাণগোপাল। বলহরি মহুয়া বনের ভিতর দিয়ে দৌড়ছে।

হাওয়ার আগেই খবর চলে গেছে বিনয়বাবুর ওখানে। গঙ্গাধর ও নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিল। বেশ তারিফই করছিল সে বিশু সর্দারের।

—বাহবা কি বাহবা! সাবাস যোয়ান।

ওরা গাছ গুলোয় কুড়োল লাগিয়েছে। ঝপাঝপ শব্দ ওঠে। হঠাৎ বন্দুকের শব্দে চমকে ওঠে গঙ্গাধর।

—বোমা! স্বদেশী বোমা!

পরক্ষণেই দেখতে পায় প্রাণগোপালকে। স্থির লক্ষ্যে সে আবার গুলি করছে। সামনে পড়েছে বলহরি সামন্ত, বলহরি ভয়ে কাঁদছে।

এরপর আর থাকা নিরাপদ নয়। গঙ্গাধর লাফ দিয়ে দৌড়তে থাকে বাঁশবন আতা গাছের জঙ্গল ভেদ করে উর্দ্ধশ্বাসে। তখনও পিছন থেকে কলরব শোনা যায়। লড়াইয়ে হার হয়ে গেছে তাদের।

—অল্‌গান্ স্যার বিনয়বাবু। ম্যাসাকার হয়ে গেল। বিশে-সর্দার কিলড! স্বদেশী গুলি—ক্লিন সট্! গুপী মাহাতো···

বিনয়বাবু চমকে ওঠেন! বন্দুকের শব্দ তিনিও শুনেছেন। ওঘরে তখন ব্যস্ত রয়েছেন তারা, থানার কর্তারাও রয়েছেন—স্থানীয় মাতব্বর—ইউনিয়ান বোর্ডের আরও দুএকজন সভ্য ও রয়েছে। খাবার দাবার আয়োজনের ত্রুটি নেই। মাংস মদও আছে। বেশ গালগল্প সহযোগে বিজয় উৎসব চলেছে, এরই মধ্যে ভগ্নদূত গঙ্গাধরকে ঢুকতে দেখে অবাক হন বিনয়বাবু।

—কি হয়েছে গঙ্গাধর! বন্দুক চালালো কে?

—দ্যাট এর্ণাকিষ্ট—ওই পান্নু স্যার! লাশ দাখিল হয়ে গেছে অলরেডি। এগু বাগানের দখল অল গন্! ব্রাহ্মণ্যদেব ইজ ওল্ড। অনেক তপ জপ করে সিদ্ধি এনেছিলাম—কিন্তু টিকল না।

ওদের তখন গঙ্গাধরের ওই সব বাজে কথা শোনবার সময় নেই। দারোগাবাবু নিজের কর্তব্য সমন্ধে সচেতন হয়েছেন, আর ও সকলে ভয় পেয়েছে। এমনি একটা সাংঘাতিক কাণ্ড বাধবে তা ভাবতেই পারেনি।

আহত গুপী নাথ এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, তার হাতটা রক্তে ভেসে গেছে, লাঠির ঘাও খেয়েছে অনেক।

আর একজন ফিরতে পারেনি। কোনদিনই আর বিশে সর্দার ফিরবে না, তার প্রাণহীন দেহটা পড়ে আছে ওই বাগানের মাটির উপর। বলহরি সামন্ত চোখ কপালে তুলে বলে।

—খুব চোট গেছে বড়বাবু! বন্দুক তুলেছিল আমার দিকেও। ওরে বাপ্‌রে!

বিনয়বাবুকে ওই একটি মাত্র ছেলেই চরম আঘাত হেনেছে, তার উঁচু মাথাটায় পা দিয়ে তাকে শুইয়ে দিয়েছে। নিদারুণ ভাবে হেরে গেছেন তিনি।

—শয়তান!

গঙ্গাধর বলে চলেছে।

—দৈত্যকুলের পেহ্লাদ!

সারা গ্রামের লোক ভেঙ্গে পড়েছে। খবর ছড়িয়ে গেছে পাঁচখানা গ্রামে। প্রাণগোপাল একাই বিনয়বাবুর দলকে হারিয়ে দিয়েছে।

জমায়েত হয়েছে অনেকেই। রমাও খবর পেয়ে দৌড়ে এসেছে।

মেয়েরা তফাতে দাঁড়িয়ে আছে, রমার চোখের সামনে প্রাণগোপালের সুন্দর দেহটা ভেসে ওঠে। ওর মুখে চোখে তখনও দুর্বার কাঠিন্য।

বলছে সে।

—আমি এপথ ইচ্ছে করেই নিয়েছি, ওর অন্যায় জমেজমে পাহাড় প্রমাণ হয়ে উঠেছিল। সেই অন্যায়টাকেই বাধা দিয়েছি।

কোন দুঃখ আমার নেই।

ললিতারাও এসেছে। বাগানের সেই চাঁপা গাছটায় লেগে রয়েছে নিষ্ঠুর কুড়ুলের দাগ।...সেটাকে ওরা কাটতে পারেনি। বিশাখা চেয়ে দেখছে প্রাণগোপালকে।

আজ মনে হয় ওই মানুষটিকে সে ও যেন চেনে না। এতদিন

সকাল সন্ধ্যায় যাকে দেখেছে, তার মিষ্টি হাসি মাখা সেই মুখ খানা আজ বদলে গেছে। ও যেন দূরের মানুষ।

দারোগাবাবু, পুলিশ এসে পড়েছে। বিশাখা কাঁদছে অজানা আতঙ্কে।

—কি হবে পিসী?

ললিতাও জানে না। সেও বুঝেছে ব্যাপারটা অনেক দূর অবধি গড়াবে। ছেলেটা নিজেই জড়িয়ে ফেললো। মনে মনে তবু খুশী হয়েছে ললিতা। বিশাখার দিকে চাইল। তার ডাগর কালো দুচোখে জল নেমেছে।

—ওকে পুলিশে ধরবে?

ললিতা জবাব দিল না। বিশাখার চোখের জল আজ বাধা মানে না। আজ সে ওই প্রাণগোপালের জন্য চোখের জল. ফেলে।

অসীমবাবু ও এসে পড়েছেন। আর করার কিছুই নেই। যদুগোপালের কাছারি বাড়িতে লোক ধরে না। প্রাণগোপাল নিজেই স্বীকার করেছে সব কথা। তার মনের সেই জ্বালাটা তখনও কমেনি।

বিনয়বাবুকেই শাসায় সে।

—আপনাকেই মারবার ইচ্ছা ছিল. ভেবেছিলাম দেখা পাবো। তা'হলনা। আর একটা বুলেট তোলা রইল আপনার জন্যে। গোঁসাই বাড়ির ছেলেদের একটু সমঝে চলবেন। মহাপ্রভুর প্রেমের নীতি তারা আর মানবে না।

যদুগোপাল কথাটা মানতে চান না।

—কি যা তা বলছিস পানু?

প্রাণগোপাল জবাব দেয়—না বাবা। ওই মতবাদ মেনে মেনে তোমরা সব কিছু হারিয়েছো। ওই বৃটিশের দালালদের মাথায় তুলেছো।

বিনয়বাবু ওর কথা গুলো শুনছিলেন। মনে মনে ছেলেটাকে সত্যি আজ ভয় করেন তিনি। ওর কথা গুলো নিছক বাজে কথা নয়। বিনয়বাবুর সব মুখোস আজ ওর কাছে খুলে পড়েছে। ওই ইংরেজ বিরোধী কথা উঠতেই বিনয়বাবু বলেন দারোগাবাবুকে।

—কথাগুলো রেকর্ড করে নিন বড়বাবু! খুনীতো বটেই তাছাড়া ওর মোটিভ এবং মতবাদকেও চিনুন।

দারোগা বাবু মাথা নাড়েন। তিনি তার সব কর্তব্য ঠিকমত পালন করে চলেছেন।

অসীমবাবু চুপ করে থাকেন। বিনয়বাবু শোনান।

—কেমন শিক্ষা দিয়ে তৈরী করেছেন দেখুন অসীমবাবু! নাউ ইউ আর অল কট্।

যদুগোপালবাবু জামিনের চেষ্টা করেন। কিন্তু এখানে কিছুই হবে না। দারোগাবাবু ওকে ছাড়তে রাজী নন। বিশেষ করে বিনয়বাবুর জন্যই।

প্রাণগোপাল বলে

—বিনয়বাবুর প্রাণের ভয় খুব বেশী তাই এখানে আমাকে রাখা নিরাপদ ভাবেন না তিনি। তবে তাতেও বিপদ কমবে না।

রমাও এসেছে। তার দুচোখে জল। দূরে একপাশে দাঁড়িয়ে দেখছে বিশাখা। সারা গ্রামের লোকজন এসেছে। তার মধ্যে দিয়ে ওরা প্রাণগোপালকে এ গ্রাম থেকে এখানকার সবুজ ছায়া-স্নিগ্ধ পরিবেশ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলেছে।

কে জানে আর ফিরে আসবে কি না।

প্রাণগোপাল আজ বদলে গেছে। এই অন্যায়কে সে মেনে-নিতে পারেনি। তারই প্রতিবাদে সে চরম আঘাত হেনেছে।

হঠাৎ রমার দিকে চোখ পড়ে। কাঁদছে সে। ওরা জানে প্রাণকে নিয়ে যাচ্ছে সদরের হাজতে। রমার দুচোখে জল দেখে প্রাণগোপাল কঠিন হবার চেষ্টা করে।

—কাঁদিস না রমা, আবার ফিরে আসবো আমি।

ওদিকে কারা ছলছল চোখে চেয়ে দেখছে তাকে। একটি চেনা মুখ চোখে পড়ে। বিশাখা দাঁড়িয়ে আছে। কত চাঁদের আলো ভরা সন্ধ্যার স্মৃতি কত বকুল ফুলের গন্ধমাখা নিঃশ্বাস এর সুরভি মিশিয়ে আছে ওর সঙ্গে। এই গ্রামের বন্ধুরাও এসেছে। তাদের বলে প্রাণগোপাল।

—সমিতির কায যেন বন্ধ না হয় বুঝলি।

যদুগোপালকে প্রণাম করে সে। মা নেই—জীবনে একটা চরম বাঁধন থেকে সে মুক্ত। তাই বোধ হয় এক জায়গায় সে কঠিন! সামনেই অসীমবাবুকে দেখে প্রণাম করে বলে।

—একটু ভুল করলাম মাষ্টার মশাই। মিস ফায়ার হয়ে গেল। টার্গেটে লাগলো না গুলিটা। ফিরে এলে ওটা চেষ্টা করবো আবার। বলহরি আর বিনয়বাবুর জবাব দোব।

—চলুন!

দারোগাবাবুর বাহনরা তাকে টেনে নিয়ে চলেছে, এখান থেকে গরুর গাড়ীতে করে থানায় নিয়ে যাবে—তারপর সদরে। পথ তার সামনে—ছায়াসুনিবিড় এই গ্রামখানার সীমা ছাড়িয়ে লাল কাঁকুরে ডাঙ্গা আর শালবনের মাঝে হারিয়ে গেল একটি তরুণ—প্রাণগোপাল গোস্বামী।

যদুগোঁসাই তবু ছেলেকে খালাস করবার জন্য চেষ্টার ক্রুটি করেনি। কলকাতা থেকে ব্যারিষ্টার এনেছিলেন,...এ তার সম্মানের প্রশ্ন। অন্যদিকে সরকার ও সেই চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে উঠে পড়ে লেগেছিল।

...বিনয়বাবু তখন প্রেসিডেণ্ট। দেশেদেশে আগুন জ্বলে উঠেছে। ইংরেজ সরকারকে বিপন্ন করার—উৎখাত করার সেই চেষ্টায় ওরা সব রকম বাধা দিয়েছিল। দলেদলে এ্যারেষ্ট করেছে,

বিনয়বাবু পল্লী সমিতিকে ভেঙ্গে তছনছ করে দিয়েছেন। অসীমবাবু ও জেলে। সারা এলাকায় ওরা প্রতিরোধের পাষাণপ্রাচীর গড়েছিল, তাকে ভেঙ্গে দিয়েছেন। বিনয়বাবুকে সরকার খুশী হয়ে রায়বাহাদুর খেতাব দিয়েছেন।

জীর্ণ প্রাসাদের ইট খসে পড়ছে একে একে। গোঁসাইবাড়ির বুকে এসে লেগেছে প্রচণ্ড একটা আঘাত! যদুগোঁসাই তবু সেই আঘাতকে ঠেকাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। প্রাণগোপালের মামলার খরচ আছে, বাইরের একটা মহালই বিক্রী করেছেন। আর ক্রেতা ওই বিনয়বাবুই। এবার ও বেনামিতে তিনিই কিনেছেন সেই মহাল।

তাছাড়াও দিনগুলোও কেমন বদলে গেছে!

যুদ্ধ বেঁধেছে।

হু হু করে জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে, দিন চালানো দায়। ওই দেবসেবা—অতিথশালা চালাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন যদুগোঁসাই। সঞ্চিত ধান যা ছিল কয়েকটা গোলায়—সব চলে গেছে।

ধান।...ধানের দর সোনার দরের সামিল হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেই গোলা ভর্তি ধান কোনদিকে হারিয়ে গেছে। যদুগোঁসাই ভাবনায় পড়েছেন!

সেই মনের মুক্ত আকাশটুকুও নেই। আজ যেন তিনি বাজপড়া একটা তালগাছ। সব সবুজ পুড়ে গেছে। টিকে আছে মাত্র বিবর্ণ সেই কাণ্ডটা।

ললিতাও বুঝেছে সেই কথা। তাদেরও দিন বদলাচ্ছে। অভাব ক্রমশঃ নগ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। ঠাকুরবাড়ির সেই যথেষ্ট বরাদ্দ আর নেই।

ভাঁটার নদীর মত সব শুকিয়ে আসছে। মাধুরী আরও সকলে কি যেন ভাবছে। ওদের চোখের সামনে দুনিয়ার অন্যরূপ ফুটে ওঠে।

যদুগোঁসাইও বিশেষ এদিকে আসেন না। তাঁর শরীর ভালো নেই, মনে এখন অনেক চিন্তার ভিড়। সেই মিষ্টি মনটা কোথায় হারিয়ে গেছে।

সন্ধ্যা নামে, কাছারিবাড়িতে আর লোকজন নেই। যারা আছে তারাও এদিকের পথ ভুলে গেছে। এখন বিনয়বাবুর বৈঠকখানায় নাহয় নোতুন স্কুল বাড়িতেই যায় তারা। ঢালাও চায়ের ব্যবস্থাতো আছেই, তাছাড়া আছে অন্য কিছুর ব্যবস্থাও।

বিনয়বাবু এখন সেই ভাগ্যের সঙ্গে উঠেছেন ওই যুদ্ধের কল্যাণে। বনের কাঠ—বাঁশ জিনিষপত্র মায় পাথর অবধি যোগান দিচ্ছেন ওই পানাগড়—বুদবুদ মিলিটারী ক্যাম্পে। দুর্গাপুরেও নানা কাজ কম্মো হবে, ঘরবাড়ি তৈরীর কনট্রাক্ট নিয়েছেন বিনয়বাবু! গ্রামের অনেক বেকারই তার আশেপাশে ঘুরছে। আগামীদিনের তরুণদের কাছে তিনিই একমাত্র ভরসা।

....তাই যদুগোঁসাই আজ বাতিলের দলে।

সন্ধার অন্ধকারে একাই বসে আছেন। চোখের সামনে সেই ছবিটা ভেসে ওঠে। প্রাণগোপালের পনোরো বছর কয়েদ হয়ে গেছে! আর বোধহয় তাকে ফিরে আসতে দেখবেন না তিনি। ধীরে ধীরে পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। সাজানোবাগান শুকিয়ে গেল কি রুদ্রনিঃশ্বাসে।

কার পায়ের শব্দে ফিরে চাইলেন তিনি।

—তুই!

ললিতা আসছে। আগেকার ভালোলাগা সেই ললিতা। ক বছরেই সে ও যেন বদলে গেছে। ওর কাঁচা মুখখানায় এসেছে একটু বয়সের ছাপ আর কাঠিন্য। ডাগর চোখদুটোয় সেই নেশা লাগানো চাহনি আর ফোটে না!

যদুগোঁসাই ওকে দেখছেন, ললিতা এগিয়ে এসে প্রণাম করল।

—ভালো আছিস?

ললিতা হাসল, একটু মলিন বিবর্ণ সেই হাসি। বলে।

—দিনকাল বদলে গেল। পাড়ার খবরও ভালো নয়। মাধুরী দুর্গাপুর না আসানসোল চলে যাবে বলছিল! তাছাড়া পাড়ায় তো আর শান্তিতে বাস করা যায় না।

যদুগোঁসাই ওর দিকে চাইলেন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে। বলে চলেছে ললিতা।

বিনয়বাবুর লোকজনও যায়। সামন্ত মশায় সেদিন মাধুরীকেই বলছিল নানা কথা। অনেক টাকা দেবে। রাতের আঁধারে ওই বিনয়বাবুর কাছারি বাড়ীতেও যায় দু একজন।

যদুগোঁসাই তাও জানেন। দেখেছেন রাতের অন্ধকারে পানাগড় দুর্গাপুর থেকে দু একটা মিলিটারী জিপ আসে, ওদের হেড লাইটের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে গ্রাম সীমা, ওই বাগানগুলো। জিপের গুরু গুরু গর্জনে কেঁপে ওঠে চারিদিক, গ্রামের শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ওরা আসে ঝড়ের মাতন তুলে। গ্রামের প্রাণসবুজে তারা হানা দিয়েছে।

বিনয়বাবু ওদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন এবং তার জন্য দরকার পড়ে নারী মাংসের। কাঁচা টাকা, অনেক টাকা ওদের। তাই এখানে সেই বেসাতিরও অভাব হয় না।

এতদিন গোঁসাইদের ঠাকুর বাড়িতে তারা প্রসাদ খেয়েছে। খাবার থাকবার ভাবনা ছিল না। একটা প্রাচীন বটগাছকে আশ্রয় করে বহু বিহঙ্গী নীড় বেঁধেছিল, শান্তিতে বসবাস করছিল। কিন্তু হঠাৎ সর্বনাশা ঝড়ে সেই আশ্রয়দাতা বনস্পতি আজ ভেঙ্গে পড়েছে। শাখাশ্রয়ী পাখীগুলোও কলরব করে আকাশে ওঠে।

সামনে কোন আশ্রয় নেই, দিশাহারা তারা। শিকারীর শিকারেই পরিণত হয়।

যদুগোঁসাই ললিতার কথায় কি জবাব দেবেন জানেন না। তাঁর সব ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। প্রাণগোপালকে বাঁচাতে পারেনি

বিনয়বাবু সব শেষ করে দিয়েছেন। এখন তিনিই এখানকার সর্বেসর্বা—রায়বাহাদুর। বাহাত্তুরই বটেন।

যত্নগোঁসাই বলেন।

—কি আর করব বল, সবই মহাপ্রভুর ইচ্ছা। একদিন ফুলে-ফলে ভরে ওঠে, আবার সব হারিয়ে যায়। ঝরে যায়।

ললিতা শোনায়।

—তাই বলে এইসব চলবে?

একজন এর প্রতিবাদ করতে চেয়েছিল, তাকে ওরা কারা-প্রাচীরের আড়ালে পুরে দিয়েছে। ওদের বিজয় রথ চলবেই মহাপ্রভুরও সাধ্য নেই এর গতি রোধ করার।

যত্নগোঁসাই বলেন।

—এই বোধহয় অধর্মযুগ। আরও অনেক কিছু হবে ললিতা, তাই মনে মনে ঠাকুরকে বলি, এই সব দেখবার আগে—ছুটি দাও চলে যাই। এ খেলা ফুরিয়ে যাক।

ললিতা চুপকরে ওই অসহায় লোকটির দিকে চেয়ে থাকে। ওকে বেদনা দিতে সে চায়নি। এসব কথা নিয়ে আর আলোচনাও করবে না, ওরা যা পারে করুক। সহ্য করে যাওয়া ছাড়া আর পথ নেই।

রাতের অন্ধকারে শান্ত ঘুমঢাকা গ্রামসীমার আকাশ বাতাস কাঁপছে। এক ঝলক তীব্র আলোর রেখা এগিয়ে আসছে ওই শালবনের দিক থেকে। কোন বন্য পশু যেন হিংস্র মাদকতা নিয়ে তাদের এই লোকালয়ে হানা দিয়েছে।

চমকে দাঁড়াল ললিতা। বাঁধের পাড় দিয়ে আসছিল, ওপাশে ডাঙ্গার ওখানে গড়ে উঠেছে বিনয়বাবুর নোতুন কাছারি বাড়ি বাগান আরও কি সব। সেখানে আলো জ্বলছে। কাঁচের জানালা দিয়ে আলো এসে পড়েছে, পথে গাড়িগুলো ওখানে এসে থামল। রেডিও এনেছে বিনয়বাবু। কি বিদেশী বাজনার শব্দ ওঠে ওখানে।

পাড়াগ্রামের এই পরিবেশে সেটা বেমানান।

ললিতা পাড়ার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। বকুল গাছের ফুলগুলো ঝরে ঝরে পড়ছে। বাতাসে তারই সুবাস। অন্ধকার বাড়িগুলোও সুপ্তিমগ্ন। পথে কার হাসির শব্দ শুনে চমকে দাঁড়াল ললিতা। মাধুরী আর ও বাড়ির বাসিনীকে দেখে দাঁড়াল। বলহরি সামন্ত সামনে দাঁড়িয়েছিল, ললিতাকে দেখে সরে গেল সে।

—কিগো দিদি। সামন্ত মশায় নেমতন্ন করতে এসেছে যাবো নাকি? মাধুরী ডাকছে ললিতাকে।

ললিতা জবাব দিল না। বাসিনী আর মাধুরী সেজেছে আজ। ওদের বিগতযৌবন দেহে যেন লাস্যের বান ডেকেছে। বাসিনী বলে।

—হরিনাম করে আর কি হবে বলো, তার চেয়ে নগদ নারায়ণই ঢের মিষ্টি।

মাধুরী শোনায়—বিলিতি তো খাওনি। বুকের জ্বালা জুড়িয়ে যায় মাইরী ললিতাদি। গোরাসাহেবদের কাছ থেকে আনবো দেখবে।

ললিতা চুপ করে ওদের কথাগুলো শুনছে। ওরা এমনি করেই হারিয়ে যাবে। বাসিনী হাঁকে।

—কই গো, সামন্ত মশাই, আঁধারে ছাপিয়ে গেলে নাকি। ছামুতে এসো। তুমিই তো লোতুন বিন্দে দূতি গো, চল সব বেন্দাবনেই যাই।

হাসছে বাসিনী।

ললিতা ওদের বাধা দিলনা, ওরা অন্ধকারে এগিয়ে গেল ওই কাছারি বাড়ির দিকে।

বাতাসে বকুল ফুলের মিষ্টি গন্ধটা কেমন করুণ কান্নার মত ঠেকে।

হঠাৎ কার কান্নার শব্দ শুনেই চমকে উঠে ললিতা। এগিয়ে

যায়, দেখে ওপাশে অন্ধকারে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে বিশাখা, কাঁদছে সে।

—তুই!

বিশাখাকে এখানে দেখবে কল্পনা করেনি ললিতা। ওর সম্বন্ধে তার ধারণা অন্যরকমই ছিল। মেয়েটা রূপবতী—কালো ডাগর দুচোখে জল নেমেছে। মাঝে মাঝে ওকে দেখে ভেবেছে ললিতা ওই রূপ যৌবনেরই বা কি সার্থকতা। শালবনের আড়ালে ফোটা কুর্চি ফুলের মতই লোকচক্ষুর আড়ালে ফুটে ঝরে যাবে।

তাদের জীবনে এইটাই সত্যি, নিজেও এমনি করে ঝরে ঝরে ফুরিয়ে গিয়ে আজ নগ্ন অভাব আর অপমৃত্যুর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

মাধুরী বাসিনী ওরা যেন সেই নিশ্চিত মৃত্যুটাকে বুঝতে পেরে সহসা প্রতিবাদমুখর লাস্যময়ী হয়ে উঠেছে।

—কাঁদছিস্ কেন?

বিশাখা ওর দিকে চাইল। বলে।

—ওই লোকটা ভয় দেখাচ্ছিল! বললে এমনিতে না গেলে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে। কদিন ধরেই আসছে এই পাড়ায়।

—ঘরে চল!

ললিতা ওকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। বিশাখার সারা মনে অজানা একটা ভয়ের কালোছায়া নেমেছে এমনি জমাট অন্ধকারের মত।

ললিতা জানে এই সর্বনাশ থেকে তাদের মুক্তির পথ নেই। এতদিন দেবতার কাছে তারা পুজো দিয়েছে, হরিনাম করেছে, ওই নিয়েই জীবন কাটিয়েছে সেই দেবতার কৃপায়। কাদা যা লেগেছিল সেটুকুও মুছে গেছে চোখের জলে, কিন্তু এবার সেই শান্ত জীবন যাত্রায় এসেছে দুর্বার একটা প্লাবন।

ললিতা ওই থেকে মুক্তি পথের সন্ধান জানে না, বিশাখাকে তবু সান্ত্বনা দেয়।

—চুপ কর বিশাখা! কাঁদিসনা।

বিশাখার চোখের সামনে ভেসে ওঠে আজ একজনের কথা, প্রাণগোপালকে সে ভোলেনি, সেইদিনের তেজস্বী মূর্তিটা তার চোখে আজও সজীব হয়ে আছে।

একপাল দানবের সামনে সেদিন বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছিল একা সে। ওই বলহরি সামন্ত সেদিন প্রাণ ভয়ে কাঁছাকোচা খুলে দৌড়েছিল মাঠ বাগান পার হয়ে।

সেদিনের ওই বলহরি সামন্ত আজ বাঘ হয়ে উঠেছে। বিশাখার সামনে এসেছে বার বার, নানা প্রলোভন দেখিয়েছে। তাকে শহরে নিয়ে গিয়ে রাখবে। গ্রামে এই অভাবের মধ্যে পড়ে থাকা তার সাজে না।

আরও কি সব বলেছিল লোকটা, টাকাও দেখিয়েছিল, অনেক টাকা। সেও নাকি এত টাকা রোজগার করতে পারবে, লোকটাকে দেখে ভালো লাগেনি বিশাখার।

প্রায়ই আসে। আজও এসেছিল। তার কথাবার্তার সুর আলাদা, আজ ভয়ই দেখিয়েছে তাকে।

মাধুরীও বলে তাকে।

—বুঝলি, কি হবে এখানে পড়ে থেকে? এই পাড়াগাঁয়ে? বিজলি বাতি আছে—টাকা কতো চাই বাইরে? ভালো শাড়ি পরবি—গয়না পরবি লো।

ওর কথাগুলো বিশাখার ভালো লাগেনি। বাসিনী বলে।
—বোকা তুই! কি হবে ওই হরিনাম করে আর বাতাসা চিবিয়ে? ছুড়ি যৌবনেই বিবাগী হবে। সেই ছোঁড়া তো এখন জেলে ঘানি টানছে। তুই এই বেলা নিজের পথ দেখ।

বিশাখার কাছে সব কেমন একটা জটিল প্রশ্নে পরিণত হয়েছে।

তাই ভয় লাগে, এলোমেলো চিন্তা জাগে মনে।

প্রাণগোপালও এমনি কত জাগর রাত্রে ওদের কথা ভেবেছে—কতদিন কেটেছে এই জেলখানায় তা জানে না, আরও কতদিন কাটাতে হবে তার জানা নেই। তবু দিন গোনে, এ গোনার শেষ নেই দিন মাস বছর সব একাকার হয়ে গেছে।

জেলের অন্ধকারে বসে সেই মুখগুলো মনে পড়ে প্রাণগোপালের। অসীম মাষ্টার—সমিতির কথা—বাবার মুখখানা—বিনয়বাবুর সেই শয়তানি-ভরা চাহনি সবকিছু ছাপিয়ে মনে পড়ে ওই বিশাখার কথা, ভীরু সলাজ চাহনি ভরা দুটো চোখ, কপালে চন্দনের টিপ। সেই মেয়েটাকে ভোলেনি আজও। কতবছর পার হয়ে গেছে।

বছরগুলো হালকা ডানা মেলে পাখীর মত এসেছে আবার চলে গেছে সময়ের আকাশ পথে। তবু অনেক বদলে গেছে সবকিছু সেই আসা যাওয়ার অবকাশে।

রমার কথা মনে পড়ে! জীবনে একটু স্নিগ্ধতার অবকাশ ছিল সেখানে, সেই সব সঞ্চয়কে সেদিন এত নিবিড় করে পেতে চায় নি। ওগুলো পথের দুদিকে ফেলে সে নিছক কি পাবার স্বপ্নে এগিয়ে গিয়েছিল। সেই ফেলে যাওয়া সব কিছুকেই মনে পড়ে। কিন্তু সবই যেন দূর আকাশের ওই তারার মতই ধরার বাইরে চলে গেছে। এমনি দিনে খবরটা পেয়েছিল প্রাণগোপাল—যদুগোঁসাই-এর মৃত্যু সংবাদ।

কদিনের জ্বরে তিনি মারা গেছেন।

জেলে বসেই খবরটা শুনেছিল প্রাণগোপাল। এতদিন ধরে তার মনের মধ্যে একটা কঠিন সত্ত্বা ধীরে ধীরে মাথা তুলেছে। সমুদ্র মন্থনের কথা শুনেছিল সে তাদের ঠাকুর বাড়ির কথকতার আসরে। সমুদ্র থেকে নানা ধনসম্পদ, উচ্চৈঃশ্রবা—অমৃত সবই উঠেছিল তবু

লোভী দেবাসুর আরও কিছু পেতে চেয়েছিল, শেষকালে তাই উঠেছিল গরল।

তার মনের অতলের সব ঘটনা—সব চরিত্র—একালের মানুষের মনের সম্পদ আর শূন্যতা নিয়ে অনেক ভেবেছে সে। একা একা রাতদিন ভেবেছে। বিনয়বাবুর উপর তার ঘৃণাই বেড়েছে। পিছিয়ে পড়া একটি নতুন যুগের উপর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ওই নতুন শ্রেণী এগিয়ে আসছে, বিনয়বাবু তাদেরই একজন।

জেলেই দেখেছিল প্রাণগোপাল, অনেকেই এসেছে। তাদের আশপাশের গ্রামের ছেলেদের ওই বিনয়বাবুই পুলিশ লাগিয়ে স্বদেশী মামলার আসামী করেছেন, এই বিশ্বাসঘাতকতার বিনিময়ে তিনি পেয়েছেন 'রায় বাহাদুর' উপাধি।

যদুগোপাল গোঁসাই-এর সব হারিয়ে গেছে, নিঃস্ব, রিক্ত একটি মানুষ। একদিন সব ছিল—আজ সব হারিয়ে গেল তার।

প্রাণগোপাল জানতো, এমনি করে সব হারিয়ে যাবে। তাই মনে মনে সে কঠিন—আরও অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে সে।

তার জীবনের একটি সবুজ শ্যামল অস্তিত্বের অপমৃত্যুই ঘটলো।

প্রাণগোপাল কেমন যেন বদলে গেছে।

মাঝে মাঝে জেলে পূজো—টুজো হয়, একটা অশ্বত্থ গাছের নীচে ওয়ার্ডার পাহারাওয়ালারা শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছে, সেখানেও পূজো হয়।

প্রাণগোপাল সেখানেও প্রণাম করতো, তাদের প্রসাদী বাতাসাও মুখে দিত ভক্তি ভরে। সেদিন তার মনে হয়তো কোন প্রার্থনা ছিল। আশা ছিল আবার সব সে ফিরে পাবে, তাই বোধ হয় দেবতাকে ঘুষ দিতো।

কিন্তু রমাও চলে গেছে, তার নাকি বিয়ে হয়ে গেছে শুনেছে। গ্রামে আর নেই সে। বাবাও মারা গেলেন, তাদের বিষয় আশয়ও আজ যাবার পথে, ওই বিরাট প্রাসাদ এইবার ভাঙ্গা ইঁটের

পাঁজায় পরিণত হবে। কোথাও কোন আশা নেই— নির্ভর নেই। চোখের সামনে দেখেছে অন্যায় অত্যাচারই আজ বড় হয়ে উঠেছে।

দেবতার দিন ফুরিয়ে গেছে।

সমুদ্রমন্থনে উঠেছে গরল, দেবতারা পরাজিত হয়েছে; জয়ী হয়েছে অসুরকুল।

মাথা নুইয়ে আর কোন লাভ নেই।

— বাবুজী!

মন্দিরের চাতাল থেকে শিউশরণ সিং তাকে ডাকছে। শিউ-শরণ দেখেছে ওই প্রাণগোপালকে, ভক্তিমান বাবু! দেবতাকে প্রণাম করে প্রসাদ নেয়, কিছুদিন থেকে দেখছে সে, ও বদলে যাচ্ছে। আজ প্রণাম না করেই চলে গেল, তাই ডাকছে সে।

—বাবুজী, প্রসাদ।

প্রাণগোপালের কাছে ওই শিবমূর্তি আজ নিছক পাথরের বস্তু মাত্র।…নির্জীব—নিষ্প্রাণ একটি জড় পদার্থ। বিশ্বাস! হাসি আসে প্রাণগোপালের। কথাটা জানাতে পারে না, হাত পেতে দুখানা বাতাসা নিল, সরে এসে নর্দমায় ফেলে দেয় সেইগুলোকে।

—প্রসাদ! দেবতা!

বিশ্বাস আজ তার নেই। সেটুকুও হারিয়ে গেছে তার।

মুক্তির জন্যও প্রার্থনা জানায় না।

মনের ভিতর থেকে সব নরম—সব কোমল ঠাঁইগুলো যেন মুছে যাচ্ছে। নির্বাসিত একক একটি সত্ত্বা কি দুর্বার শপথের আগুনে দগ্ধ হয়ে প্রাণহীন হয়ে উঠছে।

খবরের কাগজটা আসে জেল অফিসে। সেইটুকুই তার বাইরের জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র। বদ্ধ ঘরের জানালার বাইরের অশ্বত্থ গাছে পাতা ঝরে যায়। কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে আসে রক্ত লাল ফুলের সমারোহ, বাতাসে উষ্ণতা ফুটে ওঠে।

ডালে ডালে পাখীগুলো বাসা বাঁধে। এই তার কাছে বছর পার হবার হিসাব।

কাগজে খবরটা দেখে মাত্র। কিছুদিন ধরে হাওয়া বইছিল অন্যদিকে। জেলের অনেক স্বদেশী বাবুরা এখন খালাস পেয়েছে, বিয়াল্লিশের সেই আগুন জ্বালানো দিনের আসামীরাও বের হয়ে গেছে।

প্রাণগোপাল রাজবন্দী নয়—সে খুনের আসামী। তাই তার মুক্তি মেলেনি। বাইরের জীবনে—সমাজে তার কোন প্রয়োজন নেই। তাকেও প্রয়োজন নেই কারোও। সমাজের বাতিল একটি প্রাণী।

এমনি দিনে সমারোহ করে খবরটা আসে। ছড়িয়ে পড়ে জেলখানার আকাশে বাতাসে। দীর্ঘ দুশো বছরের পর তারা ইংরাজের শাসন মুক্ত হয়েছে।

চমকে ওঠে প্রাণগোপাল।

বাইরে সহরে বাজী পোড়ানো হচ্ছে। অন্ধকার আকাশে লাল নীল হাউই-এর ফুলকীগুলো ঝরে পড়ে।- সচকিত শিখায় দিগন্ত ঝলসে দিয়ে সগর্জনে বোম ফাটছে। খুশীর আবেশে মেতে উঠেছে সারা শহর। দেশের কোটি কোটি মানুষ।

প্রাণগোপালও স্বপ্ন দেখেছিল অতীতে। দেশ স্বাধীন হবে, তারা দূর করবে ওই বিদেশী শাসকদের।

অনেক রক্তপাত, অনেক ত্যাগ—বহু দুঃখ সয়েছে তারা। অন্ধকার রাতের সেই ঘরছাড়া ছায়ামূর্তিদের কথা ভোলেনি সে। মনে পড়ে অসীমবাবুকে। কোথায় রাজবন্দী হয়ে কাটিয়েছেন জীবনের সব যৌবন— প্রৌঢ়ত্ব।

তাদের আত্মত্যাগের দাম কম নয় এই স্বাধীনতায়, আজ তারা কে কোথায় জানে না। হয়তো আবার ফিরে আসবে এইবার।

এতদিন ধরে যে অন্যায়— যে অত্যাচার আর পাপকে প্রশ্রয়

দিয়েছিল বিদেশী শাসকরা, সেগুলো সমাজের বুক থেকে মুছে যাবে। আবার শান্তি ফিরবে দেশে। মানুষ সুখী হবে।

মন দিয়ে অনেক আশা নিয়ে কাগজখানা পড়ছে সে।

জেলার সাহেব বলেন,

—এইবার আপনারাও ছাড়া পাবেন প্রাণবাবু! এখন থেকে নতুন করে গড়ে তুলুন সব কিছুকে।

প্রাণগোপাল হঠাৎ আবিষ্কার করে—দীর্ঘ অনেকগুলো বছর তার জীবনের উপর দিয়ে অনেক দহন রেখে চলে গেছে।...প্রায় একযুগ হয়ে গেল। পূর্ণ যৌবন নিয়ে এখানে এসেছিল, তখন ছিল অস্থযুগ। কর্মক্ষমতা ছিল অনেক বেশী। বুকে ছিল অনেক আশা।

আজ সব হারিয়ে গেছে।

তবু নতুন কি আশার আনন্দে তার দীর্ণ বুক আবার ভরে ওঠে। হয়তো মুক্তি পাবে—আবার ফিরে যাবে সেই গ্রামে। তার নিজের চেনা জগতে।

সবগুলো যেন একসূত্রে বাঁধা, সব ঘটনা আর তার ফলশ্রুতি। বিনয়বাবু জীবনের মূলমন্ত্রটাকে ঠিক ধরে ফেলেছেন। বড় হবার মূলমন্ত্র। ধাপে ধাপে উপরে উঠেছেন।

দুর্গাপুরকেই মূল কেন্দ্র করে ব্যবসা গড়ে তুলছেন। যুদ্ধের দামামা বেজেছে—এবার নতুন দিকে হাওয়া বইছে। এতদিনের প্রোথিত মূল শিকড়টাকে তুলে নিতে বাধ্য হবে এবার ইংরেজ সরকার।

এতদিন যাদের অবলম্বন করে বিনয়বাবু ভাগ্যকে গড়েছিলেন, আজ অনেক কিছু পেয়ে পেয়ে চতুর সাবধানী হয়ে উঠেছেন আরও। তাই আগে থেকেই বুঝতে পেরেছেন এই দিনবদলের ব্যাপারটাকে। তাই এখন থেকেই তিনিও রং বদলের চেষ্টা করছেন—বহুরূপীর মতই।

টাকা ! তাঁর হাতে অনেক টাকা। সুতরাং কিছু কেনাবেচার ব্যাপারে তার কোন অসুবিধাই হবে না। সেই সুবিধেই নিতে চান তিনি। তাই নতুন করে এবার পা ফেলার চেষ্টা করছেন বিনয়বাবু।

বলহরি সামন্ত তবু থামেনি।

ওখানে বাতাসের মাঝে কোন শূন্য স্থানই থাকেনা। রাজ্য পদও কোনদিন খালি থাকবে না। চাকা ঠিকই চলবে। ওই ওঠা-নামার ব্যাপারে তার কিছু করে নেওয়াই দরকার।

অনেক জমা পাপকে সে দেখেছে, মানুষের অন্তরের সব কিছু গুণের আড়ালে কোথায় লুকোনো পাপটা আছে, তিল প্রমাণ হয়ে সেটা তার নজর এড়ায় না।

সেই দিব্যদৃষ্টিই তার মূলধন।

তাই সহরে তার কারখানা, গদি ঘরের এদিকে ওদিকে নিজের একটা ব্যবসা গড়ে তুলেছে। যুদ্ধ মন্বন্তরের পর বহু কাঁচা পয়সা এখনও ছড়িয়ে আছে। মানুষের মনের সেই বাঁধভাঙা উচ্ছলতাকে সে বেসাতি করে তুলেছে।

তাই ওই গুপ্ত বৃন্দাবনের সখীদের তার দরকার। এতকাল ধরে গাঁয়ে চোলাই মদ তৈরী হয়েছে। গ্রামেই সেগুলো সাবধানে রা বিক্রী করেছে।

বলহরি সামন্তের হাতে অনেক কর্তাব্যক্তিই আছে। যথাযোগ্য হানে কিছু প্রণামী দিয়ে বলহরি এবার ওরই ফলাও কারবার শুরু রেছে। শহরে চালান যায়। বিনয়বাবু জানেন তবু তিনি কিছু খরা নিয়েই খুশী থাকেন। তাঁরও কাজে লাগে ওসব।

ললিতা চুপ করে সবকিছু দেখেছে মাত্র। তার মন গুলোকে সায় দিতে পারে নি। বাসিনী মাধুরীকে তাই কথাটা পষ্ট করেই বলেছিল

—ওসব যদি করতেই হয়, এখানে নাইবা থাকলি ?

বাসিনী মাধুরী এখন কাঁচা পয়সার স্বাদ পেয়েছে। ধ্বসে পড়েছে গোঁসাই বাড়ির সবকিছু বৈভব আর গৌরব। সেই দিনগুলোর কথা স্মরণ করে বেঁচে থাকা যায় না।

তাই ললিতার কথায় হাসে মাধুরী।

—তবে কি হবিষ্যি করে পড়ে থাকতে হবে এখানে ? তোমার ওটা করা সাজে। গোঁসাই প্রভুর মনের মানুষ তুমি—

ললিতার মুখচোখ রাগে অপমানে লাল হয়ে ওঠে। ওই ইঙ্গিতের অর্থ বোঝে সে। মাধুরীর এই সাহস কোথা থেকে হয় সেটা জানে সে।

তাই চুপ করে থাকে।

বাসিনী বলে।

—গোঁসাইদের ভিটেতে আছি এই তো ? এ সব ছেড়ে দোব।

ললিতা কথাটা নিজের মুখে বলতে পারে নি, বিশাখার মনে ও ওরা ঝড় তুলেছে, ওদের চলে যাওয়াই ভালো।

পাড়ার শান্ত জীবন যাত্রা কোথায় হারিয়ে গেছে। অন্ধকারে অনেকেই আসে। মদ এমন কি মাংস ও আমদানি হয়। এ পাড়ার শুচিতা ওরা নষ্ট করেছে।

বিশাখার কথা ও ভাবে ললিতা।

মেয়েটাকে ওরাই বিগড়ে দিয়েছে। তেমনি সহজ সরল নেই সে। ওর মনে কোথায় একটা ঝড়ো মেঘ দেখা দিয়াছে।

বিনয়বাবুর ওখানে বিশাখাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা ও করেছে যাত্রা শুনতে। তাই নিয়েই বাধা দিয়েছিল ললিতা।

—তুই যাবি না ওদের সঙ্গে।

—কেন ?

ললিতা ওর প্রশ্নে অবাক হয়।

—বললাম যাস না যাবি না। এতো কথা কেন ?

ললিতা সরে গিয়েছিল। তার শরীর ভালো নেই। শুতেই গিয়েছিল। রাত হয়ে গেছে।

ললিতার ঘুম আসেনি। শুয়েছিল। বিশাখা ওদের সঙ্গে বের হয়ে গেছে যাত্রা শুনতে। তার কথা মানেনি।

ওরা যাবেই। ললিতা বাধা দিলে ও শুনবে না।

বিনয়বাবু স্বাধীনতা উৎসবে ঘটা করে বাজি পুড়িয়েছে বহু টাকার। গ্রামের অন্ধকারকে তিনি দূর করেছিলেন একদিনের ওই হাউই এ। কাঙ্গালী ভোজন ও হয়েছে। তারপর যাত্রার আসর বসেছে।

সদর থেকে কর্তারা এসেছেন—পাশপাশের গ্রামের মাতব্বররা ও এসেছে। দুর্গাপুর পানাগড় থেকেও অনেক হোমরা—চোমরাকে এনেছেন খাতির করে।

ডায়নামো দিয়ে বিজলী বাতি বসিয়ে যাত্রা হচ্ছে কাছারি বাড়ির বিস্তীর্ণ উঠানে। অন্যদিকেও আয়োজনের কোন ত্রুটি হয় নি। বলহরি সামন্ত ওইদিকেই ব্যস্ত। ও-পাশের বাংলোয় বিশিষ্ট অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা হয়েছে।

যাত্রার দিকে নজর তাদের নেই। অনেকের চোখেই তখন গোলাবী আমেজ দেখা দিয়েছে। যাত্রার মিষ্টস্বাদ ইতরজনের জন্য, ভ্রমর কুল তখন অন্যকিছুর স্বাদ সন্ধানে মত্ত।

সে স্বাদ আরও মাদকতাময়, আরও তীব্র।

বিশাখা মাধুরী আর বাসিনীর সঙ্গে এসেছিল এইদিকে। তার মন পড়ে আছে যাত্রার আসরের পানে। সেখানের আলো ঝলমল পরিবেশে ওই বাজনার সুর কানে আসে।

—ওদিকে যাবে না মাধুরীদি ?

বাসিনী হাসছে। ও আজ সেজেছে। মাধুরীর সারা দেহে যৌবনের উছল ঢেউ। জামাটাও পরেছে অনেক ছোট—সিল্কের

শাড়িখানা গা থেকে খসে পড়েছে। বাসিনীর মুখে চোখে কি বিচিত্র হাসি। বিশাখাকেও সাজিয়েছে তারা।

ওর কচি মুখখানায় কি অপরূপ মাধুর্য। বাসিনী বলে।

—যাত্রা ঢের দেখবি। এখন চলতো।

ওকে নিয়ে ওপাশের বাগানের ছায়ান্ধকার বাংলোর দিকে এগিয়ে যায়।

বলহরি সামন্ত যেন এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। বিনয়বাবুকে চুপিচুপি বলে।

—ওরা এসে গেছে স্যার। সেই মেয়েটাও। গাড়িও তৈরী।

বিনয়বাবু মাথা নাড়েন। আজ তার পরনে আদ্দির পাঞ্জাবি, গলায় চাদর। কোঁচানো ধুতিটা মাটিতে লুটোচ্ছে। বিশেষ অতিথিদের আপ্যায়নে ব্যস্ত।

কাদের গাড়িতে তুলে দিতে গেলেন।

রাতের অন্ধকারে ওই জায়গাটায় একটা অস্ফুস্ট আর্তনাদ ওঠে চকিতের জন্য। সে ক্ষীণ আর্তনাদ আর প্রতিবাদের সব চেষ্টাকে এক নিমেষেই স্তব্ধ করে দিতে জানে ওরা।

বিশাখা চুপ করে যায়। তাকে একটা কঠিন হাত ছোঁ মেরে গাড়িতে তুলে দরজা বন্ধ করে দিল।

ষ্টার্ট দিয়ে গাড়িখানা লাল ডাঙ্গার বুকের রাস্তায় মিলিয়ে গেল, বলহরি সামন্তও হাসছে।

মাধুরী বলে,

—শেষে কিন্তু মেরে ফেল না সামন্ত মশাই!

সামন্ত হাসছে, পাঞ্জাবীর নীচেকার ফতুয়ার পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে ওদের হাতে তুলে দিয়ে বলে,

—সামন্ত এসব ভোলে না গো। এবার চল কোন শহরের নব বৃন্দাবনে, তোমাদের জন্যই তো সব।

কাজ হাসিল হয়ে গেছে। এবার মাধুরী বাসিনীও চলে

যাবে এখান থেকে। ললিতার ওই সব কথা আর নীতি বাক্যের জবাব দেবে তারা।

সতীত্ব!···সবই তাদের কাছে আজ অর্থহীন হয়ে উঠেছে। টাকা—শাড়ি—গহনা—লোকের স্তাবকতা—প্রতিষ্ঠা অনেক কিছুর স্বপ্ন দেখে তারা।

যাত্রা তখনও পুরো দমে চলেছে।

সতী লক্ষহীরার স্বামী ভক্তির প্রকাশে সচকিত বিমুগ্ধ জনতা তখন চোখের জল ফেলছে।

বিনয়বাবুও আসরে বসেছেন পারিষদবর্গকে নিয়ে। গঙ্গাধর গরদের পাঞ্জাবীর উপর চাদর ঝুলিয়ে আসরের শান্তি রক্ষায় ব্যস্ত। বলে ওঠে সে,

—গ্রাণ্ড স্যার! সতীত্বের এই সিনটা ভারি সুন্দর। দেখুক শুনুক সবাই। যাত্রা থেকে বেশ টিচিংও হয়ে যায়। সতীত্বই বড় কথা! লোকশিক্ষা দিচ্ছেন কিন্তু যথার্থ শিক্ষা।

বিনয়বাবু হাসেন।

—তবু পাঁচজনের দেখে শুনে জ্ঞান হলেই ভালো। এ গুলো ত আজকের সমাজেই প্রয়োজন।

—সিওর! গঙ্গাধর মাথা নাড়ে। পরক্ষণেই গর্জন করে ওঠে কোন ছেলের দলের গোলমাল শুনে।

—এ্যাও! নো নয়েজ। গোলমাল করবে না।

সতী তুলসী তখন কাতর স্বরে নারায়ণকে ডাকছে।

বিশাখার ফুঁপিয়ে ওঠা কান্না তখন শাল বনের স্তব্ধতার গভীরে হারিয়ে যায়। তাকে ওরা জোর করেই ধরে নিয়ে গেল কোন নরকের অতলে।

নতুন দিনই এগিয়ে আসছে। কয়েক মাইল দূরে দামোদরের

উপর গড়ে উঠছে নতুন দুর্গাপুর। ললিতার কাছে এ সবের অর্থ ঠিক জানা নেই। অনেক কথাই শুনেছিল সে। গঙ্গাধর এখন মাতব্বর ব্যক্তি।

খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী পরে গঙ্গাধর এখন এ-গ্রাম ও-গ্রাম ঘুরছে। শিবথানে সেইই মিটিং করছে, তেরঙ্গা পতাকা তুলে।

বিনয়বাবুকে সভাপতি করেছে, গলায় ফুলের মালা। নিতু বাগ্দী, ভুলু মুখুজ্যে—ইউনিয়ন বোর্ডের সকলেই আছে। হেড-মাষ্টার জয়গতিবাবু কি সব বক্তৃতা করছেন।

ললিতা দাঁড়িয়ে দেখে মাত্র দূর থেকে।

সেদিনের সেই মানুষগুলো কোথায় হারিয়ে গেল। অসীম মাষ্টারকে এখান থেকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছল। যদু গোঁসাই আজ নেই। আর একজন যে ছিল এখানকার অন্যতম কর্মকর্তা সেই প্রাণগোপালও জেলে।

ওরা তাদের সরিয়ে দিয়ে আজ নিজেরাই সব কিছু দখল করে বসেছে। তাদের জন্য এখানে আর কোন ঠাঁই নেই।

ছোট স্কুলটা এইবার স্বাধীনতা লাভের পর আরও বড় স্কুলে পারণত হবে, ওখানেই নতুন করে মেয়েদের স্কুল গড়ে উঠবে। বলহরি সামন্ত এখন লায়েক হয়ে উঠেছে। সেইই ঘোষণা করে ওই স্কুলের জন্য সেইই জায়গা দেবে, গঙ্গাধর জোরে হাত তালি দিয়ে ওঠে।

—সাধু—সাধু।

বিনয়বাবুও টাকা দেবেন তার জন্য।

সভার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে অনাদি কামার। আজ তার বয়স হয়েছে। বলিষ্ঠ বেঁটে চেহারা। এককালে সে ছিল অসীমবাবুর ছাত্র, প্রাণগোপালের বন্ধু।...ওর ভক্তও ছিল।

কঠিন স্পষ্টবাদী লোক। এমনিতেই ডাকাবুকো।

ক'বছর জেল খেটে গ্রামে ফিরে এসে নিজেই বাটি গামলা

গড়ার শাল তৈরী করে সেইখানেই কাজ কর্ম করে। তার নামে পুলিশে রিপোর্ট কে করেছিল তা জানে অনাদি।

ওই বিনয়বাবু—গঙ্গাধরের দলই সেদিন স্বদেশী মামলার আসামী সাজিয়েছিল তাকে।

সেও দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে এসেছিল, ললিতাকে দেখে শুধোয়।

—কেমন আছো গো দিদি? মিটিং শুনছ দেখছি!

ললিতা হাসল মাত্র। অনাদি বলে,

—লঙ্কা ভাগ হবে এইবার। দেখছো না ভক্তির বহর। এতকাল দেশের জন্য ভেবে ঘুম হয়নি গঙ্গাধরের।

গঙ্গাধর ওর দিকে চাইল, কথাটা কানে গেছে তার। কিন্তু কঠিন ওই অনাদিকে চেনে সে। মাঝে মাঝে দু একবার তাকে শাসিয়েছে অনাদি। গঙ্গাধর তাই ভয় করে ওকে। এমনিতেই গোঁয়ার—ভয় ভীত কিছু নেই।

ওকে এড়িয়ে চলে। গঙ্গাধর তাই ললিতাকে শাসায়। —মিটিং শুনতে এসে গোলমাল করছিস কেন? না বুঝিস—চলে যা।

অনাদিই জবাব দেয়।

—বুঝিয়ে দ্যান কেনে গো ভালো করে। কাল অবধি ব্রিটিশ রাজ ছিলে—আজই আবার গান্ধীরাজ, স্বদেশী হয়ে গেলে কিনা, সেই ডিগবাজীটা ঠিক মানতে পারছে না ও। কম বুদ্ধির মেয়ে কিনা তাই বুঝিয়ে প্রাণজল করে দাও ঠাকুর, নইলে গোলমেলে ঠেকবেই তো!

গঙ্গাধর—বিনয়বাবুও কথাটা শুনেছেন, বিনয়বাবু একবার চোখ তুলে চাইলেন সভাপতির আসন থেকে, অনাদি কঠিন একটি পাষাণ মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে।

ওই লোকটাকে তিনিই স্বদেশী মামলার আসামী করে—আর বিয়াল্লিশের মামলায় জুড়ে বছর পাঁচেক জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা

করেছিলেন। নামোপাড়ার ছিদামও তাদেরই একজন। গোলমাল সুরু হতে সেও অনাদির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। পিছনে রয়েছে কামার পাড়ার ফুরফুরে অবধি।

বিনয়বাবু হাওয়া খারাপ বুঝে গঙ্গাধরকে বলেন,

—চুপ করো গঙ্গাধর। স্বাধীন হয়েছি আমরা—সকলেরই কথা বলার অধিকার আছে হে। ডেমোক্র্যাসি বোঝো না?

জয়গতিবাবু তখন হাত পা নেড়ে লেকচার দিয়ে চলেছেন।

—স্বাধীন দেশে শিক্ষার প্রসার হোক এর জন্য বিনয়বাবুর মত লোকেদের চেষ্টা কম নেই। জেলার দেশপ্রেমিক জনদরদী—সর্বত্যাগী কর্মীদের মধ্যে বিনয়বাবু অন্যতম। ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিনিই এ অঞ্চলে প্রথম আন্দোলন সুরু করেন—রক্তক্ষয়ী আন্দোলন।

কোন এক ফচকে ছোঁড়া একটা ভাঙ্গা পাচীলের উপর ঠ্যাং ছড়িয়ে বসেছিল। ওদের কথায় বেশ চীৎকার করে বলে।

মাইরি? কেলাসে ইতিহাস পড়াচ্ছেন নাকি স্যার? সব মিছে কথা।

—এ্যাও, গঙ্গাধর গর্জন করে ওঠে।

সভায় কলরব শোনা যায়। আবার থিতিয়ে আসে। জয়গতিবাবু থতমত খেয়ে আবার মিইয়ে যাওয়া ধানিপটকার মত লেকচার শোনাতে থাকেন মৃদু মন্দ গতিতে।

বিনয়বাবু দেখছেন দিনবদলের পালা। তার হিসাব ব্যর্থ হয় নি।

পানাগড় ছিল মিলিটারির তীর্থ, সেখানে তীর্থকাক হয়ে অনেক রসদ সংগ্রহ করেছেন। এবার এসেছে নতুন তীর্থ দুর্গাপুরে।

দামোদর নদীর উপর ব্যারেজ হচ্ছে। বিশাল সেই দুর্বার নদীকে ওরা বাঁধ দিয়ে জলাধার করেছে। আদিম আরণ্যক

পরিবেশে ওরা নতুন করে শহর গড়ে তুলেছে। বিরাট বিরাট ট্রাকটর বুলডোজার নেমেছে বিস্তীর্ণ বালুচরে। বালির পাহাড় সরিয়ে ওরা কনক্রিটের শক্ত বাঁধন দিচ্ছে নদীকে।

বাঁকুড়ার সঙ্গে ওই দুর্গাপুর এক হয়ে যাবে। ওই খোয়াঢাকা সরু রাস্তাটার রূপ বদলে যাবে। কালো পিচঢাকা শক্ত হাইওয়ে গড়ে উঠবে। ওর বুক দিয়ে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ছুটবে মাল বোঝাই ট্রাকগুলো, যাত্রীবাহী বাস—সভ্যতার জোয়ার আসবে এই আদিম আরণ্যক বন পাহাড় ঢাকা রাজ্যে।

এই বিরাট ভাঙ্গা গড়ার দিনে বিনয়বাবুর দলও বসে নেই। মাটির নিচেই পাথর, জমাট আগ্নেয় শিলার স্তর। কালো সেই পাথরের দাম আজ অনেক। কন্‌ক্রিটের যুগে ওর বহু প্রয়োজন্‌।

বনভূমি ঢাকা টিলার বুক ফাটানো হচ্ছে ডিনামাইট দিয়ে। রাশি রাশি পাথর উঠছে, ট্রাক বোঝাই হয়ে চলেছে তারা ড্যামসাইটে।

ওপারে দামোদরের বুক থেকে স্তরে স্তরে উঠে গেছে সবুজ হরিত বনসীমা। শালবনগুলো উঠে গেছে আকাশসীমার দিকে।

এককালে এই বনভূমি ছিল সামন্তরাজা ইছাই ঘোষের গড় এলাকা। দুর্ভেদ্য সেই বনরাজ্যে আজ মানুষ নতুন দিনে গড়ে তুলছে কারখানা—হাজার হাজার কোয়ার্টার। সাদা বাড়িগুলো বনের সবুজে গড়ে উঠেছে।

বিনয় বাবু মিলিটারি বেস থেকে কয়েকখানা ট্রাক কিনেছেন, সেগুলো বনপাহাড় থেকে ওই পাথর তুলে আনছে।

দীর্ঘ বহু বছরের পর জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়েছে প্রাণগোপাল। বহুদিন পর সে ফিরছে বাড়ির দিকে। সকালের আলো পড়েছে শাল বনের বুকে। লাল কাঁকর ঢাকা রাস্তাটার রূপ তখনও বদলায় নি। শহর থেকে বাস বোঝাই যাত্রী আসে

নদার পারে, ওই ড্যামসাইটে কাজ করে, কেউ বা কনষ্ট্রাকশন এর ব্যাপারে রয়েছে।

লোকজনও দিনবদলের একটা আভাস বুঝেছে। চাকরাও মেলে ওখানে গেলে। কাজ করার লোক চাই। কাঠ বাঁশ সবকিছুই চলেছে এদিক থেকে তরি তরকারি, মাছ, দুধ, ডিম যা দাম বলে তাতেই বিক্রী হয়।

চারিদিকে একটা স্বচ্ছলতার আভাস এসেছে। আগেকার সেই অভাব আর হাহাকার খানিকটা কমেছে।

সবুজ শালবনের ধারে এসেছে ছোট রাস্তাটা। মিশেছে বড় রাস্তায়। মোড়ে দুচার ঘর লোকের বসতি। দু একটা চায়ের দোকানও গড়ে উঠেছে।

আগে এখানে ছিল ঘন বন। মানুষ সাবধানে সন্তর্পণে পার হতো। আজ সেখানে বাস দাঁড়ায়। এখানকার গ্রাম গ্রামান্তরের অনেক মানুষই ওই দুর্গাপুরের দিকে যায় নানা কাজে। তাই চায়ের দোকানেরও দরকার হয়েছে।

তবু বনভূমির শান্তস্তব্ধ রূপ এখন কিছুটা টিকে আছে। লম্বা লম্বা শালগাছগুলোর পাতার প্রান্তে এসেছে শাল ফুলের মঞ্জরী। মহুয়া গাছের পাতা ঝরে গেছে—বিবর্ণ ডালগুলোয় এসেছে হলুদ ফুলের সমারোহ। ভিজে বাতাসে তখনও মিষ্টি গন্ধ ওঠে। কেঁদ গাছের রং বদলে গেছে, হলুদ গোল গোল ফুলগুলো পত্রাবরণের ফাঁক থেকে নিটোল পূর্ণতা নিয়ে উঁকি মারে।

শান্ত স্তব্ধ বনভুমি ; পাখী ডাকছে।

সকালের বাসেই এসে নেমেছে প্রাণগোপাল। কত বছর পার হয়ে গেছে ঠিক হিসাব করেনি। যে মানুষ একদিন এখান থেকে গিয়েছিল সে মানুষ এ নয়, অনেক দেখেছে সে—ভেবেছেও। দীর্ঘ ক'বছর তার অন্তরে ভাঙ্গাগড়া চলেছে—তারপর নতুন একটি মানুষ বের হয়ে এসেছে সেই জেলখানা থেকে।

তার কাছে জীবনের অর্থ বদলে গেছে। বদলে গেছে দৃষ্টি-কোণও।

আনমনে চেয়েছিল প্রাণগোপাল বাস-এর জানালার বাইরে। সেই পথ, সেই পরিবেশ সব বদলে গেছে তার নিজের অন্তরের মতই। পথের ধারে চেনা দু একটা গাছ দীর্ঘ ক'বছরে অনেক বেড়ে উঠেছে। খোয়া-ঢাকা রাস্তায় পড়েছে কালো পিচের প্রলেপ।

বেলেতোড়ের হাল বদলে গেছে। ছোট্ট সেই গ্রামের বাইরে গড়ে উঠেছে সাদা টিনের শেড দেওয়া হাসপাতাল, ছোট ছোট কোয়ার্টার। কোথায় রঙ্গীন বোগেন ভিলা ফুটেছে সবুজ পাতার মধ্যে মধ্যে। বিজলী বাতি এসেছে—সেই তেলেভাজা চায়ের দোকানের রূপ বদলেছে, টেবিল চেয়ার—বিজলী আলো এসেছে, রেডিও বাজছে।

অনেক অচেনা মুখের ভিড় সেখানে। সেই খাটো ধুতি ফতুয়া পরা খালি পায়ের লোক, সেই চাষীরাও হারিয়ে গেছে। ফুল প্যান্ট—হাওয়াই সার্ট পরা আধুনিক সাহেবদের ভিড় জমেছে গাড়িতে। সবাই দুর্গাপুরের যাত্রী। সেখানে কাজ কর্ম করে।

তবু কোথাও কোথাও ওই শালবনসীমা টিকে আছে। সেখানে সকালের মিষ্টি রোদ জাগে, ধান ক্ষেতের মুক্ত বিস্তারে এখনও ফিঙে চড়াই টুনটুনি পাখীগুলো দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। শাল গাছে এসেছে ফুলের মঞ্জরী।

বাসটা চড়াই ঠেলে বনভূমির বুক চিরে চলেছে। এরপর আসবে তাদের বাস ষ্টপেজ। হঠাৎ কানে আসে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ।

সারা বন জঙ্গল—ওই পাথুরে টিলাগুলো কেঁপে ওঠে। ধুলোর স্তূপ ওঠে।...আবার শোনা যায় বিস্ফোরণের শব্দ।

...ভীত বিস্মিত চাহনি মেলে চাইল প্রাণগোপাল বাইরের দিকে, কে বলে।

—পাথর তুলছে ;

দু চারটে ট্রাকও ওই বনের ভেতর থেকে পাথর তুলে আনছে, বড় রাস্তায় এসে ওঠে তারা কালো কালো পাথরের চাঁই নিয়ে।

—বিনয়বাবু তো লাল হয়ে গেল মশাই এই পাথর তুলে!

বাসে আলোচনা চলে, নানান আলোচনা। আজ দীর্ঘ এত বৎসর পর সে এখানের মানুষের মুখে নতুন বিচিত্র কথা শুনছে। আগেকার সেই ধানের দর—খরা—অজন্মা—আকাল—গ্রাম্য দলাদলি—মামলার কথা নয়, এ কোন বৃহত্তর জগতের কথা। দুর্গাপুরের নতুন জীবনের প্রচণ্ড আলোড়ন এদের জীবন যাত্রা—চিন্তাধারাকে আমূল বদলে দিয়েছে।

প্রাণগোপাল এই মানুষগুলোকে চেনে না, তারাও চেনে না তাকে।

বিচিত্র এই চলমান জীবনের ভিড়ে—আমূল পরিবর্তনের দিনে ওরা ভুলে গেছে আগেকার সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের কথ। সেদিনকার নিগৃহীত সেই মানুষের কথা।

যদুগোঁসাই আজ এখানের একটি বিস্মৃত যুগ—একালের মানুষ তাদের কথা মনে রাখেনি। প্রাণগোপালকেও এরা চেনে না।

হাসি আসে প্রাণগোপালের, দেশের স্বাধীনতা আনার জন্যই কত লাখ লাখ তরুণ—কত মানুষ সেদিন বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিল, সবকিছু ত্যাগ করেছিল।

অসীম মাষ্টারই বা কোথায় আজ হারিয়ে গেছে। ভুল! সবাই কি তাহলে ভুল করেছিল? না নিজের খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্যই বোকার মত এই সব মহান্ তত্ত্বে বিশ্বাস করেছিল—কে জানে!

—বাবু!

কনডাকটারের ডাকে মুখ তুলে চাইল প্রাণগোপাল। তার ষ্টপেজ এসে গেছে।

নামল। সেই আম গাছগুলো আজ অনেক বড় হয়ে উঠেছে। বনগড়ানি খাদের ওপাশে গড়ে উঠেছে শাল গাছের নীচে দু একটা চালাঘর, বেঞ্চ—বাঁশের মাচাও আছে। চায়ের দোকান।

—এলেন গো বাবু!

তাদেরই গ্রামের পঞ্চু এখানে দোকান দিয়েছে। আশ-পাশের চালায় অনেকগুলো সাইকেল রাখা। বাবুরা ওসব রেখে দুর্গাপুর গেছেন, আবার নেমে বাড়ি ফিরবেন।

—চা আর গরম চপ দোব গিরিবাবু?...

বলহরি সামন্তের ছেলে গিরিজা এখন প্যাণ্ট সার্ট পরে চাকরী করতে চলেছে। প্রাণগোপালকে যেন চেনে না এমনিই ভাবখানা, ওই গিরিজার বাবা একদিন তাদের গোমস্তা ছিল। দুবেলা মাথা নোয়াতো কাছারিতে এসে। গিরিজা তার সামনেই প্যাণ্টের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে—সিগ্রেট ধরিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বলে।

—তাই দে পঞ্চু! একটু কড়াকরে চা দিবি। বুঝলি চা বানায় দুর্গাপুরের 'সুইট্ গ্রিল', ফাইন চা—গুড ফ্লেভার, নাইস টেষ্ট।

গিরিজাও আজ ইংরেজী বলছে।

প্রাণগোপাল দাঁড়াল না, লাল কাঁকুরে পথ দিয়ে হাঁটতে থাকে গ্রামের দিকে। মহুয়া বন এখনও আছে—বোধহয় চৈত্র মাস। পলাশ গাছগুলোয় লাল ফুলের আস্তরণ এসেছে।

এ পথে সে বহুবার গেছে। শৈশব—যৌবনের কত পদ-চিহ্ন আঁকা এই পথ। মনের হারানো সুর মিশিয়ে আছে এই পথ রেখায়, এর আকাশে বাতাসে। দু একটা চিল উড়ছে নীল আকাশে।

ডাঙ্গাটা এখানে টিলার মত উঠে গেছে। তারই শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে দেখছে প্রাণগোপাল ওই বিশাল উপত্যকাকে। শস্যরিক্ত ক্ষেতের পারে হলুদ শালবন রেখা উঠে গেছে নদী পার হয়ে দূর দিগন্তের দিকে। নীল আকাশের কোলে উঠছে দু একটা কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। ওই নীলিমাকে যেন কি কালো আখরের কালিমায় ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছে।

ডাঙ্গার নীচেই তাদের গ্রাম সীমা।

লাল শূন্য ডাঙ্গাটার ধারে গড়ে উঠেছে নতুন কতকগুলো বাড়ি। কি সব সরকারি অফিস হবে, বোধহয় ইস্কুলও হতে পারে ওসব ছিল না।

নতুন হয়েছে।

তারও ওদিকে দেখা যায় তাদের সেই বাড়িগুলো, ওই ঝকঝকে বাড়িগুলোর কাছে ওরা যেন মৃত—ধ্বংস স্তূপের মত দাঁড়িয়ে আছে।

গ্রামের মধ্যে ঢুকে ওই শিবথানের কলরব শুনে কি কৌতুহল-বশেই এগিয়ে গিয়েছিল। তার কাছে আজ সব ফাঁক আর ফাঁকিই ধরা পড়ে গেছে। বেশ বুঝেছে সে, ঠকে গেছে কোথায় নিদারুণভাবে।

নিজের উপরই হাসি আসে। এত বোকা সে! নেহাৎ বোকা। রাগ হয় না তার—জ্বালাও ধরে না তার মনে। সব কিছুর প্রতি তাই যেন ওর একটা বিতৃষ্ণা আর পরিহাসই পঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে সারা মনে।

থমকে দাঁড়াল সে।

হাজারো মানুষের ভিড় জমেছে শিবতলায়। তেরঙ্গা পতাকা উড়ছে হাওয়ায় পত্ পত্ করে। ওই পতাকা নিয়ে একদিন তারা গোপনে শোভাযাত্রা করেছে, কত রাতের

অন্ধকারে কত বিপদ বরণ করে বয়ে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে এসেছে মারণাস্ত্র। ইস্তাহার বিলি করেছে।

সেই সর্বত্যাগী ছায়ামূর্তিগুলোর কথা মনে পড়ে! তাদের দু একজন ফাঁসি কাঠে ঝুলেছে।...রক্ত দিয়েছে ওই পতাকার জন্য কত তরুণ।

আজ সেই পতাকা উড়ছে।

নীচে বসে আছেন বিনয়বাবু। গলায় ফুলের মালা। সেই পুলিশের বাহন গঙ্গাধর খদ্দর পরে তেজস্বী ভাষায় শপথ নিয়ে চলেছে এই গুরু দায়িত্ব তারা বহন করবে।

বিনয়বাবুর মত সর্বত্যাগী দেশপ্রেমিক আজ এগিয়ে এসেছেন সেই মহান্ শপথ নিতে। জয়গতিবাবুও রয়েছেন পাশে।

সব কথাগুলো ওই আন্তরিকতাময় শপথ বাণী ওদের কাছে অর্থহীন। হাসি আসে প্রাণগোপালের।

হাসছে সে, মনে হয় এসব নিছক একটা অভিনয়ই, হাসির নাটকের অভিনয়

হাসছে প্রাণগোপাল দরাজ প্রাণখোলা হাসি।

সকলেই সচকিত হয়ে ওঠে। জয়গতিবাবু গর্জন করেন।

—কে! এ্যাই কে হাসছে এখানে? এই পবিত্র পরিবেশে?

গঙ্গাধর গর্জন করে ওঠে।

—সাইলেন্স!

হাসছে প্রাণগোপাল। ওদের এইসব কথায় তার হাসির মাত্রা আরও বেড়ে যায়। সব মানুষগুলোকেও চেনে। জানে তাদের মনের অন্তরের পরিচয়।

ওরা ভদ্র ইতর আরও অনেককিছু।

বলহরি সামন্ত হঠাৎ যেন সামনে সাপ দেখার মত চমকে উঠে বলে,

—পানু বড়বাবু! গৌসাই বাড়ির প্রাণগোপাল-! ছাড়া পেয়ে ফিরে এসেছে জেল থেকে।

চমকে ওঠেন বিনয়বাবু! তবু তার মুখে সেই বিস্ময় আর দুশ্চিন্তার রেখাটা প্রকাশ পায় না। মনের সব ভাবই তিনি চেপে থাকতে পারেন।

পারেনি বলহরি।

এত পয়সা করেছে তবু মনের দিক থেকে তার কোন জোর নেই। তার মনের অতলে শুধু পাপ আর নীচতা। তাই বলহরি সেদিনের থেকেও দুর্বল আর বিপন্ন বোধ করে নিজেকে।

দীর্ঘ চৌদ্দ বছর আগেকার সেই বিকালের ঘটনাটি আজও ভোলেনি সে। বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে একটি তরুণ। কঠিন কণ্ঠে বলেছিল - আর একটা বুলেট তোলা রইল তোমার জন্য।

সেই খুনে দুধে ছেলেটা আজ ফিরে এসেছে।

বলহরিও গর্জাতে গিয়ে চুপ করে যায়। ওদের মনে হয় এই সব ভণ্ডামি ওর কাছে ধরা পড়ে গেছে। জয়গতিবাবুও চুপ করে গেছেন।

এগিয়ে যায় অনাদি কামার।

—পানুদা! ফিরে এসেছো তুমি?

প্রাণগোপালের চোখে মুখে বিজাতীয় হাসি। এ যেন নতুন এক জগৎ গড়ে তুলেছে তারা। এখানে প্রাণগোপালের কোন ঠাঁই নেই।

···অনাদির দিকে চেয়ে থাকে পানু।

শীর্ণ হয়ে গেছে সেই তেজী ছেলেটা, মুখেচোখে দুঃখের ছাপ। ওর হাসি থেমে গেছে। পানুর মনে হয় সবই হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে তার ঠাঁই। এই শত শত মানুষও তাকে ভুলে গেছে। শুকনো গলায় বলে,

—হ্যাঁরে এলাম।

ললিতা দূরে ও পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। ভিড় ঠেলে সেও এগিয়ে আসে। এখানকার ওদের মুখে চোখে কাঠিন্য সে দেখেছে। প্রাণগোপালকে ওরা সহ্য করতে পারেনি আজও।

ললিতা এগিয়ে আসে,

—বাড়ি চলো পান্নু!

প্রাণগোপাল ওকে দেখছে। সেই রূপময়ী সুন্দরী মেয়েটার দেহে মনে কি নিরাভরণ করুণ নিঃস্বতা নেমেছে। এই উৎসব আর প্রাচুর্যের আড়ালের সেই করুণ বেদনাটা তার নজর এড়ায় না। পান্নু চুপ করে বাড়ির দিকে ফিরল।

ওরা এতক্ষণ দমে ছিল। আবার গঙ্গাধর গলা তুলে চীৎকার করে। স্বাধীনতার ইতিহাস নিয়ে প্রামাণ্য বক্তৃতা দিতে থাকে।

তবু সেই সমাবেশ কেমন জমে না—ফেঁসে যায়।

বিনয়বাবু উঠে গেছেন। গঙ্গাধর চুপসে গেছে একটু। জয়গতি-বাবু বক্তৃতা শেষ করে বিনয়বাবুর সঙ্গে একটু আলোচনা করবেন, তার ছেলের একটা কাজকর্মের জন্য। তাই বিনয়বাবুকে এত বড় করে বক্তৃতায় ঘোষণা করেছিল। কিন্তু সেই মৌকাটাও হাতছাড়া হয়ে গেল।

ওই প্রাণগোপাল এতদিন এগ্রামের জীবন থেকে অনুপস্থিত ছিল। তার কথাও ভুলে গিয়েছিল সবাই। এই ভাঙ্গাগড়ার অবকাশে ওরা বিনা বাধায় যে যার কাজ গুছিয়েছে।

নিজেদের ভাগে সবই লুটে পুটে নিয়েছে, বলবার কেউ ছিল না। নতুন করে এ অঞ্চলের কিছু লোক নিজেদের সাম্রাজ্য গড়েছিল।

হঠাৎ আজ ওর এই নাটকীয় আবির্ভাব কেমন সব গোলমাল করে দিল। ওর ওই হাসিটার কথা ভোলেনি জয়গতিবাবু। কেমন অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণ সেই হাসি এদের সব ভণ্ডামির মুখোসটাকে ফালা ফালা করে ছিঁড়ে দিয়েছে। জয়গতিবাবু ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলেন আজ।

গঙ্গাধর তখন ভাঙ্গা হাটে লোকজন দিয়ে সতরঞ্চি সামিয়ানা তোলাচ্ছে। তদারক করছে বলহরি সামন্ত।

রমার বুড়িমাও এসেছিল, ছেলে ফেরার হয়ে যাবার পর থেকেই বুড়িরও মাথা কেমন খারাপ হয়ে গেছে যখন তখন বকে। বুড়ি জগময়ীর খ্যান্‌খ্যানে গলার শব্দে চাইল গঙ্গাধর।

বুড়ি শুধোয়,

—কি গো কেত্তন শেষ হয়ে গেল, তা কুঞ্জভঙ্গ হল না—ধুলোট হল না, ইকি হরিসভা গো?

জগময়ী ওদের চেনে। বিষ্টুপদও নাকি বলতো দেশ স্বাধীন হবে। আজ সব হয়েছে, বিষ্টুই নেই। বুড়ির মন কেমন করে। মুখে পড়েছে বয়সের কুঞ্চন রেখা। চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গেছে। কোমরটা নুইয়ে পড়েছে দাঁতপড়া লাল মাড়ি বের করে হাসছে;

গঙ্গাধর ফোঁস করে ওঠে,

—থামো দিকি। যাও এখান থেকে খুড়ি।

হাসছে বুড়ি - তা কেষ্টঠাকুরটি কোথায় গো, সবতো আখাল বালক রয়েছো।

প্রাণগোপাল এক নজরেই বুঝেছে আজকের স্বাধীনতার এই উৎসবের অর্থ কি। যারা এই স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছিল, তাদেরই অনেকে রাতারাতি ভোলবদলে দেশভক্ত জনসেবক হয়ে উঠেছে। তারাই এগিয়ে এসেছে এবার। লোভের এই স্রোতকে বাধা দিতে তারা পারবে না। হেরে গেছে—নিদারুণ ভাবে ঠকে গেছে তারা।

—কে?

রমার মা এগিয়ে আসে। বুড়ি দেখছে প্রাণগোপালকে। জীর্ণ কোটরাগত দুচোখের চাহনিতে কি বেদনা আর ব্যাকুলতা।

—এসেছিস পানু। হ্যারে বিষ্টু, আমার বিষ্টু এলো না? বিষ্টুরে—

বুড়ির জীর্ণ কণ্ঠস্বর কেঁপে ওঠে। অসহায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সে হারানো ছেলের বেদনায়।

—সবই হোল পানু, বিষ্টু ফিরলো না কেন?

পানু কি সান্ত্বনা দেবে জানে না। বুড়িকে তবু থামাবার চেষ্টা করে,

—ফিরবে কাকীমা। ফিরবে বিষ্টুদা।

—মিছে কথা! সে নেই—ওরা গুলি করে মেরে ফেলেছে আমার বিষ্টুকে।

—না—না!

বুড়ি ওর দিকে চাইল—সত্যি!

হারানো বিষ্টুদাকে মনে পড়ে প্রাণগোপালের। আজকের এই উৎসবের দিনে তাদের ওরা স্মরণ করে না। ··বিনয়বাবু, জয়গতি-বাবু—গঙ্গাধর—বলহরি সামন্ত ওদের চেনে না আজ।

প্রাণগোপাল এগিয়ে চলে।

রমার বিয়ে হয়ে গেছে। সেও নেই এখানে! এ গ্রামের সব সবুজ যেন হারিয়ে গেছে—একা সে।

বাঁশ বনে হাওয়া কাঁপছে। একটা গানের সুর ওঠে। পরিচিত কণ্ঠস্বর,

কারার ওই লৌহ কপাট,
ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট!
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ—

পরিচিত গান, সেই বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে আজ জীর্ণতার আভাস। সেই উচ্চগ্রামে গলা আর ওঠে না। তবু সুরটা শুনে এগিয়ে যায় প্রাণগোপাল। হারানো সেই দিনগুলোর ছবি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বিষ্টুদা, অসীমবাবুর কথা মনে পড়ে। আইন অমান্য আন্দোলনে ওই মন্নু ঘোষই এই গান গাইতো।

—মনুদা !

—কে ! প্রাণগোপাল—পানু ।

প্রাণগোপাল চমকে ওঠে ওই তেজী মানুষটার আজকের অবস্থা দেখে। ও অন্ধ হয়ে গেছে। মাথার চুলগুলো সব সাদা, জীর্ণ ছুটো হাত বাড়িয়ে কি হাতড়াচ্ছে।

—মনুদা ! একি হয়েছে তোমার মনুদা ?

ও ছিল স্বদেশী যাত্রার দলের গাইয়ে, মুকুন্দদাসের গান নজরুলের গান গাইতো তখন। রক্তে মাতন আসতো। আজ ও যেন একটা বাজপড়া তালগাছ। হাসে মনু।

—ও কিছু নয় ভাই। ওরা ডাকতে এসেছিল শিবথানে গান গাইবার জন্য। তা যাইনি ভাই—যেতে পারিনি। বিষ্টু নাই, অসীমবাবু নাই, তুমি নাই ; বিনয়বাবু গঙ্গাধরের ওই মচ্ছবে যাইনি ভাই, এই খানেই বসেছিলাম। গাইছিলাম আপন মনে।

বুকটা ভরে ওঠে আনন্দে ! তাহলে এলে ভাই ! বিষ্টু ! বিষ্টু আসেনি ?···

চুপ করে থাকে প্রাণগোপাল।···মনু বুঝেছে ব্যাপারটা। তাই বলে,

—সব কেমন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল আজকের দিনে। তাই ভাঙ্গা হাটে আর গাইতে যাই নি।

ওরা কি বুঝবে এর মম্মো ?

দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার,
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁসিয়ার।

অন্ধ মনুর চোখের সামনে সেই আগেকার যৌবনের অগ্নিরূপ ফুটে উঠেছে। ওর অতল অন্ধকারময় দৃষ্টির সামনে সেই ছবিগুলো প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

প্রাণগোপালের দুচোখে জল আসে।

তাদের দিন ফুরিয়ে গেছে, সব হারিয়ে গেছে।

অনাদির ডাকে হুঁস ফেরে।

—বাড়ি যাবে না? চলো!

—যাই! বাড়ি যাচ্ছি মনুদা। পরে দেখা করবো।

—এসো ভাই!

অন্ধ মনু ওর গায়ে মাথায় হাত বোলায়। পরম তৃপ্তি আনা কি হু হু বেদনাআনা সেই স্পর্শ।

বাঁশবনে কোথায় পাখী ডাকছে, একক একটা পাখীর সুর ওঠে। ও যেন অন্ধ মনুর মতই নিঃস্ব - একক একটি প্রাণী।

প্রাণগোপাল ওই ধ্বংসপুরীতে ফিরেছে।

বৈকাল পার হয়ে সন্ধ্যা নামছে। আজ সে দেহমনে ক্লান্ত। তার সামনে কোন পথ নেই। সব কেমন শূন্য হয়ে গেছে।

রমার কথা মনে পড়ে। আজ পথের ধারে নীলাকে দেখেছিল এক নজর। অনেক বড় হয়ে গেছে। কোথায় যাচ্ছিল সে। প্রণাম করলো ওকে।

রমা গ্রামে নেই। বিয়ে হয়ে নিজের সংসারে চলে গেছে আসানসোলের ওদিকে কোথায়।

আর একজনের কথা মনে পড়ে। বিশাখাকে আজও ভোলেনি সে।

প্রাণগোপাল ভেবেছিল, বিশাখা আসবে তার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু আসেনি বোধ হয় লজ্জায়।

ভাঙ্গা বাড়িগুলোয় থমথমে আঁধার নামছে। চুণকাম খসে গেছে। নাটমন্দিরের খানিকটা ধ্বসে পড়েছে। সবই ছত্রাকার হয়ে পড়ে যাবে।

এই ধ্বংসপুরীতে এসে প্রাণগোপাল সেই নিঃস্বতার বেদনাটাকেই বড় করে দেখেছে। তার চারিদিকে নেমেছে অন্ধকার। দু একটা তারা জ্বলছে। বিশাখার কথা মনে পড়ে।

মনে হয় অন্ধকারের বুকে ও যেন এমনি একটা তারা।

পুঞ্জ পুঞ্জ আঁধার জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জোনাকিগুলো ওর সর্বাঙ্গে জ্বলছে আর নিভছে।

থমকে দাঁড়ালো প্রাণগোপাল। আজ তাদের পাড়া নীরব নিস্তব্ধ। কোনো প্রাণের সাড়া নেই কোথাও। সব নীরব স্তব্ধ।

আগে এখানে উঠতো নাম কীর্তনের সুর। খোলের শব্দ। লোকজনের আনাগোনার বিরাম ছিল না। রাত অবধি মন্দিরে আলো জ্বলতো। দূর দূরান্তর থেকে বৈষ্ণব সজ্জন আসত আশ্রয় পেতো তারা এখানের অতিথি শালায়।

আজ সব স্তব্ধ।

ওই অন্তহীন স্তব্ধতা যেন ব্যঙ্গ করছে এই গোঁসাই পাড়ার ভাগ্যকে আর ভাগ্যাহত কতকগুলো মানুষকে।

সব হারিয়ে গেছে তাদের।...সেই সব হারাবার বেদনাকে ভোলবার জন্যই যেন প্রাণগোপাল আরও কিছু পেতে চায়। সেই পাওয়ার তাগিদ তার সারা মনে, সব চিন্তাকে পর্যন্ত বিপর্যস্ত করেছে।

তাই বিশাখার সন্ধানে বের হয়েছে সে।

জীবনে অনেক কিছু পাবার স্বপ্ন ছিল তার। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মবলি দিতে চেয়েছিল।

কথাগুলো ভাবলেও হাসি আসে তার। আজ মনে হয় ওসব বাজে ভাবনায় জীবনের বহু মূল্যবান অনেকদিন গুলো মুঠো মুঠো করে অপচয় করেছে সে।

নিছক বোকামির কাজই করেছে।

জীবনে এর কি দাম! কাণাকড়ি মাত্র নয়। তাই হেরে গেছে সে।

বাতাসে জেগে আছে বকুল ফুলের মিষ্টি সুবাস। গাছটা

আজও টিকে আছে, কয়েকটা ডাল ভেঙ্গে গেছে—তবু বাকী কটা ডালে এখনও সবুজ হলুদ ফুলগুলো ফোটে, গন্ধ বিলায়।

জীবনের এইটুকুই মাধুর্য। শত বাধা বিপদ পরাজয় আছে, তবু এরই মাঝে আছে কোথায় আশ্বাস আর সান্ত্বনা।

ছোট বাড়িখানার সামনে এসে দাঁড়াল।

কড়া নাড়ছে সে। মনে হয় এখুনিই বের হয়ে আসবে বিশাখা। অভিমান ভরে চেয়ে থাকবে তার দিকে। হয়তো কথাই বলবে না। দু দিন হ'ল ফিরে এসেছে সে, তবু বিশাখার সঙ্গে দেখা করেনি।

প্রাণগোপালও অবাক হয়েছে। বিশাখাও আসেনি তার সঙ্গে দেখা করতে।

কে এগিয়ে আসছে।

প্রাণগোপাল এতদিন নিজেকে চেনেনি। আজ মনে হয় অনেক কিছু চেনাকেই এড়িয়ে ছিল সে। তার চাওয়ার মাঝেও ছিল শুধু বেহিসেবি ভুল।

—বিশাখা!

তারার আলোয় কাকে সামনে দেখে থমকে দাঁড়াল। চমকে ওঠে প্রাণগোপাল। বিশাখা এ নয়।

তার চলার ছন্দ সে জানে। ওর যৌবন মদির দেহের উত্তাপ তার মনকে অজানতেই স্পর্শ করে। ও তার খুব চেনা। এ বিশাখা নয়।

—তুমি!

ললিতা ওর ডাকে দরজা খুলে দিয়ে থমকে দাঁড়ালো।

জানতো একদিন তাকে একথা জানাতেই হবে। কিন্তু এভাবে প্রাণগোপাল নিজে আসবে তা ভাবেনি।

—বিশাখা নেই?

—এসো!

ললিতা তাকে ভেতরে নিয়ে গেল। অনেক বছর পর এখানে এসেছে প্রাণগোপাল। ঘরের সেই শ্রী আর নেই। কেমন ছন্নছাড়া ভাব। চালের খড় নেই। ছাউনিও জীর্ণ। ওপাশে মরা মাধবীলতা গাছটা বিবর্ণ হয়ে ঝুলছে।

একদিন ওতে ফুল ফুটেছিল, আজ সেই ফুলদল ঝরে গেছে। ওটা বিশুষ্ক বিবর্ণ।

কথাটা জানায় ললিতা—বিশাখা নেই এখানে। অনেক দিন হল সহরে না অন্য কোথাও চলে গেছে।

—নেই! প্রাণগোপাল চমকে ওঠে ওর কথা শুনে। উঠে দাঁড়াল সে। এ পাড়ার অনেককেই দেখেনি ফিরে এসে। কোথায় তারা চলে গেছে। সহরে দেখেছে সেই শ্রেণীর অনেককে। রাতের অন্ধকারে তারা জীবিকার সন্ধানে পথের ধারে দাঁড়ায়। তাদের মুখে ফুটে উঠেছে কি বীভৎসতার ছায়া।

বিশাখা যে এমনি করে হারিয়ে যাবে তা ভাবেনি প্রাণগোপাল।

ললিতা বলে,

—বলহরি সামন্ত আর ওই বিনয়বাবুদের জ্বালাতেই সে এখানে টিকতে পারেনি। লোভ কতদিন সামলাতে পারে বলো, তার দোষ কি?

প্রাণগোপাল জবাব দিল না। বলহরি সামন্ত আর বিনয়বাবুর দলই তাদের সব কিছু কেড়ে নিয়েছে, বিষয় আশয় প্রতিষ্ঠা। মায় অন্তরের সেই সবুজ শ্যামল ঠাঁইটুকুকেও তারা বিশুষ্ক করে দিয়েছে।

অন্ধকারে বের হয়ে এল প্রাণগোপাল।

মৃত স্তব্ধ এই রাজ্য। দিঘীর ওপারে বিনয়বাবুর বৈঠকখানায় তখনও আলো জ্বলছে। দু একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

বিনয়বাবুই তার সব কেড়ে নিয়েছে।

বিশাখার মত মেয়েকেও তারা নিষ্কৃতি দেয় নি। বোধহয় কি দুরন্ত জ্বালা আর অপমানে সে পালিয়ে গেছে এখান থেকে।

প্রাণগোপালের সামনে সব এমনি অতল অন্ধকারে ঢাকা বলেই মনে হয়। রাতের ঠাণ্ডা বাতাস দিঘীর জলে শিহর তোলে। ওই আলোজ্বলা বাড়িগুলোর সামনে এসে পড়েছে প্রাণগোপাল।

হঠাৎ অন্ধকারে কাকে দেখে দাঁড়াল। হাসির শব্দ ওঠে। ওই মনুর ভাইঝি নিশিরই এ হাসি। নিশির ডাকের মতই শোনায় ওই হাসিটা।

প্রাণগোপাল চমকে ওঠে, মনুর ভাইঝি এই পথ নিতে বাধ্য হয়েছে।

—ছোটবাবু!

দাঁড়াল প্রাণগোপাল। নিশির দিকে চেয়ে থাকে।

মেয়েটা আজও রয়ে গেছে এই গ্রামেই। শাল গাছের মত সতেজ চেহারা। সারা দেহে নিটোল পূর্ণতা। দু চোখে বিশ্রী হাসি।

কোথায় একটা শিয়াল ডাকছে বনের দিকে। নিশি প্রাণগোপালকে দেখছে, ওকে যেন দুচোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছে।

নিশি আজকে এই ভোগবিলাসের জীবনে অভ্যস্ত। তার স্বামী অনেক আগেই মরে গেছে। ওই বলহরির চালানের সঙ্গে মিশে হেথা সেথা যাতায়াত করে; মেয়েটা বুকভরা লালসা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়

নিশি দেখছে প্রাণগোপালের দুচোখে সেই চিরন্তন বুভুক্ষা আর তৃষ্ণা। বলে ওঠে নিশি,

—বিশাখা নাই বা রইল গো, আমরা তো আছি। তা আমাদিকে নজরে ধরে না বুঝি?

প্রাণগোপালের সারা মনে একটা ঠেলে ওঠা দুর্বার তৃষ্ণাই জেগেছিল। কিন্তু বিশাখা চলে গেছে শুনে সেটা পরিণত হয়েছে ব্যর্থ জ্বালায়।

নীরব আক্রোশে সে ফুলছে। তার সেই কামনা আজ কি তীব্র গরল জ্বালায় তার সারা মনকে বিষিয়ে তুলেছে।

—ওই বাবুদের ওখানে গিইছিলি ?

নিশি পেট আঁচল থেকে একটা মদের বোতল টেনে বের করে দেখায়।

এরই জন্যে। বলহরির মাল বুঝলে একেবার বাজে। খাঁটি জিনিস খায় ওরা, তাই পেসাদ নিয়ে এলাম। টুকচেন খাবা ?

চলো কেন্নে—

মনু বোধহয় জানেনা নিশির এই সব ব্যাপার।

প্রাণগোপাল ওর দিকে চাইল না। ওরা সবাই বিষিয়ে গেছে। এ গ্রামের অন্তরে কোথায় পচন ধরেছে। ওদের মনে ঢুকিয়েছে লোভ লালসা আর পাপের নেশা ওই বিনয়বাবু আর বলহরি সামন্তের দল।

প্রাণগোপাল দিঘীর পাড় ধরে এগিয়ে গেল, নিশির ডাকে ফিরেও চাইল না।

হাসছে নিশি। নিশাগ্রস্ত মেয়েটার হাসি ওর অক্ষমতাকেই যেন ব্যঙ্গ করছে। পরিহাস করছে নিদারুণভাবে তার সমস্ত অক্ষমতাকেই।

একঝলক আলো জ্বেলে একটা গাড়ী বের হয়ে গেল। বিনয়বাবু ফিরে গেলেন তার নতুন ব্যবসার জায়গায়। অন্ধকারে কোথায় বন পাহাড় কাঁপিয়ে ব্লাষ্টিং এর শব্দ ওঠে। এ মাটির অতলে ওরা দুরন্ত বিস্ফোরণ এনেছে। পাথর তুলছে সেই গভীর থেকে।

রাতের অন্ধকারে সব স্তব্ধতাকে ওরা ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। প্রাণগোপাল আজ নীরব দর্শকের মত সেই সব দেখছে। তার যেন করার কিছুই নেই।

বাড়ির কাছে কাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রাণগোপাল এগিয়ে যায়। ধ্বসে পড়েছে বড় বড় বাড়িগুলো। কাছারি বাড়ির দেউড়ির খিলান আধখানা ভেঙ্গে পড়েছে, বাকিটা বিপজ্জনক

ভাবে ঝুলছে। ওপাশে বাত রাখার কয়েকটা থাম দাঁড়িয়ে আছে। আগে ওগুলোতে কেরোসিন তেলের কুপি জ্বলতো, এখন শুধু কালো অন্ধকারে ওরা নীরব প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে।

—দাদা!

অন্ধকারে ঠিক ঠাওর করতে পারে না প্রাণগোপাল। এগিয়ে আসে অনাদি। এককালে সে ছিল বিশ্বস্ত অনুচর। দুজনের মনের মিলও ছিল খুব।

প্রাণগোপাল অনাদির ডাকে মুখ তুলে চাইল।

অনাদি বলে,

—তোমার কাছেই এসেছিলাম দাদা। এ সবতো আর সহ্য করা যায় না। ওরা কি ভেবেছে? বলবার কইবার কেউ নাই নাকি?

প্রাণগোপালের মনের সেই জ্বালাটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তবু মনে হয় আজ সে অসহায়, একটা প্রচণ্ড আঘাত তার মনের সব তেজ আর কর্মক্ষমতাকে নিঃশেষ করে দিয়েছে।

অনাদি বলে,

—বাতাসে গন্ধ পাচ্ছো না? মদের গন্ধ! একেবারে ভাটিখানা বসিয়েছে বলহরি সামন্ত সারা গাঁয়ে। মাতাল করে তুলেছে গাঁয়ের লোককে। ঘরে ঘরে চোর ডাকাত আর মেয়েরা—

অনাদি সেই কথাটা জানাতে গিয়ে বোধ হয় পারলো না। থেমে গেল।

প্রাণগোপাল কি করতে পারে এর জন্য জানে না। সেও দেখেছে ওদের এই কাজের নমুনা। বিশাখা হারিয়ে গেছে। নিশি কামারকে প্রথম দেখছিল শান্ত একটি মেয়ে। সেই মেয়েটাকেও ওরা রক্তপাগল বাঘিনীতে পরিণত করেছে।

প্রাণগোপাল বলে,

—একা তুই কি করবি অনাদি? ওদের বাধা দিতে পারবি?

অনাদিও পান্নুর কথায় চুপ করে যায়। সে পারেনি এতদিন কিছু করতে। বলে,

—তবু তুমি এসেছো, যদি শক্ত হয়ে দাঁড়াও অনেকেই তোমাকে সমর্থন করবে, আমি তো আছিই।

হাসে প্রাণগোপাল।

—পড়ে থাকবো তুই আর আমি। আর কেউ আসবে না।

বাতাসে উঠেছে বিশ্রী একটা গন্ধ। এই শান্ত সবুজ ফুল গন্ধময় বাতাসে মিশিয়ে আছে বলহরি সামন্তদের সেই মদগন্ধ। প্রলুব্ধ করে তুলেছে তারা।

ওই মদির সুবাসে এখানের মানুষগুলোকে তারা বদলে দিয়েছে। পরিণত করেছে মেরুদণ্ডহীন একটি মানুষ নামক পশুর শ্রেণীতে।

ওরা দুটি অসহায় মানুষ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তারানাথ তর্কতীর্থ বেদান্তবাগীশও কথাটা ভেবেছেন। এককালে তিনি ছিলেন এই অঞ্চলের মধ্যে অন্যতম পণ্ডিত ব্যক্তি। শীর্ণ পাকানো চেহারা; কপালে রক্ত চন্দনের ছাপ—শিখায় জবাফুল বাঁধা। দুটো চোখের দৃষ্টিতে কি প্রদীপ্ত তেজ ফুটে উঠতো।

উত্তরীয়ের ফাঁক থেকে সাদা উপবীত উঁকি দেয়।...বলিষ্ঠ খনখনে কণ্ঠে হাসতেন তারানাথ। যদু গোঁসাইকে স্নেহ করতেন। যেতেনও ওদের ওখানে।

—তোমাদের বাঁশী আর আমাদের অসি হে, দুই আলাদা মত। তবে শেষে গিয়ে এক জায়গাতেই মিশেছে।

প্রাণগোপালকে ভালবাসতেন তারানাথ। ওই একটি মাত্র লোক যার কাছে প্রাণগোপাল তার কাজের নীরব সমর্থন পেয়েছিল। তারানাথ ব্রাহ্মণ ছাড়া যজমান করতেন না, তাও তাঁর যজমানি ছিল অত্যন্ত সীমিত।

কাজোরার বাবুদের বাড়ীতে—দুর্গাপুরের চাটুয্যেদের বাড়ীতে—রাণীগঞ্জের ওদিকে দু একটি জমিদার পরিবারের কুল পুরোহিত ছিলেন তিনি, কাজ নিয়ে বাইরে বাইরে থাকতেন। গ্রামে সামান্য জমিজমা যা ছিল তা ভাগচাষীরা দেখাশোনা করতো। একমাত্র বিধবা মেয়েকে বাড়িতে রেখেছিলেন, তার একটি মাত্র কন্যা সন্তান।

তারানাথের সংসারও ছোট। মেয়ে আর ওই একমাত্র নাতনী নীলা। সেও তখন ছোট্ট।

…তারানাথ গ্রামের সীমা ছাড়িয়ে আসানসোল—রাণীগঞ্জ—দুর্গাপুর অঞ্চলেই যাতায়াত করতেন। দুর্গাপুরের জমিদার চাটুয্যেরা ওঁকে ওদের এলাকাতেই জমি দিয়ে বসতবাড়ি তৈরী করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তারানাথ সে দান গ্রহণ করেন নি।

—বেশ আছি গ্রামে। সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে এসে লাভ কি বাবা?

সেদিন ছিল প্রাচুর্যের দিন। অভাব এত ছিল না। জটিলতা ছিল না জীবনে। যজমান বাড়ি থেকে ক্রিয়া কর্ম করে যা পেতেন তাতে সংসার চলে গিয়েও উদ্বৃত্ত থাকতো।

নীলাকে তাই পড়াতে চেয়েছিলেন তারানাথ। দিন বদলাচ্ছে, এদিনে ওই লেখাপড়া শেখার প্রয়োজন। নীলার মা বরং আপত্তি করেছিল।

—কি দরকার ওসবে বাবা? তার চেয়ে নীলাকে কোথাও দেখে শুনে বিয়ে থা দিয়ে দাও। পরের ঘরে পাঠাতেই হবে যখন, আগে থেকেই যাওয়া ভালো।

তারানাথের সংস্কার বিমুক্ত মন তাতে সায় দিতে পারেনি।

—না, না ও পড়ুক মা। এখন থেকে দূর করে কি হবে? ওই একটুকুই তো সম্বল।

নীলা তাই পড়তে পেয়েছিল। তারানাথ পড়িয়েছিলেন সংস্কৃত কাব্য ব্যাকরণ। মনের মত করে ওকে গড়ে তুলবেন তিনি।

হঠাৎ দিনগুলো কেমন বদলে গেল। তারানাথের সব হিসাব নিকাশও গোলমাল হয়ে গেল।

বিরাট একটা ঝড় এসে লেগেছে কোন শান্ত ছায়া ঘেরা রাজ্যে ---বনভূমিতে। প্রচণ্ড সেই ঝড়ের দাপটে কত বনস্পতি উপড়ে পড়ল, ছত্রাকার হয়ে গেল। ভেঙ্গে গেল প্রাসাদের ভিত্তি মূল।

স্বাধীনতা এলো,

বনেঢাকা দুর্গাপুর এই বিরাট পরিবর্তনের একটি প্রতীক।

একদিকে চলেছে সর্বনাশা ভাঙ্গনের পালা। স্বাধীনতা এলো; তার আগে এসে গেল মন্বঃন্তর। লাখো লাখো বুভুক্ষু মানুষ ব্যর্থ আর্তনাদ তুলে শেষ হয়ে গেল। দাঙ্গার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ তারপর ইতিহাসের পাতা ওলটালো, রচিত হল নতুন একটি অধ্যায়।

নতুন শ্রেণীও জন্ম নিল সেই সঙ্গে। বিনয়বাবু—বলহরি সামন্তের দল এতদিন পর ঠেলে উঠল উপরের তলায়। বড় বড় জমিদার গোষ্ঠীও ওদের সেই নব জাগরণের ভিড়ে তলিয়ে গেল।

দুশো বছর ধরে জমিদারী প্রথা শিকড় গেড়ে বসেছিল, সমাজের বুকে তার কুফল অবশ্য ছিল—সুফলও ফলেছিল তার সঙ্গে অনেক। সেই বনস্পতিদের তারা সমূলে উপড়ে ফেলল। এতদিন যারা মাথার উপর ছিল, রাতারাতি ফার্মান বলে তাদের সবকিছু নিঃশেষ হয়ে গেল।

কেউ কেউ এই ভিড়ে রং বদলে টিকে গেল, ছিল জমিদার হয়ে গেল ব্যবসাদার নাহয় ঠিকেদার। স্বভাব স্বরূপ সব বদলে গেল।

বনে ঢাকা দুর্গাপুরে দেখেছে তারানাথ সেই পরিবর্তন; তার ঢেউ তাদের গ্রাম পর্যন্ত এসে পৌচেছে। দামোদরের সেই

বালিয়াড়ি—বর্ষায় তার রুদ্রমূর্তি এতদিন একটা দুস্তর বাধা হয়েছিল। বাধাপ্রাচীর রচনা করেছিল এই দুই জগতের মধ্যে, আজ সেই বাধাপ্রাচীর দূর হয়ে গেছে। মুক্তবাধা সেই জলোচ্ছাস এই শান্তিময় গ্রাম সবুজ তার মানুষগুলোকেও বদলে দিয়েছে।

তারানাথের জীবনেও এর আলোড়ন বেশ খানিকটা লেগেছে। নীলা সেবার স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে। ওর মাও মারা গেল তিনদিনের জ্বরে।

তারানাথের মনে এই পরিবর্তনটা সাড়া জাগিয়েছে। বয়স হয়েছে—ওই জমিদারদের মধ্যে একটা মনুষত্ব হৃদয়ের স্পর্শ মানবিকতাবোধ সে দেখেছিল, দীর্ঘ দিনের পরিচয়ে হৃদয়ের যোগও গড়ে উঠেছিল।

কিন্তু তাদের সব হারাবার পর তারাও বদলে গেছে।

সমারোহে চাটুজ্যে বাবুরা পুজো করতেন, ক্রমাগত সেই সমারোহ ভক্তি কোন্‌দিকে চলে গেল। ছেলেরা কাজ কারবার করছে—রীতিনীতিও বদলে গেছে।

পুরোহিতকে তাই ভাবে তাদের বাড়ির ঝি চাকরের সামিল। প্রণাম! প্রণাম করতে তারা ভুলে গেছে। বলে,

—যতো সব চালকলা বাঁধা বামুন তাকে আবার প্রণাম করবে? সমাজের সব পর গাছা—প্যারাসাইট! আবর্জনাই বলা যেতে পারে। ওসব সিষ্টেম তুলে দিতে হবে।

কথাটা চণ্ডীমণ্ডপে বসেই শুনেছিল তারানাথ তর্কতীর্থ।

যেখানে কর্তারা বসে এককালে তার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, সেইখানেই এই সব কথা উঠবে এমন কল্পনাও করেনি তারানাথ। কথাটা বলেছিল ন'তরফের নতুন মালিক অনিরুদ্ধবাবু।

ইদানিং কারবার করেছেন তিনি। জমি বাগান যার বিশেষ দামই ছিলনা, সেই ব্রহ্মডাঙ্গার দাম বেড়েছে আগুনের মত। পাঁচ টাকা বিঘে দিলেও ওই বন ধারে কেউ জমি নিতো

না, তারই দাম আজ দু হাজার টাকা কাঠা। পয়সা ও তেমনি আসছে। কারখানা করেছেন তারা। গাড়ি ও কিনেছেন ; সন্ধ্যার অন্ধকারে তারানাথ দেখেছেন, ওদের ছেলেদের মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরে চীৎকার করতে—মাতলামি করতে।

বৃদ্ধ তারানাথ ওদের আজকের কথাটা শুনেছে। চমকে উঠেছে সে। এতদিনের রীতিনীতি প্রথা সব বদলে গেছে। ব্রাহ্মণ, কুল পৌরহিতের ! ওদের হিতচিন্তা করার আর কারো প্রয়োজন নেই।

তারানাথের মুখে ফুটে ওঠে বিবর্ণ পাংশু একটা অপমানের কালো ছায়া। বলে তারা নাথ,

—ঠিকই বলেছো বাবা ! দিন বদলেছে--যুগ বদলেছে। তাই এ যুগে এসবই অচল। দেবতাও নির্বাসিত—আমরাও বাতিল।

কর্তারা দু একজন বেঁচেছিলেন, তাদের কোন কথাই চলে না। তারানাথ তর্কতীর্থ সেই বছর থেকেই ওই যজমান বৃত্তি ছেড়ে দিয়েছেন।

বৃদ্ধ অসহায় রাগে অপমানে সেদিন শূন্য হাতে ফিরে এসেছিল পূজোমণ্ডপ থেকে।

—এসব নেবেন না ঠাকুর মশাই ?

—না ! তারানাথ কঠিন কণ্ঠে জবাব দিয়েছিল।

—এতদিন শ্রদ্ধার পাত্র ছিলাম, তোমাদের প্রণামী নিতে বাধেনি। আজ বাধবে বাবা। ভিক্ষা গ্রহণ করে বাঁচতে চাই না। তোমরা আমায় ভুল বুঝো না। এই নীতির প্রশ্ন হয়তো ঠিক বুঝবে না।

জীর্ণ উত্তরী কাঁধে নিঃস্ব ব্রাহ্মণ সেদিন ওই বালুচর—দামোদরে নেমে রুক্ষ প্রান্তরের বুক চিরে গেরুয়া ডাঙ্গা পার হয়ে পায়ে হেঁটে গ্রামে ফিরেছিল।

নীলাও শুনেছিল সে সবকথা।

সে'বছরে সে বি-এ পাশ করেছে। ও জানতো এই পালা একদিন শেষ হবে, তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হবে। তাই প্রস্তুত হয়েছিল সে।

দাদুকে বলে,

—ও সবে আর কাজ নেই দাদু। মাষ্টারি করবো—জমির যা ধান আলু কলাই গুড় হয় তাতেই দুটো প্রাণীর চলে যাবে। সারা জীবন তো পরের হিত কামনাই করলে, এবার নিজের কথা একটু ভাবো।

তারানাথ আর বের হয়নি। যজমানি বৃত্তি ছেড়ে দিয়েছে। এতকালের অধীত বিদ্যা নিয়েই পড়ে থাকে পুঁথিপত্রের মধ্যে।

ওরা এসেছিল গাড়ি নিয়ে। কাজোরার বাবুরাও কয়লার ব্যবসায় ফেঁপে ফুলে উঠেছেন। তাঁরাও কর্মচারী পাঠিয়েছিলেন পূজোর সময়।

তারানাথ জবাব দেয়।

—আর যজমানি করবো না বাবা। ভিক্ষা অন্নে জীবনের শেষ ক'টা দিন আর বাঁচতে চাই না।

তারা ফিরে গিয়েছিল। আবার পুঁথির রাজ্যে হারিয়ে গেছলো ওই তারানাথ তর্কতীর্থ।

চারিপাশে দেখেছেন সেই অস্বস্তিকর পরিবেশ। গ্রামীন জীবনের সেই প্রীতি—সারল্যটুকুও নেই। স্তব্ধতা খানখান করে এখন ঘরে ঘরে ট্রানজিসটার রেডিওতে বাজছে উৎকট হিন্দী গানের সুর।

ভোরে পাখীগুলো কলরব করে, মুক্ত নীল আকাশে জাগে রক্ত লাল সূর্যের প্রথম আবির্ভাবের সূচনা, গ্রামের লোক জেগে ওঠে। দল বেঁধে সাইকেলে—পায়ে হেঁটে ওরা বড় রাস্তার দিকে যায়। গ্রামের সব দুধ—তরিতরকারী লুট করে নিয়ে সাইকেলে ওরা চলেছে ওই দুর্গাপুরের দিকে।

নীলাও ভোরে ওঠে।

তারানাথ ব্রাহ্মমূহূর্তে পুজোয় বসে। সেই ধ্যানেও ঠিক মন বসাতে পারে না।

সকালে স্কুল, নীলা তৈরী হচ্ছে।

—দাদু!

তারানাথ ওর দিকে চাইল। এর মধ্যে স্নান হয়ে গেছে নীলার। ভিজে চুলগুলো পিঠের নীল শাড়ীর উপর মিলে দিয়ে চায়ের কাপ নিয়ে ঢুকলো।

তারানাথ চা খায় না। নীলা বলে,

—তোমার জলখাবার রেখে গেলাম।

তারানাথের চোখের সামনে ওর ক্লান্ত চেহারার ছবি ভেসে ওঠে। বেঁচে থাকার জন্য ওই জনতার ভিড়ে আজ নীলাও সামিল হয়েছে। ওর জন্য ঘরের কোন আশ্বাস নেই। শূন্যতার বেদনায় তারানাথের মন ভরে ওঠে।

…জীবনে কোথায় যেন ঠকে গেছে সে।

তার সব আদর্শ ব্যর্থ হয়ে গেছে। এই দিন বদলের বাজিতে হেরে গেছে তারানাথ নিদারুণভাবে।

—এই ভাবেই চলবে দিদি ভাই?

নীলা জানে ওর ইঙ্গিতটা। তার কাছে এই কথাটাও মনে হয়েছে। গ্রামের পরিবেশে সে দেখেছে সেই সাজানো সংসারের ছবিটাই বহুবার। তার তুলনায় নিজের জীবনকে মনে হয়েছে শূন্য — ব্যর্থ।

তবু বার বারই এড়িয়ে গেছে দাদুর সেই ইঙ্গিতটা। তার বেদনাটাকে সে চেপে রাখতে চায়। ওটা প্রকাশ পেলে দাদুর দুঃখ আরও বাড়বে মাত্র।

তাই জোর করে হাসে নীলা। চায়ের পেয়ালাটা উছলে ওঠে সেই হাসির ধারায়।

—তোমার বার বার ওই এক কথা দাদু! তোমাদের দিনে এ ছাড়া পথ ছিল না। তাই ন বছর বয়সেই দিদিমাকে এনেছিলে। আজকের দিনে এতো সমস্যা—এতো ভাবনায় মানুষ ডুবে আছে যে ওই কথাটা তাদের মনেই থাকে না। তাছাড়া আমার ভাবনা কি?

তারানাথ নাতনীর দিকে চাইল।

হাসছে নীলা। আজও তেমনিই রূপবতী-তেমনি মিষ্টি রয়ে গেছে সে। নীলা চোখের তারায় কৌতুকের কাঁপন তুলে বলে,

—তুমি তো আছো! আইবুড়ো নাম খণ্ডাতে হলে তোমাকেই বা বঞ্চিত করি কেন? চলি দাদু, বেলা হয়ে গেছে, স্কুলের দেরী হয়ে যাবে।

নীলা হালকা পায়ে বের হয়ে যায়।

তারানাথ চুপ করে কি ভাবছে, সকালের গিনিগলা রোদ পড়েছে গাছ গাছালির মাথায়। এতো আলো—তবু মনের অতলের অতলের বেদনাকে ভুলতে পারেন নি তারানাথ।

বিনয়বাবুর গাড়ির শব্দ উঠছে। ওরাও দুর্গাপুরে যাচ্ছে। এগ্রামে সেই যন্ত্রজগতের সাড়া এসেছে তার সবকিছু প্রশান্তিকে বিঘ্নিত করেছে।

রাত নামে।

নীলা এক তাড়া খাতা দেখছে। স্কুলের পরীক্ষার খাতা।

তারানাথের সামনে একটা পুঁথি খোলা পড়ে আছে। জীর্ণ কীটদষ্ট একটা পুঁথি। প্রায় একশো বছর আগে কোন লেখক মূল থেকে অনুলিপি করেছে।

লেখক দোষনাস্তি। যদৃষ্টং তদ্‌লিখিতং। লেখক শ্রী গুপীকান্ত শর্মা।

লেখকের সাকিম, পুঁথি অনুলিপির তারিখও রয়েছে তাতে। কতো যুগ অতীতের সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে। সেদিন এদিগন্তে ছিল বনসীমা, শান্তি ছিল নিশ্চয়ই। ঘরের সীমানায় ছিল সুখ আর শান্তি। মানুষও এমনিভাবে বদলে যায় নি।

নীলা খাতাগুলো দেখছে। মুখেচোখে ফুটে ওঠে বিরক্তির রেখা। ভুল বানান তো আছেই, একটা লাইনও অনেকে শুদ্ধ করে লিখতে পারে নি।

মেজাজ বিগড়ে যায়। মুখে চোখে ফুটে ওঠে বিরক্তির রেখা।

স্কুলেরও মাইনে পায়নি দুমাস। অস্থায়ী স্কুল—মাইনে যা আদায় হয় তা চলে যায় বলহরি সামন্তের তহবিলে। বিনয়বাবু নামেই সেক্রেটারী। ওসব ব্যাপার দেখাশোনা করে বলহরিই।

গ্রাণ্টের টাকা এলে তবে মাইনে পায়। অনেকে মাসে মাসে কিছু করে নেয়। সালতামমি হিসাব করা হয় অনেক পরে।

নীলার মনে হয়, ওটাও ওদের চক্রান্ত! মাইনের টাকাটা খাটিয়ে নেয় কয়েকমাস। দফায় দফায় কিছু দেয় মাত্র।

নিজে কিছুই নেয় নি নীলা। অন্য মাষ্টারদের কিছু করে দিয়েছে। দাদুকেও সংসারের সেই কথাটা জানাতে পারেনি। অনেক আশা নিয়েই স্কুলের চাকরী নিয়েছিল সে। কিন্তু সেখানে সে ব্যর্থ হতে চলেছে।

তবু হেরে যাবে না সে।

বাতাসে বিশ্রী গন্ধ উঠছে। মাঝে মাঝে রাতের অন্ধকারে এমনি বদ গন্ধ ওঠে ওপাড়ার দিক থেকে। বলহরি সামন্তের খামার বাড়ি থেকে গন্ধটা উঠছে। কিসের গন্ধ তা জানে ওরা, চোলাই মদের যেন কারখানাই খুলেছে সে :

এ মালও যায় ওই দুর্গাপুর, আসানসোল অঞ্চলে। এখানেও ওর বেশ ক্রেতা গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। অনেকেই আপত্তি করেছে—কিন্তু বলহরির পয়সা আছে। তাকে নিরস্ত করা যায়নি।

তারানাথ বলে,

—এত পাপ জমে উঠেছে দিদি ভাই।

—ওদেরই তো দুনিয়া দাদু, পাপপুণ্য একাকার হয়ে গেছে।

তারানাথ মাথা নাড়ে,

—তা হয় না রে, একদিন এর গতি থামবেই।

মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে তারানাথ। মদের প্রসাদে গ্রামে একটা নতুন শ্রেণী তৈরী হয়ে উঠেছে। তাদেরও দেখেছে তারানাথ।

কিছু কাঁচা পয়সা রোজকার করে। কারখানায় কাজ করে আর সন্ধ্যার পর ফিরে নেশাকরে মাতাল হয়ে পথে বের হতেও লজ্জা করে না তাদের।

বাইরে একটা শিষের শব্দ শোনা যায়।

কোথায় খুট করে একটা ঢিল এসে পড়ল। এমন পড়ে মাঝে মাঝে।

—কে!

তারানাথ উঠে বের হতে যাবে, বাধা দেয় নীলা। সেও জানে এইসব ঘৃণ্য জীবগুলোকে। তাদের জঘন্য ইঙ্গিত আজ স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। নিজেরই লজ্জা করে। বাধা দেয় সেই জন্যই।

—যেও না দাদু!

বৃদ্ধ তারানাথ আজ অক্ষম, অসহায়। নইলে একদিন তার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে অনেকেই থেমে গেছে। আজ তারানাথের পরিবারের সম্ভ্রমটুকুও যেতে বসেছে। তারানাথ বলে,

—চুপ করে এইসব জঘন্য ব্যাপার দেখবো শুধু?

নীলা জবাব দেয়।

—চুপ করে থাকাই ভালো। ওদের এখন জ্ঞান গম্যিও নেই। থাকবে কোথেকে? ওদের একপাল জানোয়ারে পরিণত করেছে ওই বলহরি আর বিনয়বাবু। ওরা তার কেনা গোলামের দল।

এখুনি বোধহয় ঝাণ্ডা হাতে বিনয়ের জন্য ভোট চাইতে বের হবে। শুধু তারই জন্য বিনয়ও ওদের সব পাপকে প্রশ্রয় দেয়। সেই প্রশ্রয় পেয়ে ওরা মাথায় উঠেছে।

বাতাসে মদের গন্ধ উঠছে। তাজা তীব্র সেই গন্ধ। তারানাথের যেন দম বন্ধ হয়ে আসে।

—এখানে আর থাকা যাবে না নীলা।

নীলা তবু বলে -সব জায়গাই যে সমান হয়ে উঠেছে দাছু।

—আর মানুষও কি কেউ নেই? ভগবান এর বিচার করবেন দেখে নিস্!

হঠাৎ অন্ধকারে কাদের ভীত ত্রস্ত পায়ের শব্দ ওঠে। অন্ধকারে ওই জানেয়ারের দল কিসের ভয়ে পালাল।

স্তব্ধতা নামে। নীলা বেশ অনুভব করেছে, ওরা এতক্ষণ এ বাড়ির আশেপাশেই ছিল। হঠাৎ কাউকে আসতে দেখে সরে গেল তারা।

তারানাথ বলে।

—ভগবানের রাজ্যে অনিয়ম নেই দিদিভাই।

—ভগবান! ভগবানের রাজ্য! কে বলিষ্ঠ কণ্ঠে যেন ব্যঙ্গ করে চলেছে।

—ভগবান! তোমার ভগবান ও মরে গেছে দাছু! আহা, এতদিন ভগবান বলে যার এত মূর্তি কল্পনা করেছিলে সব মিথ্যে।

—পান্নু! তারানাথ ওকে ঢুকতে দেখে খুশীই হয়।

—আয় ভাই! বোস! নীলা একটা আসন দে রে প্রাণগোপালকে।

নীলার হাত থেকে প্রাণগোপাল আসনটা নিয়ে নিজেই দাওয়ায় পেতে বসলো।

পান্নুর সঙ্গে অনাদিও এসেছে। আজ তারা ছুজনে দেখেছে, রাতের অন্ধকারে ওই পলায়মান জীবগুলোকে। বাতাসে তখনও উদগ্র সেই গন্ধ ভাসছে।

তারানাথ বলে,

—তোমার কথাই ভাবছিলাম পানু, শুনেছি তুমি ফিরেছো। বাইরে আর যাই না, ভাবছিলাম একদিন ডেকে পাঠাবো। যাক, তবু তুমি নিজেই এসেছো।

নীলা এগিয়ে আসে, প্রণামও করে সে।

—তুমি !···

তুই বলতে গিয়ে পারলো না প্রাণগোপাল। অনেক বড় হয়ে উঠেছে নীলা। এখন সে গার্লস স্কুলের হেড মিসট্রেস।

তবু আরও যেন সুন্দর হয়েছে নীলা। লেখাপড়ার একটা মার্জিত রুচির ছাপ পড়েছে তার মুখে চোখে। মিষ্টি একটা আবেশ ফুটে ওঠে ওর যৌবনচ্ছল দেহের কানায় কানায়।

প্রাণগোপাল বুঝতে পারে কি ভাবে আছে তারা। অনেকেই আজ মনে মনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ওই যাদব কুলের অত্যাচারে। তাদের মদমত্ত প্রকাশের পরিচয় এই শান্ত গ্রামের আকাশ বাতাসকে বিষিয়ে দিয়েছে।

—কেমন আছো ?

নীলার কথায় ওর দিকে চাইল প্রাণগোপাল।

ওর মনের সেই নিঃস্বতার সংবাদ বোধহয় জানে না নীলা। প্রাণগোপালের সামনে তার জগতটা বদলে গেছে। শূন্য ব্যর্থ দিনেরই বোঝা বয়ে চলা এই জীবন।

এ গ্রামে এসেছে, এখানের মানুষদের দেখে মনে হয়েছে একা তার দুনিয়াই বদলে যায় নি। বদলে গেছে সবকিছু। সব মানুষই সেই পারবর্তনের জগদ্দল পাথরের চাপে পিষে মরছে।

রাস্তাঘাট হয়েছে। যাতায়াতের সুবিধা হয়েছে। বড় বড় ঝকঝকে বাস প্রাইভেট কার ছুটছে। ব্রিজ—কলকারখানা গড়ে উঠেছে। আগেকার দিনের সেই আট হাতি ধুতি আর খালি পায়ের মাটির গন্ধ মাখা মানুষগুলো কোথায় হারিয়ে গেছে। আজ

সেখানে ঘুরে বেড়ায় প্যান্ট—হাওয়াই সার্ট পরা নতুন মানুষের দল। তারা কলে কারখানায় কাজ করে, পয়সা রোজকার করে।

কিন্তু সেই টাকার জন্য তারা অনেক কিছুই হারিয়েছে। কি হারিয়েছে তা তারাও জানে না। হারাবার বেদনা অনুভব করার মত মনও তাদের নেই। কি নেশায় মাতাল হয়ে দুর্বার গতিতে কোন অতল খাদের দিকে নেমে চলেছে।

অতীতের দিনগুলোকে তারা ভাবে অন্ধকারের দিন। বর্তমানই তাদের কাছে সব। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনও চেতনাও নেই তাদের মনে।

এই বিরাট ক্ষয় আর ক্ষতিটাকে দেখেছে প্রাণগোপাল, অনুভব করেছে। তার জন্য বেদনা বোধ করে না সে।

অসহায় রূপটা নির্মম ব্যঙ্গেই পরিণত হয়েছে।

জবাব দেয় প্রাণগোপাল,

—ভালোই আছি, একালে খারাপ থাকার কথা ভাবলেই দম বন্ধ হয়ে আসবে নীলা। সব সইতে হবে—

তারানাথ চুপ করেছিল। বৃদ্ধের কাছে তিল তিল জমা অপমান—ওদের দেওয়া আঘাতটা শেল হয়ে বাজে। এতদিন সব সয়েছে সে।

ওই বলহরি তার খামার বাড়ির বেশ খানিকটা জায়গা পাঁচিল দিয়ে রাতারাতি ঘিরে নিয়েছিল।

ফৌজদারী করার ক্ষমতা নেই। তবু প্রতিবাদ করেছিল তারানাথ।

বলহরি জবাব দেয়,

—রেকর্ড দেখবেন কাকামশায়, ওটা আমাদেরই। এতদিন দখল নিইনি।

নীলাই থামিয়ে দিল দাদুকে।

—তা হবে দাদু!

বলহরিকে চটাতে চায়নি নীলা। লোকটাকে সে ভয় করে।

বিনয়বাবুর কাছে নালিশ করেও ফল হয়নি। তারানাথ তর্কতীর্থ মুখ নীচু করে ফিরে এসেছিল। নীলা বলে।

—ওকে ঘাঁটিও না দাদু!

—তোর স্কুলের মনিব না! তাই বলছিলাম দিদি—চাকরী করে লাভ কি! জমিজারাত বেচে তোর বিয়ে থা দিয়ে দিই!

হেসেছিল নীলা।

—তাড়াতে চাও, না?

অনেক সয়েছে তারানাথ।

এইবার নতুনভাবে অত্যাচার শুরু হয়েছে। রাতের অন্ধকারে ওরা উৎপাত স্বুরু করেছে।

এতদিন পর প্রাণগোপালকে ফিরতে দেখে মনে মনে খুশী হয়েছে তারানাথ। নীলাও যেন ভরসা পেয়েছে মনে মনে।

বলিষ্ঠ একটি মানুষ। তারানাথের সেই ছবিটা মনে পড়ে, বিশে সর্দারকে গুলি করে মেরেছিল—জখম করেছিল অন্যজনকে। বলহরি প্রাণ ভয়ে দৌড়চ্ছে, ...সেদিন ওর তেজদৃপ্ত মূর্তির সামনে বলহরিকে মনে হয়েছিল ভীরু একটা কুকুর।

তারানাথ বলে,

—তবু তুমি এসেছো প্রাণগোপাল, ভরসা পেয়েছি।

—ভরসা!

প্রাণগোপাল ঠিক বুঝতে পারে না ভরসার কি আছে তার মধ্যে।

নীলা ওর দিকে চাইল বেদনা কাতর চাহনি মেলে। বিশাখার কথা মনে পড়ে প্রাণগোপালের। তার উপরও বোধ হয় এমনি ভাবেই অত্যাচার করেছিল ওরা। প্রলোভনে ভুলেছিল সে।

প্রাণগোপালের মনের অতলে কোন লুপ্ত শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। রাতের জাগর তারার রোশনীতে কি প্রোজ্জল একটি আভা।

প্রাণগোপাল মনে মনে জোর পায়।

তারানাথের কথায় বলে সে।

—দিন বদলে গেছে দাদু! মানুষ আগেকার মত সৎ আর নেই। তাই অন্তর মনের জোরও তার হারিয়ে গেছে। সামান্য স্বার্থের কাছে ওরা সবাই মাথা নিচু করেছে। নিজেদের সবকিছুকে বিক্রী করে দেউলিয়া হয়ে গেছে।

নীলার কাছে কথাটা সত্য বলেই মনে হয়।

নিজেই যেন সামান্য স্বার্থের খাতিরে অনেক অত্যাচার—জুলুম সহ্য করে চলেছে নীরবে।

তারানাথ বলে,

—আমি তো অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ আজও করিনি ভাই!

প্রাণগোপাল জবাব দেয়।

—তাই এই কথা বলেন। অনেকেই সয়ে যায়—বলে না। ভয়ে নাহয় কোন স্বার্থের জন্য চুপ করে থাকে। দুজনেই তারা সমান দোষী। আজ একা কি করতে পারি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে?

অনাদি এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। বলে সে,

—একা তুমি নও পানুদা! ভগবান—

হাসে প্রাণগোপাল,

—ভগবান। সব গেছে তোর তবু এখনও ওই ভগবান আগলে আছিস অনা!

অনাদি অনেক কিছু হারিয়েছে। তার ব্যবসা ওই বাসনের খুট গলানো শালের ব্যবসা উঠে গেছে। এখন বিনয়বাবুই গোটা কামারপাড়াকে কিনে নিয়েছেন, কো-অপারেটিভ ফেঁদে। সব মূলধন সরকারের—বিনয়বাবু তার সেক্রেটারী। আর এরা সেখানের নাম মাত্র অংশীদার। সারাদিন মুখ বুজে ওই গরম দম বন্ধ করা শালে বসে মাল গালাই করে আর বাটি পেটে।

ঘরের অবস্থাও তার চেয়ে খারাপ।

অনাদি বুকের ভিতর যেন শালের সেই আগুন জ্বলছে অহরহ। তাই প্রাণগোপালের কথায় চুপ করে গেল অনাদি। ভগবান! সত্যই তেমন কোন বস্তু যদি থাকতো তাহলে এর কিছু প্রতিকার হতো।

তা হয়নি, হবার আশাও নেই একথা জানে অনাদি।

প্রাণগোপাল বলে,

—সব তোদের গেছে, তবু ওই ধারণাটাকে ছাড়িসনি। ওটা মন থেকে ভেঙ্গে চুরমার না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত কিছুই হবে না।

তারানাথ কথাটা শুনছিল।

গোঁসাই বাড়ির একটা মহান ঐতিহ্য আছে। ভক্তের বংশ। কুল দেবতা আজও প্রতিষ্ঠিত, ঘরে নারায়ণ শিলাও রয়েছেন। যদু গোঁসাই ভক্তিমান—ধার্মিক ছিলেন। তার ছেলের মুখে এসব কথা শুনে অবাক হয় তারানাথ।

—এ তুমি কি বলছো পানু! ভগবান নেই? দেবতা মিথ্যে?

প্রাণগোপাল বেশ বুঝেছে তার কথায় বৃদ্ধ সত্যই মর্মাহত হয়েছে। ওকে আঘাত দিতে চায় না। তার ধারণা তার কাছেই থাক। তাই বলে,

—ওটা তর্কের কথা দাদু! যার জীবনে সব কিছু মিথ্যে হয়ে গেছে ভগবান তার কাছে হয় পরম সত্য হয়ে ওঠে, না হয় চরম মিথ্যেই ঠেকে। তবে সেটা তর্কের কথা। আমাদের ধারণা মিলবে না। তবে এক জায়গায় আমাদের দু জনের মিল আছে দাদু- খুব মিল!

—কোনখানে?

প্রাণগোপাল বেদনা ভরা স্বরে জানায়।

—সব কিছু যে মিথ্যে হয়ে গেছে—সেই খানেই। দু জনেই ঠকেছি আমরা।

নীলা ওর কণ্ঠস্বরে অবাক হয়। কি যেন নিঃসহায় বেদনা

ঝরে পড়ে ওর কথায়, এটা নীলার দৃষ্টি এড়ায় নি। তাই চুপ করে থাকে সে।

প্রাণগোপাল বলে,

—রাত হয়ে গেছে, আজ উঠি দাদু। পরে আসবো। আর ভরসার কথা বললেন—সেটা কত দূর দিতে পারবো জানি না। তবে দরকার হলে স্মরণ করবেন। একটা খুন করেছি—আমিতো দাগী আসামী, ভয় তবু লোকে করে।

হাসবার চেষ্টা করে সে। ওই বাকিটুকু কেমন যেন বেদনায় নীল হয়ে ওঠে।

রাত হয়ে আসে।

তারানাথ কি ভাবছে। একটা অগ্নিপুঞ্জের মত তরুণ মন আজকের এই গ্লানিভরা রূপকে দেখে শিউরে উঠেছে। যে উদ্যম—উৎসাহ নিয়ে তারা সেদিন জেগে উঠেছিল, আজ তেমন কাউকেই নজরে পড়েনি।

দেখেছে আরও দু একজন তরুণকে। তারাও আজ দেশ-সেবার—জনসেবার জিগির তুলে পতাকা কাঁধে করে ফেরে। কিন্তু তাদের চেনে তারানাথ।

আজ প্রাণগোপালকে দেখে তাই একটু হতাশ হয়েছে সে। ওদের চোখের সামনে স্বাধীন দেশের সেই কল্পনার ছবিটার আজকের বাস্তবের সঙ্গে কোন মিলই হয়নি।

আলো কোথাও নেই। অন্ধকার হতাশাময় সেই ছবিটা দেখে বোধ হয় প্রাণগোপাল শিউরে উঠেছে। বেদনাও বোধ করেছে। সেই বেদনাকে ঢাকবার জন্যই ওমনি সব কিছুকে হেসে উড়িয়ে দিতে চায়।

ভগবান—দেবতার স্বরূপে বিশ্বাস ছিল তাদের মজ্জাগত, সেই বিশ্বাসের ভিত্তি মূলেও আজ প্রচণ্ড আঘাত সব কিছুকে চুরমার করে দিয়েছে।

তারানাথ চুপ করে ভাবছে।

—দাদু! রাত হয়েছে!

খেয়াল হয় তারানাথের। ভোরে ওঠা দীর্ঘ দিনের অভ্যাস। এদিকে বেশী রাত করে না। আজ রাত হয়ে গেছে।

তারানাথ বলে,

—যাই দিদি! হ্যাঁ, প্রাণগোপাল কেমন বদলে গেছে।

নীলাও তাই দেখছে।

সেদিন সে ছিল অনেক ছোট। তবু বিস্মিত বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতো সে ওই প্রাণগোপালের দিকে। অনেক কথাই শুনতো তার নামে। ও নাকি স্বদেশী করে। বোমা, রিভলবার নিয়ে ব্রিটিশের সঙ্গে যারা যুদ্ধ করে ও তাদেরই দলে।

দু একবার দেখেছে পুলিশ এসেছে ওর সন্ধানে। শিবতলায় কতবার ওকে মিটিং-এ দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে দেখেছে। তার কিশোরী মনে ওই প্রাণগোপালকে জড়িয়ে অনেক বিচিত্র বর্ণ-রঙিন ছবি ফুটে উঠেছিল।

সেই রঙিন দিনগুলোর স্মৃতি জড়ানো কত ছবি। প্রাণগোপাল সমস্ত শক্তি দিয়ে ওই লোভী—স্বার্থান্ধ একটা শ্রেণীর বিরুদ্ধে মাথা তুলেছিল। প্রতিবাদ করেছিল।

কিন্তু ওরা তাকে সহ্য করতে পারেনি।

যেদিন ওকে গ্রাম থেকে ধরে নিয়ে যায় সেদিন অনেকের সঙ্গে নীলাও গিয়েছিল। তার অজানতেই ওর দুটো চোখ জলে ভরে এসেছিল। বাধা মানেনি।

আজও দেখেছে প্রাণগোপালকে।

ছেলেবেলার কত স্মৃতি মনে পড়ে। তাই বিচিত্র দৃষ্টিতে ওই লোহ কঠিন মানুষটির দিকে চেয়েছিল। ওর দেহে এখন যৌবনের বিগতপ্রায় আভাষ, তবু মুখটা কঠিন চোখের চাহনিতে কি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের আভা। হঠাৎ বিচিত্র এক বদলে যাওয়া

জগতের ভিড়ে এসে সে হারিয়ে গেছে, হতচকিত হয়ে গেছে।

যে স্বাধীনতার জন্য তারা বুকের রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সেই স্বাধীনতা এসেছে। কিন্তু তারপর ?

দাহুর কথায় নীলা বলে—দেখলাম, কেমন যেন বদলে গেছে পানুদা।

তারানাথ মাথা নাড়ে।

—বদলানোই স্বাভাবিক, মানুষের সামনে একটা আদর্শ থাকে, সেই আলোতে সে পথ চলে, জীবনের সব কিছুকে সে গড়ে তোলে। যেদিন সেই আদর্শ ব্যর্থ হয়ে যায়, তার অন্তরের সব আলোও মুছে যায় নীলা। পানুর চোখের সামনে তাই আজ বিভ্রান্তি আর হতাশা।—এর থেকে মুক্তির পথ নেই ? নীলা শুধোয়।

বৃদ্ধ তারানাথ জবাব দিল না, ওর দিকে চেয়ে থাকেন।

রাতের অন্ধকারে প্রাণগোপাল পথে নেমেছে। জমাট অন্ধকার। ও পাশের আতা গাছের ঘন জটলা, ছোট বাঁশ ঝাড় কয়েকটা রয়েছে। আবছা অন্ধকারে কাদের ওদিক থেকে সরে যেতে দেখে চাইল। মুখ চিনতে পারে। সেদিনের ছোট ছেলেগুলো আজ যুবক। পটলা—দত্তদের নতু—কামার পাড়ার হু একজনও ছিল।

ওরা প্রাণগোপালকে দেখে তাড়াতাড়ি সরে গেল। প্রাণগোপাল অবাক হয়। ওরাই বোধহয় তারানাথ দাহুর বাড়িতে এই সব উৎপাত করে। হুর্গাপুরে চাকরী করে। হুটো কাঁচা পয়সার মুখ দেখেছে।...অন্ধকারে কার হাতে সিগ্রেটও জ্বলছে। প্রাণগোপালদের আমলে এসব ছিল না। ওরা হুদিনেহ হুনিয়াটাকে দখল করে নিয়ে তাদের গরলে বিষিয়ে দিতে চায়।

অন্ধকারে চলছে প্রাণগোপাল।

তারাজ্বলা সেই পথে আজও রাতের ভিজে বাতাস বয়। কত জাগর রাত্রে তারা এ পথে গেছে। শাল বনের গভীরে হারিয়ে গেছে। রিভলবার না হয় মালপত্র, কোনদিন বা বেলেতোড়ে কোন জরুরী খবর পৌঁছে দিতে হবে। সেদিন ছিল কাজের দিন। গড়ার স্বপ্ন, আজ এসেছে ফুরিয়ে যাবার দিন।

কার হাসির শব্দে দাঁড়াল প্রাণগোপাল। বাতাসে উঠছে বিশ্রী কি টক গন্ধ। বলহরি সামন্ত চোলাই-এর কারবার সুরু করেছে।

ওই হাসি সে চেনে, নিশি হাসছে। ওপাশের প্যাণ্টপরা ছেলেটাকে ঠিক চিনতে পারে না প্রাণগোপাল। ওরা সরে গেল।

অন্ধকারে এ গ্রামের জীবনেও এসেছে সেই কদর্য লালসার পঙ্কিল জীবন যাত্রা। মদ—মাংস—জুয়া—নারীমেধ সবকটাই দেখেছে সে এখানে।

প্রাণগোপাল দুটো যুগকে দেখছে।

—পানু ভাই!

অন্ধকারে চমকে ওঠে প্রাণগোপাল গাইয়ে মনুকে দেখে।

—তুমি এই অন্ধকারে কোথায় চলেছো?

হাসল মনু। মলিন বিবর্ণ হাসি। জবাব দেয়।

—অন্ধকার তো আমার চিরদিনের সঙ্গী পানু, নিশিকে খুঁজছি। বুঝলে—মেয়েটা যে কোথায় গেল?

প্রাণগোপাল জানে সেই খবর। কিন্তু বলতে পারে না। চুপ করে রইল।

মনু বলে,

—ওকে বলহরি বলেছে কি চাকরী করে দেবে। মেয়েটা চাকরীর জন্য ক্ষেপে উঠেছে—বুঝলে ভাই, ঘরে আর মনটেকে না ওর। অল্প বয়সে সব হারিয়ে এল। বললাম থাক মা, দুঃখ ধান্দা করে দিন চালাবো। তা কে শোনে কার কথা।

বলে গান গেয়ে—চেয়ে চিন্তে দিন চলার দিন ফুরিয়ে গেছে। ওতে মান সম্মান থাকে না। ওরে সম্মানের কাজ—

প্রাণগোপাল ওর দিকে চাইল।

—গান শুনিনি অনেকদিন।

বুড়োর মুখটা চকচকে হয়ে ওঠে। বলে,

—শোনাবো ভাই। ওই নিয়েই তো আছি। মনে হয় কি জানো—

গাইবার সময় দেখি তোমাদের সেই মুখগুলো। কতো মানুষ, দুচোখ ঝকঝক করছে তাদের। ইয়া ছাতি, মুঠো করা হাত উঠেছে আশমানে—জোরালো গলার সেই হুঙ্কার শুনি—বন্দেমাতরম!

বুড়োর গলা পঞ্চমে ওঠে।

—ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব নয়া প্রভাত,
আমরা ঘুচাবো তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।
চলরে—চলরে—চল,
ঊর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল,
নিম্নে উতলা ধরণীতল'—

পানু ওই লোকটার দিকে চেয়ে থাকে। অতীতের সেই দিনেই রয়ে গেছেও। চোখ দিয়ে আজকের এই সর্বনাশ আর অবক্ষয়কে সে দেখেনি। দেখলে ওর গান স্তব্ধ হয়ে যেতো।

অন্ধকারে সাইকেলের ঘণ্টা বাজছে। ডাইনামোর এক ঝলক আলো পড়েছে রাস্তায়।

—আরে বেড়ে জমিয়েছো হে চারণ কবি।

সাইকেল থেকে নামল গঙ্গাধর। সেই শীর্ণ প্যাকাটির মত চেহারায় শ্রী ফিরেছে। সাইকেলটাও নতুন মত। গঙ্গাধর বলে,

—দ্বাদশ মন্নু রাত তুপুরে বাড়ি যাও বাবা। কেন লোকের ঘুমের ব্যাঘাত করছো। মাথাটা এইবার খারাপই হবে ওই স্বদেশী গান গেয়ে।

হঠাৎ ওপাশে দ্বিতীয় ব্যক্তিটিকে দেখে চমকে ওঠে গঙ্গাধর। একটু মিইয়ে যায়।

—প্রাণগোপাল! শুনেছিলাম তুমি এসেছো। ভালোই হল। এবার নতুন করে দেশের কাজে লেগে যাও। এসো একদিন বিনয়বাবুর ওখানে, নানা প্ল্যান প্রোগ্রাম আছে। আচ্ছা! চলি তাহলে—

গঙ্গাধর চলে গেল।

প্রাণগোপালের ভাব লেশহীন ওই দৃষ্টিতে সে ভয় পেয়েছে।

মন্নুও থেমে গেছে। ও চলে যেতেই মন্নু হেসে ওঠে।

—পালালো গঙ্গাধর না?

—হ্যাঁ!

—ভয় পেয়ে গেছে বুঝলে ভায়া। আজকাল ও নাকি একজন মাতব্বর লোক। তা পালালো কেন বল দিকি?

—কি করে জানবো? প্রাণগোপাল জবাব দিল।

—চল, বাড়ি পৌঁছে দিই তোমাকে মন্নুদা। তোমার ভাইঝি বোধহয় পাড়াতেই কারো বাড়ি গিয়েছিল, এতক্ষণে ফিরেছে।

অন্ধের হাত ধরে নিয়ে চলেছে প্রাণগোপাল।

মন্নুর সেই ভাবনাটা মনে পড়ে।

—বুঝলে ভায়া, সব কেমন বদলে গেছে। দিন আর চলে না। তখন শুনেছিলাম দিন বদলাবে। কিন্তু একি হল ভাই? এত অভাব—এত তুঃখ—এত লোভ। নিশিকে দেখে মনে হয় ভাই—যেন ঠকে গেছি আমরা।

মন্নুর অন্ধকার তুচোখের সামনে তমসা ঘনতর হয়ে ওঠে।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে চলেছে তুটো পথহারা মানুষ।

প্রাণগোপাল ফিরছে বাড়ির দিকে। সামনে দিঘীর ওপারে দাঁড়িয়ে আছে সেই ধ্বংসপুরীর মত বাড়িগুলো।

মরা দিঘীর পাঁক জলে পদ্ম ফুল ফুটেছে। প্রাণগোপাল থমকে দাঁড়াল।

ওরই সুরভি আজ তার মনে কি বেদনার সুর এনেছে। মনে পড়ে হারানো সেই দিনের কথা।

রমা নেই। সে চলে গেছে।

সবচেয়ে আজ নিবিড় করে মনে পড়ে বিশাখার কথা। তার জীবনের সঙ্গে মেয়েটা তার অজানতেই জড়িয়ে গিয়েছিল।

ডাগর কালো দুটো চোখ তুলে সে চাইতো। তার জন্য অনেক কিছু বিপদেও সে জেনে শুনেই এগিয়ে গেছল।

—যদি ধরা পড়িস একেবারে জেল।

বিশাখা জবাব দিতো।

—শ্বশুর বাড়িতো হ'ল না, তবু না হয় শ্বশুর বাড়িই ঘুরে আসবো।

বিশাখার সেই সুর যেন আজও রাতের আকাশে মিশিয়ে আছে। ভোরের আকাশ ভরে উঠতো তার সুরে।

—রাই জাগো রাই জাগো বলে,

শুক সারী ডাকে।

এ মাটীর বুক থেকে সব সবুজ সব সুর হারিয়ে গেছে। ওই মনুকেও তারা ব্যঙ্গ করে। প্রাণগোপালের জন্যও এখানে যেন এতটুকু ঠাঁই আর নেই।

তবু পথ চলতে হবে তাকে।

অন্ধকারে এগিয়ে চলে। বিশাখার কথা মনে পড়তে ওই চাপা রাগটা মাথা তোলে। তাকে ওরাই প্রলোভন দেখিয়ে জোর করে এ মাটি থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

বলহরি সামন্ত আর বিনয়বাবুর শক্ত লোভী হাতটা সব সুন্দরকে টিপে নিঃশেষ করে দিয়ে নিজেদের প্রাধান্যই বিস্তার করেছে।

আলোগুলো জ্বলছে। সামনের বিরাট আয়নায় পড়েছে ওর ছায়াটা। বিশাখার রূপ আজ বদলে গেছে।

সেই গ্রামের সবুজ স্নিগ্ধ পরিবেশ থেকে সহরের এই উদ্দামতার মধ্যে এসে সেই মেয়েটি আজ বদলে গেছে।

দেহে এসেছে নিটোল পূর্ণতা. এতদিনের সেই সবুজ পত্রাবরণের মাঝে লুকানো ফল রূপে রসে পূর্ণতায় ভরে উঠেছে। চোখের পাতায় কাজল নয়– সূর্মার রেখা। গালে কৃত্রিম লালিমা ফুটিয়ে নিতে শিখেছে।

নিজেকে আরও আকর্ষণীয়—আরও মদির করে তুলেছে বিশাখা। আজ তার জীবনের পথ-মান সব বদলে গেছে। আজ সে টাকার মুখ দেখেছে।

কাঁচা টাকা। এখানের অন্ধকার জগতে ওটা যেন উড়ে বেড়ায়।

এত প্রাচুর্যের মাঝেও তবু কোথায় যেন ক্লান্তি জাগে। বোধহয় তার অন্তরের চাপাপড়া সেই হতাশা আর বেদনাটা মাথা চাড়া দেয় তারই জন্য এই ক্লান্তি।

এ পথে আসা ছাড়া তার পথ ছিল না।

সেই আগেকার দিনগুলোকে আজও তাই স্মরণ করে এত প্রাচুর্যের মাঝে। ওরা তাকে জোর করে সেই পরিবেশ থেকে ছিনিয়ে এনেছিল রাতের অন্ধকারে।

বিশাখা সেই রাতের কথা ভোলেনি। কঠিন হাতে ওরা তার মুখ বন্ধ করে অন্ধকারে গাড়িতে তুলেছিল। মুক্তির জন্য উদ্দাম চেষ্টা করেও সে পারেনি।

বলহরি বলেছিল,

—চুপ করে থাক বোকা মেয়ে কোথাকার।

ক'টা বছর তারপরও কেটে গেছে। এই জীবনের প্রাচুর্যে সে হারিয়ে গেছে। প্রথম প্রথম কেঁদেছিল। বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল তার সারা মন। মুক্তির চেষ্টাও করেছিল।

রাতের অন্ধকারে সেই বলহরি সামন্তের দল তাকে ভেট পাঠিয়েছে নানা জায়গায়। বিশাখা সেই সব অত্যাচার সহ্য করেছে।

একদিন হঠাৎ সেও নিজের পথই বেছে নেয়। এই পথ। বেশ অনুভব করে—তার গ্রামে ফেরার পথ আর নেই। সেদিন থেকে সে পরিণত হয়েছে নতুন একটি মানুষে। সে ওই জীবনকে মেনে নিয়েছে বাধ্য হয়ে।

তবু কান্না আসে মাঝে মাঝে। মনে পড়ে অতীতের কথা। একটা মানুষকে সে আজও ভোলেনি।

গ্রামের সব স্মৃতি সবুজে মিশিয়ে আছে প্রাণগোপলের সেই মুখ খানা।

জীবনের প্রথম সেই মানুষটিকে আজও ভোলেনি বিশাখা। তার জন্য মনের অতলে কোথায় একটু কোমল ঠাঁই রয়ে গেছে।

আজকের মানুষদের দেখেছে। এখানে তার চারপাশে যাদের দেখেছে তাতে মনে হয়েছে এ কোন অমানুষের রাজ্য। হিংস্র একপাল জানোয়ার যেন রাতের অন্ধকারে এই জগতের সবকিছু লুটে নেয়।

তাই এই যন্ত্রনার মাঝে বিশাখা অতীতের সেই দিনগুলোর কথা মনে করে। ললিতাদিও বার বার তাকে নিষেধ করেছিল। কোথায় আছে ললিতাদি-কেমন আছে জানতে ইচ্ছে করে। প্রাণগোপালকেও অনেকদিন দেখেনি, এতদিনে বোধহয় জেল থেকে ফিরে এসেছে।

গ্রামেই আছে বোধ হয়।

সেই পুরানো চুনবালি খসা বাড়িগুলো—ছায়াঘন বকুল গাছটার

কথা মনে পড়ে। এখনও সন্ধ্যায় সেখানে ওঠে আরতির কাঁসর ঘণ্টার সুর। অন্ধকার নামে গেরুয়াডাঙ্গা আর শালবনের সীমানায়। দূরে শুশুনিয়া পাহাড়ের সেই কালো আকাশজোড়া চিহ্নটাও আঁধারে হারিয়ে যায়।

নীচে কার গাড়ি থামার শব্দ ওঠে।

বিশাখার মুখ চোখের চেহারা বদলে যায়। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ তুলে উঠছে বলহরি সামন্ত।

মাঝে মাঝে আসে লোকটা এখনও। ও তার অতীত দিনের পরিচিত। সহরে এলে আসে মাঝে মাঝে। লোকটার চুল সব প্রায় পেকে গেছে। সামনের দাঁতগুলোও সব বাঁধানো। চাহনিটা বুনো শিয়ালের মত লুব্ধ আর কুটিল।

বলহরি ঘরে ঢুকে ফরাসের উপর ফুৎ করে একটা তাকিয়া টেনে নিয়ে বসে চারিদিক দেখতে থাকে। জব জব করে পান চিবুচ্ছে। বুনো মোষের মত কালো গায়ের রং-এর জেল্লা আদ্দির পাঞ্জাবীর নীচে থেকে ঠেলে বের হচ্ছে।

—তাহলে ভালোই আছিস কি বল?

বিশাখা ওর দিকে চাইল। ওর দুচোখে একটা কাঠিন্য ফুটে ওঠে। লোকটাকে সে সহ্য করতে পারে না। ওই তাকে এই ঘৃণ্য জীবনের পথে ঠেলে দিয়েছে জোর করে।

বিশাখা তার নিজের জীবনের এই পরাজয়ের কথাটা ওকে জানাতে চায় না। মনের সেই জ্বালা চেপে সহজভাবেই বলে বিশাখা।

—ভালই আছি।

সামন্তমশাই সহরেও এখনও ভালো কারবার চালাচ্ছে। গাড়িতেই মালপত্র আসে, তাছাড়া অন্যভাবেও আসে। এখানের অনেক দোকানেই তার চোলাই মদ বিক্রী হয়।

সামন্ত মশায় বলে,

—একটু কাজে এলাম, ভাবলাম খবর নিয়ে যাই।

তা একটু চা খাওয়া দিকি। কাজের কথা ছিল।

বিশাখা ওকে তাড়িয়ে দিতে পারে না। কি কাজের কথা হবে তা জানে সে।

...চা খেতে খেতে বলে চলেছে সামন্ত মশাই।

—বিনয়বাবু বললেন, তুইই চল। গাড়িতে যাবি—আবার শেষ রাতেই ফিরে আসবি। মস্ত বড়লোক—

বিশাখা জানে, তাকেও একরাত্রের জন্য অন্য সব ভেট্-এর সামগ্রীর মতই যেতে হবে কোন এক জঙ্গল ঘেরা বাংলোয়। হোমরা চোমরা কোন সাহেব যাবেন শিবপুরের জঙ্গলে শিকার করতে তাকেও রাত কাটাতে হবে সেই বাংলোয়।

বিনিময়ে সে পাবে কয়েক শো টাকা, আর বিনয়বাবু পাবেন বেশ কয়েক হাজার টাকার মুনাফা। বলহরি সামন্ত ফাঁক থেকে কিছু বাণিজ্য করে নেবে।

এ যেন একটা জাল পাতা, বিরাট জাল। সেই অদৃশ্য জালে জড়িয়ে গেছে বিশাখার ভাগ্য। ভাবছে সে।

বলহরি সামন্ত ফোলিও ব্যাগ থেকে দুটো বাণ্ডিল বের করে, —নে, তোর এক কিস্তির মালের টাকা। তিন পেটি রেখে গেলাম আজ। বরাকর থেকে স্লিপ নিয়ে আসবে, দিয়ে দিবি তাকে।

বিশাখার বাড়িতেও এসব কারবার চালায় বলহরি। বিশাখা বাধা দিয়েছে বহুবার।

—এসব ঝামেলায় জড়িয়ো না সামন্ত মশাই।

বলহরি শোনেনি, বলে—তোর কি! থোক টাকা তবু আসছে।

লোকটা এমনিতেই শয়তান। ওকে চটাতে সাহস পায় না বিশাখা। ওর জীবনে কালোছায়ার মত ওই দৈত্যটা সব আলো-টুকুকে নিভিয়ে দিয়েছে। এর থেকে নিষ্কৃতি নেই।

বলহরি শোনায়—তাহলে ওই কথাই রইলো! বুঝলি, নাচতে নেমে ঘোমটা টানলে চলে? আরে একালের এই ধম্মো, যতদিন পারো কুড়িয়ে নাও। ব্যস।

কে আসছে। বলহরি চুপ করে গেল। একটু অবাক হয় বলহরি নবাগত তরুণটিকে দেখে।

বলহরি উঠে দাঁড়াল। তবে ওর আসাতে খুশী হয়নি সে।

ফরাসের ওপাশে হারমোনিয়াম তবলা রয়েছে। খোলেপোরা একটি তানপুরা।

ভদ্রলোক বলহরিকে দেখে অপ্রস্তুত হয়। বলে বিশাখাকে —কই রেওয়াজ সুরু করোনি? আজ তাহলে থাক—আমি চলি। বলহরি আবার যেন ফরাসে চেপে বসবে,...কিন্তু বিশাখাই বলে,

—এই বসবো এইবার। আজ একটু ব্যস্ত রয়েছি সামন্ত মশাই।

বলহরিকে ওঠবার ইঙ্গিতই করে সে। ক্ষুন্ন হয় বলহরি। ওই ভদ্রলোকের পোষাক-আশাকে অতি সাধারণ ভাবই ফুটে ওঠে।

তবু ওকে দেখে বিশাখার চোখে মুখে খুশীর আভাটা তার নজর এড়ায় নি।

সামন্ত মশাই এত টাকা দিয়েও ওর মন পায়নি। মেয়েটার কাছে এলে নিজেকেই কেমন ছোট মনে হয়। আজও বিশাখা তার সামনে মাথা উঁচু করে কি দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়ায়।

বলহরি মনে মনে ভয়ও করে মেয়েটাকে। তার অন্ধকারের ব্যবসার অনেক খবরই রাখে সে। তাছাড়া বিনয়বাবুর সম্বন্ধে অনেক গোপন খবর তার জানা।

তাই মেয়েটাকে হাতের বাইরে যেতে দিতে চায় না সে।

আজ ওই ছেলেটিকে দেখে তাই মনে মনে ভাবনায় পড়েছে বলহরি।

নীচে নেমে এসেছে সে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। অন্ধকারে একটা সুর উঠছে। মিষ্টি একটা সুর। বিশাখা গাইছে। বলহরি অবাক হয়। বিশাখা যে এমনি গাইতে পারে সে কথা ভাবেনি।

—বাবু!

ড্রাইভারের ডাকে চমক ভাঙ্গে, জিপে স্টার্ট দিয়েছে সে।

অনেক কাজ আছে। কয়েকটা জায়গায় আদায় উশুল করতে হবে।

বলহরির আবার সেই হারানো লোভী সত্তাটা ফিরে আসে।

এই নরক যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে বিশাখা, গান গাইতো সে ছেলেবেলা থেকেই। গ্রামের কাশীরাম কীর্তনীয়ার কাছে কীর্তন শিখেছিল। ভাল লয় পদাবলী কীর্তন গাইতো।

সেই সুরময় জগত থেকে সরে এসে কোন দুর্বার লালসা আর কামনাময় ঘৃণ্য জীবনের ভিড়ে হারিয়ে গেছল সে। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করে ওই সুরকে।

প্রভাতের সঙ্গে পরিচয় হয় একদিন আসানসোলে একটা গানের আসরে। বিশাখা মুগ্ধ বিস্ময়ে তার গান শুনেছিল। মনের সব জ্বালা ভুলেছিল সেদিন ওই সুরের মায়ায়।

সে আজ বেশ কিছুদিন আগেকার কথা।

বিশাখা তারপর থেকেই নতুন জীবনের আস্বাদ পেয়েছে ওই সুরের জগতে।

এই ঘৃণ্য নরক থেকে সে বাঁচতে চায়। রাতের সেই কদর্য মানুষগুলোর লোভ লালসার আগুনে পুড়ে পুড়ে যেন আংরা হয়ে গেছে সে। তাই এভাবকে ভালো লাগে।

ওর দুচোখ কোনদিনই কোন আগুনের উত্তাপ দেখেনি। নিজের সাধনা নিয়ে সে মত্ত।

বিশাখা তারই স্পর্শে জীবনের হারানো মাধুর্যকে ফিরে পেতে চায়। বাঁচতে চায় নতুন করে।

গলায় সুরও ছিল, তান লয় মান সম্বন্ধে ধারণাও ছিল। আরও নিবিড় চর্চায় সেটা সুন্দরতর হয়ে উঠেছে।

মালকৌশ-এর করুণ—মূর্ছনায় অন্তরের সেই বেদনা ঝরে পড়ে। নিজেকে যেন অনেক হাল্‌কা বোধহয়।

সুরটা ধীরে ধীরে উঠছে আরোহীর পর্দাগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে। প্রাণময় সেই সুর। হৃদয়ের রক্তিম বেদনায় তা মুখর—রূপময়।

—বাঃ! প্রভাত চোখ বুজে শুনছে সে সুর।

মধ্যলয়ে তবলিয়ার নিপুণ সঙ্গতের সঙ্গে সমতা রেখে তান করে চলেছে বিশাখা। ফুলঝুরির মত সেই তানগুলো এক একটি উজ্জ্বল রেখায় ঝরে পড়ে।

দীর্ঘদিন পুণায় ছিল প্রভাত। বিনায়করাও পটবর্দ্ধনের কাছে তালিম নিয়েছে। তার শুদ্ধ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ধারা আজ ওই মেয়েটির প্রাণঢালা সাধনায় সার্থক রূপময় হয়ে উঠেছে।

...বিশাখা তন্ময় হয়ে গাইছে।

পথের সন্ধান পায়নি রমা। এই জীবনের ভিড়ে এসে সেও হারিয়ে গেছে। মনে হয় পথ আজ কোথাও সোজা নয়, জটিল আর বন্ধুর।

তার জীবনে একটা কামনা ছিল।

প্রাণগোপালকে সে ভালোবাসেনি, ভালোবাসার গভীরতা তার মনে কোন রেখাপাতই করেনি। তার মনেও ছিল ঘরের নেশা।

তাই বিয়ের ব্যাপারে সে খুশীই হয়েছিল।

অনেক আশা নিয়ে এখানে ঘর বেঁধেছিল সে।

নীরোদকে ক্রমশঃ চিনেছিল রমা। শুভদৃষ্টির সময় তার দিকে

চেয়ে একটু হতাশই হয়েছিল। রোদপোড়া তামাটে রং—চোয়ালটা শক্ত। মজবুত পেটানো চেহারা।

চোখের চাহনিতে একটা কাঠিন্যকে হাসির আভায় ঢেকে রাখতে চেয়েছিল সে। তবু তার খানিকটা ওর নজর এড়ায়নি।

এখানে এসে ক্রমশঃ বুঝেছিল রমা ব্যাপারটা।

সহরের বাইরে নতুন গড়ে ওঠা শহরতলী এলাকায় একটা ঘরে বাসা বেঁধেছিল। আসানসোল স্টেশন থেকে বেশ খানিকটা দূর।

মাঠের মধ্যে এদিক ওদিকে ছিটানো কয়েকটা বাড়ি। দু চারটে কৃষ্ণচূড়া—গোলমোহর ফুলের গাছ দাঁড়িয়ে আছে। ক্রমশঃ কাছিমের পিঠের মত নীচু হয়ে নেমে গেছে ডাঙ্গাটা। দূরে দামোদর নদের বালুচরে গিয়ে শেষ হয়েছে, দিগন্তের আকাশ-কোলে দাঁড়িয়ে আছে ছায়াময় নীল পাহাড় রেখা। প্যানচোত—বিহারী-নাথ দলমা আরও কি কি সব নাম তাদের।

দূরে দূরে কোলিয়ারির চিমনি দেখা যায়—আশমানে তারে ঝোলানো টবগুলো হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে দামোদর থেকে বালি নিয়ে চলেছে দূরের কোন কোলিয়ারীর দিকে।

এদিকের আকাশে বার্ণপুর কারখানার সারি সারি চিমনি থেকে কালো—তামাটে-পিঙ্গল রং এর ধোঁয়া উঠছে নীল আকাশে। রাতের অন্ধকারে ওই আকাশ কোল স্ল্যাগ ব্যাঙ্কের ঝলসানি আলোয় রঙ্গীন হয়ে ওঠে। ভেসে যাওয়া সাদা টুকরো মেঘগুলো ছিটিয়ে থাকে ওই রঙ্গীন আকাশের বুকে।

এ যেন অন্য এক রাজ্য। তাদের গ্রামের মত সবুজ-শ্যামল নয়। রুক্ষ কর্কশ—বন্ধুর এর মৃত্তিকা। এরই মাঝে রমা এসে কেমন যেন হারিয়ে যায়।

নীরোদ বের হয়ে যায় সকালেই। কোন কোলিয়ারীতে কাজ করে। কি কাজ করে তা জানে না রমা। তবে সব সময়ই ব্যস্ত সে। কখন ফেরে তার ঠিক নাই।

দু চারজন লোক থাকে তার সঙ্গে। কোনদিন বা জিপে আসে।

খাকি প্যান্ট পরা চেহারা; বলিষ্ঠ দেহটা নিয়ে লাফ দিয়ে জিপ থেকে নেমে বাড়ি ঢুকে রমাকে ফরমাইস করে,

—খেতে দাও, জলদি!

ওর চোখমুখে কাঠিন্য, রোদের তাতে লাল হয়ে উঠেছে দুচোখ।

রমা এগিয়ে আসে।

—এলে তেতে পুড়ে, একটু জিরিয়ে খাওয়া দাওয়া করো।

—সাট আপ! গুলি মারো খাওয়ায়!

গর্জন করে ওঠে নীরোদ। রমা ওর মুখ থেকে তীব্র মদের এক ঝলক গন্ধ পেয়ে চমকে ওঠে। ভয়ও পেয়েছে।

মদ খেয়ে ওর দুচোখ লাল হয়ে উঠেছে।

ওই রোদের মধ্যেই নীরোদ লাফ দিয়ে গিয়ে আবার গাড়িতে উঠল।

রমা ওকে ডাকবারও অবকাশ পায় না।

ওর ডাক শোনবার মত মনের অবস্থাও নীরোদের নেই।

ক'দিন ফেরেনি নীরোদ।

মাঝে মাঝে এমনি করে ফেরার হয়। কোথায় থাকে জানে না রমা, কি কাজে যায় শুধোলে জবাব দেয়।

—অপিসের কাযে যেতে হয়।

রমার ভয় করে ওর মুখ চোখের দিকে চেয়ে। এমনি করে ধীরে ধীরে ওই মানুষটকে চিনেছে। ওর কাজকর্মও তেমন কিছু নেই।

মাঝে মাঝে রাতের অন্ধকারে বের হয়ে যায় কাদের ডাকে।

একা একা ভয় করে রমার। দুর্যোগের রাত। দূর পাহাড় বনের দিক থেকে ভেসে আসে উন্মত্ত বাতাসের গর্জন। বর্ষার ফুলে-ওঠা মত্ত দামোদরের জলস্রোতের গর্জন মিলেছে তাতে।

বাইরে হর্ণের শব্দ শোনা যায়। নীরোদ চুপ করে বসেছিল।

এতদিন মদটা বাইরে বাইরে খেয়ে আসতো, সেটা এখন বাড়িতেও আমদানী করে। বাধা দিয়েছিল রমা।

—এসব কেন খাও?

হাসে নীরোদ—কেন? হঠাৎ সতী হয়ে উঠলে নাকি যে মাতালকে ঘেন্না করছো?

রমা জবাব দিল না।

তার নিজের স্বামীর সম্বন্ধে অনেক ধারণাই ছিল মনে মনে। তার স্বামী আরও পাঁচজনের মতো একটা ভালো কাজকর্ম করবে, শান্তিতে বাঁচবে সে। তার ঘরে আসবে একটি ছোট্ট শিশু। তার কলরবে রমার শূন্য জীবন শূন্য ঘর ভরে উঠবে।

কিন্তু সব দিক থেকেই ব্যর্থ হয়ে গেছে। নীরোদ হাসছে। মত্তপ সেই হাসির তীক্ষ্ণ শব্দটা ওর সব স্বপ্ন কামনাকে যেন নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জর করে তোলে।

রমা অনেক সহ্য করেছে। এইবার এই সব কিছু ব্যবহার তার সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। গর্জে ওঠে রমা।

—হাসছো যে? লজ্জা করে না?

—লজ্জা! আমি কি শ্লা মাগী যে লজ্জা করবে? এঁ্যা! মরদ! তামাম আসানসোল ফিল্ডে নীরু শর্মাকে চেনে না এমন ব্যাটা এখনও মায়ের গব্বে রয়েছে; বুঝলে?

রমার ইচ্ছা করে ওই লোকটার সামনে থেকে সরে যায়।

ওর মনের ভেতর কি একটা দুর্দাম পশু লুকিয়ে রয়েছে। তাকে সে তার সবকিছু দিয়েও ভোলাতে পারে না। বার বার হেরে গেছে তবু চেষ্টা করেছে ভালবাসা দিয়ে ওর মন ভোলাতে। ততই ঠকেছে সে। বোধ হয় মন বলে কোন বস্তু তার নেই। থাকলে সাড়া পেতো সে।

বৃষ্টির ঝাপটায় জানালার পাল্লা গুলো কাঁপছে। গুরু গুরু মেঘ

ডাকে। বাইরে হর্ণের শব্দ শোনা যায়। উঠে পড়েছে নীরোদ।

রমা বাধা দেয়।

—যা করছো ঘরেই করো। এই দুর্যোগের রাতে নাই বা বেরুলে?

ওর হাতখানা সরিয়ে দিল নীরোদ।

দুচোখ জ্বলছে কি শ্বাপদ লালসায়। বলে ওঠে নীরোদ,

—টাকা পয়সা—শাড়ি গহনা সবই দিয়েছি। এই নিয়েই চুপ থাকবে, কি করি না করি তার খবরদারি করলে—

ঠোঁট দুটো শক্ত করে হাত দুটো একত্র করে ইসারায় যে কথাটা প্রকাশ করে। রমা সেটা শোনবার জন্য তৈরী ছিল না। চমকে ওঠে সে ওই মানুষটার নির্মম নিষ্ঠুরতায়।

ঝড়ের গর্জনে আকাশ বাতাশ কাঁপছে। নীরোদ বের হয়ে গেল সেই রাতেই। বিজলীর ঝলক ওঠে, অন্ধকারে পাহাড় বন সীমান্তকে ওই বিজলীর আলোটা কি বীভৎস রূপে প্রকাশিত করে তোলে চকিতের জন্য। মানুষের অতলেশ্ব সেই দুর্বার পৈশাচিক স্বরূপটাকেও যেন ক্ষণিকের আলোয় পরম সত্য করে দেখছে রমা।

হঠাৎ পরদিন পুলিশ আসতেই চমকে ওঠে রমা। অনেক দিন অনেক কথাই শুনেছে সে। মাঝে মাঝে কারখানার মালগাড়ি বোঝাই মালপত্র যায়। সে সব কারা গাড়ি থামিয়ে লুট করে। হাজার টাকার মাল, কোলিয়ারী থেকে রাতের অন্ধকারে জোর করে ট্রাকে তুলে আনে পাম্প, পাইপ নানা যন্ত্রপাতি।

জি-টি রোডের উপরই ট্রাক গাড়ি দাঁড় করিয়ে যাত্রিদের কাছ থেকে সব কিছু লুট করে নিয়ে যায়। সারা এলাকায় সেই অন্ধকারের প্রাণীদের রাজত্ব।

সারা এলাকায় তারা ত্রাসের রাজ্য গড়ে তুলেছে। অন্ধকারে ওই রেললাইন থেকে কিসের শব্দ ভেসে আসে।

ছু-একটা বোমা ফাটার শব্দ ভেসে আসে এই দুর্যোগের রাতে।

একা ঘরে শিউরে ওঠে রমা অজানা কি ভয়ে।

অন্ধকারে একপাল ডাকাত যেন হানা দিয়েছে ওই রেললাইনের উপর। বিদ্যুতের চকিত আলোয় দেখা যায় কালো রেখার মত অসহায় মাল গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। প্রায়ই দেখেছে এসব।

—পুলিশ এসে নীরোদের খোঁজ করে।

রমা অবাক হয়—তিনি বাড়িতে নেই।

কে কঠিন স্বরে বলে।

—তিনি যে থাকবেন না তা জানতাম। তুমি কে?

রমা কোনদিন কল্পনা করেনি, পুলিশের সামনে তাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে এত কৌতুহলি লোকের সামনে। নিজের পরিচয়টাই আজ তাকে লজ্জা দেয়।

— চুপ করে আছো যে?

—তার স্ত্রী!

হঠাৎ হাসির শব্দ ওঠে। ভদ্রলোক হাসছে, কঠিণ ব্যঙ্গের মতই সেই হাসিটা রমার সর্বাঙ্গে বেঁধে।

—স্ত্রী! নীরোদ সব কিছুই না বলে জোর করে নেয়। তোমাকেও কি তেমনি করে এনেছে?

রমা লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যায়। জবাব দেবার সাধ্য তার নেই। হঠাৎ আবিষ্কার করে কাঁদছে সে। ওদের সামনেও নিজেকে সামলাতে পারেনি।

দুচোখে জল নামে।

পুলিশের সেই ভদ্রলোকেরও চোখ এড়ায় না সেটা। ওই মেয়েটার জন্য মায়া হয় তার। ও বোধ হয় নীরোদের পরিচয় ঠিক জানে না। ঠকিয়েছে তাকেও নীরোদ।

তাই বলে।

—তুমি ওকে চেনো না বোধ হয়? ডাকাতি, খুন, জখমই ওর পেশা। তবে এবার তাকে ছাড়বো না।

তারা চলে গেলো। রমা ভিতরে এসে কি দুর্বার কান্নায় লুটিয়ে পড়ে। এমনি করে ঘরে বাইরে অপমানিত হতে হবে জানতো না সে।

রাতের অন্ধকারে বাড়িটা থমথম করে।

ক'দিন নীরোদের কোন খবর নেই। একজন লোক এসেছিল সিটকে পাকানো চেহারা। মুখ চেনে তার রমা। দু-একদিন দেখেছে লোকটাকে তার সঙ্গে।

সেইই কিছু টাকা দিয়ে যায়।

—এটা রাখতে বলেছে নীরুদা।

রমা আজ অসহায় একা, তাই বোধ হয় নীরোদের খবর নেয়।

—সে কেমন আছে?

হাসে লোকটা—ভালোই আছে। নীরুদার গায়ে হাত দেনেবালা কেউ নেই। বুঝলা? শ্লা চোরের দুনিয়া। সাধু এখানে কোন শ্লা! ...সবাই সাধু আর সব্বাই সতী! হ্যাঁ।

চেপে বসল সে।

—একটু চা হবে?

রমা ওদের পাত্তা দিতে চায় না। ওদের সে চিনেছে এইবার। কিন্তু চারিদিক তার শূন্য। এঘর তার কাছে ব্যর্থ হয়ে গেছে। তবু শেষবারের মত চেষ্টা করবে সে।

জানে এখানে কোন ভালবাসা নেই—বাঁধন নেই। এঘর একবার ভেঙ্গে গেলে আর কোনদিনই জোড়া লাগবে না। তাই ভাঙ্গার আগে একবার শেষ চেষ্টা করেই দেখবে সে।

কেষ্টা চা খাচ্ছে আর পা নাচাচ্ছে। একা বাড়িতে ওই সিটকে চুলওয়ালা লোকটাকে বসিয়ে রাখতে ভয় লাগে রমার। দেখেছে

কাল থেকে এপাড়ায় তার উপর সকলেরই নজর। দুএকজন বৌ ঝি আসতো। ওই পুলিশ আসার পর থেকে তারাও আসা বন্ধ করেছে।

আজই কলে জল আনতে গিয়ে শুনেছে রমা ওই আলোচনা।

—বৌ! বিয়ে করা বৌ? ছাই! পুলিশের কাছে সব খবর থাকে। ওরাই বলে গেল দেখলি না—বৌ না ইয়ে।

রমা কোন জবাব দিতে পারেনি।

লজ্জায় অপমানে জল নেওয়া হয়নি সরে চলে এসেছিল সে। রমার সব মান সম্মানটুকু পর্যন্ত ওরা কেড়ে নিয়েছে। ওই নীরোদ আর কেষ্টোর দল বল।

কেষ্টো বলে চলেছে।

—ওস্তাদ কাল খুব কামিয়েছে বুঝলা? এক ওয়াগন মাল তামাম ফাঁক। এতক্ষণ সে মালও কলকাতার গুদামে পৌঁছে গেছে।

বুঝলা—কাজ কারবারে কি শ্লা শান্তি আছে? নিজেরা জান-কবুল করে মাল টানবো, সবটুকু খাবে রাঘব বোয়ালের দল। ওই বিনয়বাবু—বলহরির দলই শেষ করে দেবে বুঝলো। আমরা তো স্রেফ আঁঠি চুষছি।

রমা ওর কথাগুলো শুনে অবাক হয়।

ওদের সে চেনে। তাদের অদৃশ্য হাতটা এতদূর এগিয়েছে তা ভাবতেই পারেনি।

বিনয়বাবুর বিরাট গুদাম, নানা ব্যবসা। মস্ত ঠিকাদার। অন্য-দিকে দেশসেবার ব্রতে ডুবে আছে। দেশের লোকদের মঙ্গলচিন্তায় তার ঘুম নেই।

অন্ধকারের অতলে কি বিচিত্র জীবনের কথা শুনছে সে।

তার নিজের স্বামী—ঘর—সব আশা কল্পনার রঙ্গীন স্বপ্নকেও বিনয়বাবুদের ওই লোভ আর লালসা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে।

অতীতের সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। বিনয়বাবুর বাহন বলহরি সামন্তকে খুন করতে গিয়েছিল প্রাণগোপাল।

বিনয়বাবুর সেই লোভী হাতটাকে মুচড়ে ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি।

ওদের ক্ষমতার কাছে হার মেনেছিল ওই প্রাণগোপাল।

রমার জীবনেও ওদের সেই লোভী হাতটা এতদূর এসে পড়েছে। সব ছিনিয়ে নিয়েছে। আজ নীরোদের উপর রাগ তার তত নয়। সামান্য কিছু পাবার লোভেই ও সব ভুলে গেছে। বোকা।

কেষ্টো তখনও চেপে বসে আছে।

রমার মনে সেই উৎকণ্ঠা—কোথায় আছে সে?

—তার আবার থাকার জায়গার অভাব, না কোন কিছুর অভাব? মাল-মেয়েছেলে-মাংস—

রমা কঠিণ কণ্ঠে বলে—

—তুমি এইবার যাও। যাও বলছি।

উঠে পড়ল কেষ্টো। রমার এই মূর্তির সঙ্গে তার পরিচয় নেই।

রমা মনে মনে এইবার ক্ষেপে উঠেছে। নরকের জীবদের সঙ্গে বাস করছে এইবার।

এমনি করে থাকা যায় কি না তাই ভাবছে সে।

মনে মনে অনেক দিন থেকেই এই প্রশ্নটা বড় হয়ে উঠেছিল। দুদিন ফেরেনি নীরোদ। রমা দেখেছে পাড়ারও কেউ তার খবর নিতে আসেনি। পুলিশের ওই কথাগুলো এখানে বেশ আলোড়ন তুলেছে। এতদিন সকলের সঙ্গে মিশেছে, আজ সেখানে কেউ যেন তাকে চেনে না। দূর থেকে কৌতূহল আর আতঙ্ক-ভরা চাহনিতে তাকে দেখে মাত্র কেউ এড়িয়ে যায় রমাকে।

রাত হয়ে গেছে।

রমা একলা ঘরে শুয়ে আছে। ঘুম আসে না। হঠাৎ কার পায়ের শব্দে উঠে বসল। নিশুতি রাত। এ সময় কেউ আসবে তা ভাবেনি সে। ভয়ই পেয়েছে।

নীরোদের গলা শোনা যায়। ডাকছে তাকে।

রমা দরজা খুলবে কি না ভাবছে। এতদিনে তার সব কিছু হারিয়ে গেছে। ওই লোকটা তাকে আজ পথের মানুষের পর্যায়ে টেনে এনে নামিয়েছে। সমাজে মুখ দেখাবার উপায় তার নেই।

—দরজা খোলো।

রমা আজ কঠিন হয়ে উঠেছে। ওই মানুষটার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক সে রাখবে না। কি দিয়েছে সে তাকে? দিয়েছে শুধু অপমান, লাঞ্ছনা আর কলঙ্ক।

—এ্যাই!

গর্জন করছে নীরোদ। মদ খেয়েই এসেছে। দরজায় ধাক্কা মারছে সে। বাইরে থেকে গলা তুলে গর্জন করে নীরোদ।

—ঘরে কোন শ্লা ভালোবাসার লোক ঢুকিয়েছিস নাকি?

কথা কানে যাচ্ছে না? এ্যাই মাগী।

দমাদম্ লাথি মারছে নীরোদ দরজায়। আশপাশের বাড়ির জানালা খুলে গেছে। রমা বেশ বুঝতে পেরেছে ওরা কান পেতে শুনছে ওই বিশ্রী কথাগুলো।

রমা এসে দরজা খুলে দাঁড়ালো।

আজ সে সব কিছুর জন্যই তৈরী। চোখে মুখে ঘৃণার জ্বালা। ওই মদ্যপ মানুষটাকে আজ সে সহ্য করতে পারে না। এতদিন ধরে তিলে তিলে সে তার সব কিছুকে লুট করে নিয়ে আজ দেউলিয়া করে দিয়েছে।

দরজা খোলা মাত্র নীরোদ ঝড়ের বেগে ভিতরে ঢুকে পড়ল। তার হাতে একটা ছুরি মত। তার চোখে মুখে কাঠিন্য; চোয়ালটা নীচের দিকে ঝুলে পড়েছে।

ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক খুঁজছে। কাউকে দেখতে পায় না। তবু তার মনের সন্দেহ যায়নি। হঠাৎ এক জায়গায় তার পৌরুষে ঘা লেগেছে। নীরোদ বলে চলেছে।

— বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা? ইয়াকি!

রমা ওকে দেখছে। হাতের ছুরির ফলায় পড়েছে ঝকঝকে আলোর আভা।

রমার সারা মনে এমনি কোন জ্বালা। আর্তনাদ করে উঠে সে।

—দেখলে তো? এইবার ওই ছুরিটাই বসিয়ে দাও বুকে। এই যন্ত্রনার শেষ হোক। এ আর আমি সইতে পারছি না।

নীরোদের এসব ভালো লাগে না।

ভেবেছিল রমাও সমান তালে ঝগড়া করবে। তা নয় এমনি করে চোখের জল ফেলবে সে-তা ভাবেনি নীরোদ।

ক'দিন খুব ধকল গেছে। সেই দুর্যোগের রাতে বেশ যুৎসই ঘা মেরেছিল সে। অন্ধকারে কয়েক ট্রাক মালই পাচার করেছিল। দামী মালপত্রই মিলেছিল।

কিন্তু টাকার দিক থেকে তেমন কিছুই মেলেনি তাদের। কিন্তু পরিশ্রমের সব মালপত্রই ওই বলহরি দালালের হাতে চলে যায়। নীরোদ জানে তার উপরও অনেক বড় জাঁদরেল লোক আছে।

সহরে বিরাট বাড়ি, কলকাতায় যোগাযোগও আছে তার।

দুর্গাপুর বর্দ্ধমান সব পথেই তাদের আস্তানা। লাভের চোদ্দ-আনাই তাদের পেটে যায়।

আর তারা! যা হয় সামান্য কিছু পেয়েই খুশী থাকতে বাধ্য হয়। পিছনে পুলিশ লেগে থাকে। তাদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ওই রুই কাতলাদের দরজায় ধন্না দিতে হয়।

কথাটা ভাবতে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। মদ! ওই বস্তুটাই যোগায় বলহরি সামন্ত। সস্তা দরে দেয় সে। ওই দিয়েই তারা সব ভাবনা চিন্তাকে ডুবিয়ে দেয় বিস্মৃতির অতলে। নিজেদের

জ্বালাতেই ডুবে আছে নীরোদ। আবার রোজকারের কথাও ভাবতে হয়।

রমার মনের সেই হাহাকার ব্যর্থতার দিকে চাইবার সময় তার নেই। ওসবের কথা ভাববার মত মনের অবস্থা ও তার নেই। নেশার ঘোরে আর ওই রাতের অন্ধকারে লুঠপাটের অভিযান চালিয়ে ওরা দানব হয়ে উঠেছে।

নিজেদের বিক্রী করেছে কোন শয়তানের কাছে। তবু পেট ভরেনি। দিনরাত বিপদের মাঝে বাস করে। যুদ্ধ করে নিজেদের মধ্যে। যুদ্ধ করে টিকে আছে মাত্র। ওই জীবনের কোন দামও নেই তাদের কাছে। প্রেম, ভালবাসা, ঘর বাঁধার কোন মর্যাদাও দেয় না।

ক্ষণিক প্রয়োজনের জন্যই নারী মাংস তাদের দরকার। স্ত্রী—পারিবারিক সম্পর্ক সেই—চেতনাবোধের দাম এক বোতল মদ আর কিছু টাকা?

রমার কথায় নীরোদ জ্বলে ওঠে।

—ন্যাকামি দেখ না? সতী! আর বাঁচতে চাই না? ঢের দেখা আছে শ্লা!

রমা ওর দিকে চেয়ে থাকে।

—তুমি কি মানুষ নও?

হাসে নীরোদ। পকেট থেকে মদের ছোট বোতলটা বের করে বাকীটুকু চক্ চক্ করে গিলে ঠোঁটে জিব বুলোতে বুলোতে বলে।

—মানুষ! বলি মানুষ কোন শ্লা আছে? আমি কামাই করি আমার চেয়ে বড় যে সে সামাল দেয়, তার চেয়ে যে বড় সে চোরাই মাল বিক্রী করে লাল হয়ে যায়। ব্যস, দাদা বনে গেল। গাড়ি বাড়ি মান খাতির সবই করল। বাকি শ্লা নীরে গুণ্ডাই রয়ে গেলাম।

মানুষ কোন শ্লা আছে? কেউ গুণ্ডা কেউ ডাকাত কেউ ন্যাতা কেউ বিজিনেস ম্যাগনেট এইসব, মানুষ কেউ নাই।

রমা অনেক কিছুই বলতে চেয়েছিল, কিন্তু পারে না।

মদের নেশায় লোকটা আবার মাতাল হয়ে ওঠে।

রমা বলে,

—পুলিশ এসেছিল তোমার খোঁজে?

হাসছে নীরোদ। ওসব কিছুকে যেন আর পরোয়া করে না সে।

রমা ভীত কণ্ঠে বলে,

—যদি আবার আসে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।

নীরোদ খপ করে ওর চুলের মুঠিটা ধরে ঝাঁকানি দিতে থাকে।

রমা অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে; ওরা যেন বারুদের স্তূপ হয়ে আছে। একটা দেশলাই কাঠির ঘর্ষনে অগ্ন্যুৎপাত ঘাটতে পারে যে কোন মুহূর্তেই। নীরোদ গর্জে চলেছে।

—আমাকে না তাড়ালে বুঝি যুৎ হচ্ছে না? তাই এইসব ছ্যাঁয়লা করা হচ্ছে?

রমা হাঁপাচ্ছে। ওর দুচোখে দেখেছে হিংসার ধকধকে আগুন। তার কাছে কোন স্বপক্ষ সমর্থনই করবে না রমা। করেও কোন ফল নেই। যন্ত্রনায় আর অপমানে চোখ বয়ে জল নামে। এমনি অপমান আর আঘাত সইতে হবে তা স্বপ্নেও ভাবেনি কোনদিন।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রমা।

নীরোদ বলে—এই চেপে বসলাম ঠায়। দেখি কোন শ্লার বুকের পাটা আছে। তোকে আর সেটাকেই আজ গায়েব করে দোব। নষ্টামি!...সতীপনা!

রমা ওর দিকে চাইতে ঘৃণা বোধ করে।

এই তার স্বামী—এই তার ঘর।

দু চোখ বয়ে জল নামে। সন্ধ্যার অন্ধকারে গ্রামের আকাশ ছেয়ে গেছে। তারাগুলো জ্বলে উঠেছে মেঘমুক্ত নির্ধূম নীল আকাশের আঙ্গিনায়। শীতের শেষ। প্রাণগোপাল রমার ফিরে

আসার খবর পেয়ে এসেছিল দেখা করতে। তখনও কুয়াশার ফিকে চাদর জড়ানো রয়েছে, গাছ গাছালির মাথায় বাতাসের ঠাণ্ডা একটু শির শিরানী আমেজ।

প্রাণগোপাল রমার দিকে চেয়ে থাকে।

ওই ঘটনাগুলো যেন তার চোখের সামনে ঘটতে দেখেছে সে। আগেকার সেই শৈশবের রঙ্গীন মনে ঝড় তুলেছিল ওই মেয়েটি। একদিন ভালো লেগেছিল তাকে। ভেবেছিল, বিয়ে থা হয়ে গেছে—স্বামীও চাকরী বাকরী করছে।

আরও পাঁচজনের মতই সুখে আছে সে।

কিন্তু রমার জীবনের এই দুর্ভাগ্যের কাহিনী শুনে চমকে উঠেছে প্রাণগোপাল। তার আশপাশে চারিদিকে দেখেছে এই অপচয় আর অবক্ষয়।

অতীতের সেই সমাজের বাঁধন—ভিত্তিমূলে ওরা কঠিন নির্মম আঘাত হেনেছে। মিথ্যা করে দিয়েছে সব নীতি আর সত্যকে।

তাই চারিদিকে সর্বনাশা এই ভাঙ্গন আর ধ্বংস। তারই মাঝে ওরাই বেঁচে আছে। ওদের টাকার পাহাড় ক্রমশঃ উঁচু হয়ে উঠছে। তারই সামান্য কিছুর বিনিময়ে ওরা কিনেছে এদের জীবনের সব সঞ্চয়কে।

রমা বলে,

—এরপর আর থাকতে পারলাম না। অনেক সয়েছি—অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না। ওরা জানোয়ার হয়ে উঠেছে। তাই সব হারিয়ে ফিরে এলাম।

প্রাণগোপাল সাড়া দিল না।

রমা কাঁদছে। তার সেই সুন্দর মিষ্টি চেহারায় এসেছে যন্ত্রনার বিকৃত ছাপ। মনের অতলের আগুনে জ্বলে পুড়ে সে খাক্ হয়ে গেছে।

রমা বলে,

—এই যন্ত্রনার থেকে মুক্তির পথ আর পাই নি।

প্রাণগোপালও পায়নি।

সে শুধু অসহায় দর্শকের মত দেখেছে, চোখের সামনে এই ধ্বংসকে ঠেকাতে সে পারেনি।

রমা কাঁদছে!

—ঠাকুরের কাছে মাথা ঠুকেছি—রাধামাধবের কাছে মানসিক করেছি!

প্রাণগোপাল হাসছে। এত দুঃখেও তার হাসি পায়। তার কাছে এটা একটা নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ বলেই মনে হয়। বলে সে,

—মানুষের বিশ্বাসেই পাষাণ মূর্তি সজীব প্রাণময় হয়ে ওঠে। যেখানে সেই বিশ্বাসই নেই, মানুষই তার সব কিছু হারিয়ে দেউলিয়া হয়ে গেছে, সেখানে ঠাকুরও নেই। ও শুধু পাথর মাত্র।

তার পায়ে মাথা ঠুকলে রক্তই বের হয়। কাজ কিছুই হয় না। তাই ঠকেই চলেছিস বারবার। কি মনে হয় জানিস?

রমা ওর দিকে চাইল। প্রাণগোপালের চোখে মুখে কি কাঠিন্য ফুটে উঠেছে।

প্রাণগোপাল বলে,

—ওই ঠাকুরকেই টুকরো করে ভেঙ্গে দিই। তবে হয়তো মানুষ চুপ করে ওদের কাছে নালিশ করেই সব দায় থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করবে না। নিজে রুখে দাঁড়াবে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে। ঠাকুর!...দেবতা? ভগবান!...সব মিথ্যা হয়ে গেছে।

...রমা ওটা ভাবতেই পারে না।

সে আশা করে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। আবার সে ফিরে পাবে সব কিছু! স্বামী সংসার সব।

প্রাণগোপাল ওর কথায় হাসে।

—এখনও লোভ আছে তোর মনে।

রমা মাথা নিচু করে বলে,

—এ ছাড়া আর পথ কি বলো।

—তাহলে ভালোবাসিস নীরোদকে ?

রমার মুখের উপর এ প্রশ্ন কেউ কোনদিন করেনি। নিজের মনের অন্তলে এই প্রশ্নের জবাব সে অন্বেষণ করেনি কোনদিন। ভালোবাসার অর্থ কি তাও জানতে চায় নি।

তবু মনে হয় কোথায় যেন নীরোদের—সেই ভুলগুলোকে সে অনেক বেদনা আর দুঃখের মধ্য দিয়েই দেখেছে। একদিন সেই ভুল তার ভাঙ্গবেই।

রমা জবাব দিল না।

প্রাণগোপাল বের হয়ে আসছে।

রমার মা তখনও ঘুমোয় নি। বুড়ি হ্যারিকেন জ্বেলে একটা ন্যাকড়ার উপর বড়ি দিয়ে চলেছে। এককালে খুব সুন্দর বড়ি দিতো ওর মা, মশলাদার বড়ি। মূলো—না হয় চাল কুমড়োর শাঁস দিয়ে বড়ি তৈরী করতো।

আজ বুড়ির কাছে ওইটা উপজীবিকাতেই দাঁড়িয়েছে।

বড়ি দেয়, পাঁপড় তৈরী করে, কাঁচা পাঁপড়। এ গ্রামের অনেক মেয়েই ওই সব কাজ করে।

দুর্গাপুর, আসানসোল অঞ্চলে, পাইকেররা এসব জিনিষ এখান থেকে নিয়ে যায়। সেদিনের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নেতা বিষ্টুদার মা আজ সব হারিয়ে ওই উঁচ্ছবৃত্তি করে বাঁচবার চেষ্টা করছে।

ধীরে ধীরে এরা নামতে নামতে কোথায় গিয়ে ঠেকেছে কে জানে ? আগে কিছু ধানজমি ছিল, আর বাৎসরিক কিছু সাজা খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা ছিল। মধ্যস্বত্ব চলে যাবার পর থেকেই সেই ধান সাজা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন চাষীই সোজাসুজি সরকারকে খাজনা দেয়। ভাগচাষী দয়া করে যা দেয় তাই নিয়ে খুশী থাকতে

হয়। এদের তাঁবে তারা নেই। ফলে মাঝখানের এই অসহায় একটি শ্রেণী আজ ধুঁকতে ধুঁকতে ক্ষয় হয়ে চলেছে।

—পানু।

বুড়ির ডাকে দাঁড়াল প্রাণগোপাল। রমার মা বলে।

—মেয়েকে বুঝিয়ে বল বাবা, তুই বল্লে শুনবে। দেখছিস তো আমার হাল নিজেরই ভাত জোটে না, দুঃখ ধান্দা করে খাই। তার উপর ও এসে বসল এখানে। জামাই নাহয় একটু মাথাঠাড়ো লোক। দুটো পয়সা রোজগার করে, একটু নেশাটেশা করে। তাই বলে চলে আসবে?

দিন চালাই কি করে বাছা? সবই যে আমার হারিয়ে গেল। বিষ্টুও নেই। যোগ্য ছেলে হারিয়ে গেল আজ তবুও বেঁচে আছি। তার উপর ওই মেয়ের ভার নিই কি করে?

প্রাণগোপাল চুপকরে থাকে।

রমার কাছে যা শুনেছে তাতে বেশ বুঝেছে রমার মত মেয়েকে ওখানে থাকতে গেলে সব নীতি—সব বিবেককে বিসর্জন দিয়ে স্বৈরিণী হয়ে উঠতে হবে।

ওর মা যদি এটা বুঝবার চেষ্টা করতো তাহলে কোনদিনই একথা বলতো না। নিজের মেয়েকে এই চরম অপমানের হাত থেকে বাঁচাতোই। কিন্তু শুধুমাত্র নিজে বেঁচে থাকার জন্যই ওকে তার অন্নের ভাগ দিতে চায় না। তার জন্য মেয়ের যে কোন পরিণতি হোক না কেন সে কথা চিন্তাও করেনা। বাঁচার কঠিন সংগ্রামে সব বিবেক নীতি এমনি করেই হার মানে।

বুড়ি বলে—সোমত্ত মেয়ে এমনি এখানে পড়ে থাকবে? জামাই বা কি ভাববে?

প্রাণগোপাল বলে,

—তাই বুঝিয়ে বলবো রমাকে।

বিনয়বাবু দেখতে দেখতে সৌভাগ্যের শিখরে উঠেছেন। অতি

সামান্য অবস্থা থেকেই সুরু করেছিলেন। সেদিন ছিলেন গ্রামের পঞ্চায়েত প্রেসিডেন্ট। জমিজমাও কিছু ছিল। সেদিন ইংরেজের খোসামুদি করে—স্বদেশী আন্দোলনের সব কিছুকে পণ্ড করার জন্য অনেক কিছুই পেয়েছিল। যুদ্ধের সময় সেইজন্যই অনেক কিছু সুযোগ সুবিধাও এসেছিল।

হঠাৎ চাকা ঘুরে যাবার পর থেকেই তিনিও বদলে গেলেন। রাতারাতি পিছনের সব পরিচয় মুছে দিতেও দেরী হয়নি। কাছারি বাড়ির দেওয়াল থেকে নেমে গেল রাজারাণীর ছবি। কার্পেটের উপর আঁকাবাঁকা হাতের লেখা সেই রাজার দীর্ঘজীবনের জন্য প্রার্থনাবাণীও।

নেতাদের ছবি টাঙানো হল দেওয়ালে। পতাকা উঠল—নতুন পতাকা! বেশবাসও বদলে গেল।

শুধু রং বদলালো মাত্র।

ভেতরের সেই স্বার্থপর মানুষটা আরও মেতে উঠলো। তুর্গাপুর ব্যারেজের সাবকণ্ট্রাক্টি, ওদিক ওদিকের ঠিকাদারী কাজও পেলেন। সেই সঙ্গে কারবারও বাড়তে লাগলো। ট্রাক কেনা হয়ে গেল আট দশখানা। টাটা মার্সিডিজ্ গাড়িগুলো মালপত্র বয়, তাছাড়া রাতের অন্ধকারে সেই জগতের মালও চালান দিতে লাগলো বিভিন্ন গুদামে।

বিনয়বাবুও জানতেন এটা।

জমিদারী প্রথা উঠে যাবে। তিনিও তাই জনসাধারণের সামনে বেশ উদার কণ্ঠে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। তুশো বছরের শোষণ নীতি বদলানোর দরকার, দেশের সাধারণ চাষীর পক্ষে এইটাই মঙ্গলজনক।

হাততালি, মালা কোনকিছুরই অভাব হল না।

গঙ্গাধরও ভোল বদলে সাইকেল ছেড়ে বিনয়বাবুর ডিস্পোজালে কেনা জিপে চড়ে সব ব্যবস্থা করতে কসুর করেনি। প্যাম্পলেট

হ্যাণ্ডবিল, পোষ্টারে ছেয়ে গেল পথের ধার, আশেপাশের গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ, আটচালা, ইস্কুল বাড়ি।

জনদরদী দেশপ্রেমিক হয়ে উঠলেন বিনয়বাবু। ভোটেও জিতলেন।

জমিদারী চলে গেল।

অবশ্য তার আগেই বলহরি সামন্ত আর গঙ্গাধর দুজনে সব জমিই বেনামী করে রেখেছে বিনয়বাবুর তরফ থেকে। আর ডাঙ্গা বন টিলা তখন পাথরের কোয়ারী আর কারখানা দেখিয়ে খাস দখলে নিয়ে এসেছেন। খাস সেখানে নামই বদলালো মাত্র, বিনয়বাবুর গায়ে হাত পড়েনি।

বড় রাস্তা থেকে গ্রামে আসার পথটা তার চেষ্টাতেই হয়ে গেছে। এখন ট্রাক, জিপ, বাস সবই যায় আসে। তাছাড়া জুটেছে সাইকেল রিক্সা। দুর্গাপুর সদরে যাবার যাত্রী এখন অনেক। ভোর থেকে যাতায়াত শুরু হয়।

বিনয়বাবুর গাড়িখানাও মাঝে মাঝে আসে। শহরে বাড়ি ঘর করেছেন, তবু তিনি পল্লীপ্রাণ। তাই বোধ হয় এখানের মায়া কাটাতে পারেন নি।

বলহরি সামন্ত তো গ্রামেই বিড়ির কারখানা বসিয়েছে। বিরাট কারখানা। অনেক ছেলেপুলেই কাজ করে। বিড়ি ছাড়াও আছে অন্যব্যবসা। রাতের অন্ধকারে তার খদ্দেররাও ভিড় করে। তাছাড়া নাকি গাঁজা, কোকেনও আসে যায়।

তবু বিনয়বাবুকে ছাড়েনি বলহরি সামন্ত। ওই বটবৃক্ষের নীচে বসেই সে একালের জ্ঞানবৃদ্ধ হবার সাধনা করে চলেছে।

বিনয়বাবু কথাটা ভেবেছেন অনেকবার। জীবনে অনেক পেয়েছেন। টাকা, প্রতিষ্ঠা সবকিছু। জীবনের সব পথ তার সামনে অতি সহজে খুলে গেছে। অতলের সেই রোজগার তার কত সেটার ইয়ত্তা নেই।

শহরের বাড়িতে সেসব টাকা রাখা নিরাপদ নয়। তাই গ্রামেই আনতে হয় তার অনেকটা।

এইবার ক্লান্তি এসেছে। মাঝে মাঝে ওই লোকসেবার ভান করেন। সভায় দাঁড়িয়ে পল্লীর সাধারণ মানুষের দুঃখ বেদনার কথা স্মরণ করে নানা কথা বলেন।

এতকাল বাইরের সঙ্গে ভিতরের একটা বৃহৎ পার্থক্য ছিল। সেটা ছিল অহমিকা প্রতিষ্ঠার কাঠিন্য।

ক্রমশঃ সেটা কমে এসেছে। তাছাড়া যে মানুষগুলোকে শোষণ করে ঠকিয়ে এই সঞ্চয়ের পাহাড় গড়ে তুলেছিলেন, তাদের পরিশ্রমে হঠাৎ এই দিন বদলের বিরাট আঘাতে তারাও বদলে গেছে।

এটা লক্ষ্য করেছেন বিনয়বাবু।

ওরা ঠকে ঠকে মরীয়া হয়ে উঠছে।

কদিন আগের সেই ঘটনাটা মনে পড়ে। রাতের অন্ধকারে অনেক মালপত্রই চালান যায়। সে মাল কোথা থেকে আসে তাও জানে না, কারা আনে তাদেরও চেনে না।

এতদিন যা দিয়েছিলেন ওরা তাই নিতো, ক্রমশঃ প্রতিবাদ করে নীরোদের দলবল।

—খরচা বেড়ে গেছে। এক কেজি চালের দাম তিনটাকা। এরও দাম বাড়াতে হবে, নাহলে ঝুটমুট ঝামেলায় ওরা যাবে না।

বিনয়বাবু তবু ওদের কথা শোনেন নি। সেদিন নীরোদই রুখে দাঁড়ায়।

—এসব চলবেনা স্যার। হাফ হাফ বখরা দিতে হবে। অনেক খেয়েছেন এবার আর নয়।

বিনয়বাবু এদের চেনেন। তাঁরও নানা জায়গায় মান খাতির আছে।

—ইচ্ছে করলে তোমাদের বিপদে ফেলতে পারি তা জানো?

কথাটা শুনেই ওরা হেসে ওঠে। নীরোদ মদ গিলছিল।

তার হাসির চমকে তীব্র মদের গন্ধ ওঠে। বিনয়বাবুর ভেতর বাড়ির ঘরে বসে এসব কথাবার্তা হয়।

শহরের বাড়িতে কয়েকটা ঘর আছে। সাধারণের সঙ্গে যে ড্রইংরুমে বসেন এটা সেটা নয় তাই রক্ষে।

নীরোদ বলে ওঠে,

—আমাদের বিপদ! হাসালেন স্যার। বিপদের মাঝেই তো বাস করি। তবে আপনারা প্রেস্টীজওয়ালা লোক সেটা যে প্যাংচার হয়ে যাবে স্যার এসব ফাঁস হয়ে গেলে।

কেষ্ট বলে,

—যদি চান তাহলে দিই ফাঁস করে। দিব্যি জেলে গিয়ে দিনকতক আরাম করা যাবে। বাইরে থাকা অনেক ঝকমারি।

নীরোদ থামিয়ে দেয় ওকে।

—চোপ বে! সবাই সতী! আমরা শ্লা গুণ্ডা—স্যার তো গঙ্গা জলে ধোয়া তুলসীপাতা। কিলিন!

বিনয়বাবুর রাগে সারা গা জ্বলছে। তবু মনে হয় ওদের ঘাঁটানো নিরাপদ নয়। হঠাৎ ওই কথাটা বলে তিনি ভুলই করেছেন।

বিনয়বাবুর নিজেরই বিশ্রী লাগে। তার অজানতেই তিনিও যেন ওই জানোয়ারের দলে গিয়ে পড়েছেন। তাদেরই একজন হয়ে উঠেছেন।

ওদের এই শাসন তিনি মানতে চান না। তাই বলেন,

—ওর বেশী দিতে পারবো না।

নীরোদকে শেষ কথা শুনিয়ে দিতে চান তিনি।

নীরোদ জানায় -ঠিক আছে। তবে কাজটা ভালো করলেন না স্যার। মাল আমাদের নেবার লোক অনেক আছে। আপনার থেকে তারাও কমতি নয়। ভালো দামও দেবে। তবে স্রেফ চিটিং করলেন, তাই বলছিলাম। চল্‌রে!

নীরোদ চলে গেল ওদের নিয়ে।

গাড়িটা ফিরছে শহর থেকে। বোধহয় পূর্ণিমার কাছাকাছি কোন তিথি। দুর্গাপুরের সেই কলরব আলো ঝলমল পরিবেশ ছেড়ে গাড়িটা চলেছে নির্জন ডাঙ্গার বুকচেরা রাস্তা দিয়ে।

বনভূমি সুরু হয়েছে। বিনয়বাবু ওদের ব্যবহারে আজ চমকে উঠেছেন, বেশ জেনেছেন এসব কারবারে অন্য অনেকেই এসেছে। বিনয়বাবুর মুখের উপর তাই ওরা এসব কথা বলতে সাহস করে।

অনেক দিনপর এইবার একটা আঘাত তিনি পেয়ে মনে মনে রেগে উঠেছেন। দরকার হলে ওদের দলকে দল তিনি ধরিয়ে দেবেন। তবে আগে তার এখান ওখানে জমা মালগুলো পাচার করে পরিষ্কার হতে চান তিনি।

...গ্রামের কাছে গাড়িটা এসে গেছে।

শীতের শেষ। গুড়ি গুড়ি হিম পড়ছে। প্রাণগোপাল বাড়ি ফিরছিল।

বিনয়বাবুর খামার বাড়ির ধার দিয়ে রাস্তাটা গেছে। বিশাল এলাকা জুড়ে সেই খামার বাড়ি। বিরাট বিরাট স্তূপ করে পালুই দেওয়া। সোনা ধানের মঞ্জরীর পর মঞ্জরীর পালুইগুলো যেন আকাশ ছুয়েছে। ওপাশে সারবন্দী গোলা।

বিনয়বাবু বছরে কয়েক হাজার মণ ধান বিক্রী করেন রাখবার জায়গার অভাবে। হাসি আসে প্রাণগোপালের। চাষী তিনিও।

মাঝখানে সাজানো একটা পুকুর। ওটায় সখ করে মাছ পুষেছেন বিনয়বাবু। পাঁচ সাত সেরী মাছগুলো খেলে বেড়ায়, ওসব নাকি কর্তাদের সেবায় লাগে। অনেক দেবতার ভোগে তারা উৎসর্গীকৃত।

হঠাৎ গাড়ির আলোটা চোখে পড়তে থমকে দাড়ালো প্রাণ-

গোপাল। ধূলো উড়িয়ে গাড়িটা বের হয়ে গেল। বিনয়বাবু ফিরছেন। প্রাণগোপালকে তিনিও দেখেছেন।

এসময় ওকে এই পথে দেখে অবাক হন তিনি। তবে বেশ জানেন আজ প্রাণগোপাল নখদন্তহীন বাঘ।

ওর করার কিছু সাধ্য আর নেই।

আজ ওকে দেখলে করুণা হয়। একদিন ওদেরই ছিল এমুলুকের সবকিছু। জমিদারী, বিগ্রহ—প্রতিষ্ঠা সুনাম।

ক্রমশঃ সব চলে গেল। প্রাণগোপালের আজ কোনমতে দিন চলে মাত্র। খাস জমি কিছু আছে, সামান্য বাগান আর কিছু পাথরের কোয়ারী, তাতে কোনমতে দেবসেবার আতপান্ন জোটে। ও প্রসাদ পায় মাত্র।

তবু বিনয়বাবু মনে মনে ওকে সমীহ করেন। গঙ্গাধর বলে —পয়জনলেশ স্নেক স্যার। গন ফট্।

বিনয়বাবু তবু ওকে নিজের হাতে টানতে চান। এখানে এই সবুজ পল্লীর মাঝেও একটা অসন্তোষ, একটা জ্বালা বুক ঠেলে উঠছে। অভাব যত বাড়ছে ততই বাড়ছে সেই জ্বালাটা।

এখানের চাষী শ্রমিকরাও দুর্গাপুরের সেই উত্তেজনার জ্বালাটাকে টেনে এনেছে। কথায় কথায় মিছিল বের হয়, ওরা দলবেঁধে অঞ্চল অপিসে হানা দেয়, বি-ডি-ও অপিসে গিয়ে ঘেরাও করে। ওদের দাবী অনেক। খেতে চায়, বাঁচতে চায় তারা। ঘরে বাইরে দেখেছেন বিনয়বাবু সেই অতৃপ্তি আর অসন্তোষের ধোঁয়া।

প্রাণগোপাল এখনও চুপ করে আছে। হয়তো দেখছে সে সবকিছু। তার মত ছেলে কোনদিনই চুপ করে থাকতে পারবে না। ওদের বুক ভরা জ্বালা, সেই জ্বালাটা একদিন অগ্নিবর্ষণ সুরু করতে পারে, তার ক্ষেত্রও প্রস্তুত।

বিনয়বাবু জানেন তার সিন্দুকেই কত টাকা জমে আছে, আরও

তার চেয়েও ডাবড় অনেক ব্যক্তি আছেন যারা বাজারে এই কৃত্রিম অভাবকে বাড়িয়ে চলেছেন। নিজেদের পাওয়াটা বেশী করতে গেলে অন্যকে বঞ্চিত করতেই হবে।

তবে দল রাখতে হবে তাকে, তাই বলহরি সামন্ত গঙ্গাধরদের পুষতে হয়।

গাড়িটা থেমে গেছে। নেমে আসেন বিনয়বাবু।

—ভালো আছো পানু?

প্রাণগোপাল অবাক হয় ওকে নেমে আসতে দেখে। ভদ্রতার খাতিরেই এগিয়ে গেল সে। প্রণাম করতো আগে, হাজার হোক গুরুজন। একটা সম্পর্কও ছিল এককালে। আজ প্রাণগোপালের কাছে গুরুজন, ভক্তি প্রণাম নেহাৎ বাজে বলেই বোধ হয়। ওসবের কোন মূল্যই নেই।

তাছাড়া ওই মানুষটিকে ও অন্তর থেকে সে শ্রদ্ধা করতে পারে না। এগ্রামের সব কিছুকে বিষিয়ে দিয়েছে ওই লোকটিই। বিশাখা নেই। তাদের সব কিছু গেছে। বাবাও ওই দুঃখেই অকালে মারা গেছেন, দেখেছে নীলাকে। তারানাথ তর্কতীর্থের সব পাণ্ডিত্যকে ওরা ব্যর্থ করে দিয়েছে।

তার মত অনেকেরই ঘরে আগুন জ্বলেছে। নিজের কথা আর ভাবে না প্রাণগোপাল। দুচোখে শুধু নীরব জ্বালা ফুটে ওঠে। তবু সেটাকে চেপে সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। ওর নিজের মনের কোন ভাবকেই সে প্রকাশ করতে চায় না। তাই সহজ কণ্ঠে জবাব দেয় প্রাণগোপাল।

—ভালোই আছি। আপনি?

বিনয়বাবুরা ভালোই থাকেন। তাই বোধ হয় ওই প্রশ্নের জবাব দেবার দরকার বোধ করেন নি তিনি। বলেন,

—তোমার কথাই ভাবছিলাম পানু। নানা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেল। আমিও নানা কাজে ব্যস্ত। ভাবছিলাম একদিন

এসে দেখা করবে। যাক্‌গে ওসব কথা। তোমার তরফের মান অভিমান থাকা স্বাভাবিক। অবশ্য আমার একটা কর্তব্য আছে।

দু জনে হেঁটে হেঁটেই চলেছে। কাছেই বাড়ি! বিনয়বাবু বলেন,

—তাই বলছিলাম, নতুন একটা কারখানা করছি। তুমিও এসো। ফায়ার ক্লে থেকে জিনিষপত্র হবে। ফায়ার ব্রিকস—ইন্‌সুলেটার এইসব, ভালো অর্ডারও পাবো। আর ক্যাপিটালের অভাব হবে না। তুমিও পার্টনার হয়ে যাও আর ম্যানেজার হয়ে থাকো।

অবাক হয় প্রাণগোপাল।

—সে তো অনেক টাকার ব্যাপার? মূলধন আমার নেই।

হাসতে থাকেন বিনয়বাবু, দরাজ প্রাণখোলা হাসি। হঠাৎ গলা নামিয়ে বলেন।

—আজকাল মুলধনের দরকার করে না। লোন—ব্যাঙ্ক লোন—আর অ্যাডভ্যান্স পেমেণ্ট সবই হবে। টাকা দেবে গৌরী সেন। তুমি হবে পার্টনার। দরখাস্ত করে দিও আমাকে—আর সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

প্রাণগোপাল কি ভাবছে। অতীতে বাবা বেঁচে থাকতে বিনয়বাবু একদিন এমনি একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন। লোভনীয় প্রস্তাব। তাতে সায় দিলে এতদিনে প্রাণগোপাল অনেক উপরে উঠে যেতো, কিন্তু সেদিন মত দিতে পারেনি সে।

—আজ প্রাণগোপালকে ডেকে এমনি প্রলোভন দেখাবার অর্থটা ঠিক বুঝতে পারে না। অবাক হয় সে।

বিনয়বাবু বলেন,

—এখুনিই জবাব দিতে হবে না। একত্রে ব্যবসা করবে—বিশ্বাসের প্রশ্ন আছে। মতবাদের কথা উঠবে। সেটা ভেবে চিন্তে উত্তর দিও। তবে কি জানো—ডেজ আর ভেরি হার্ড।

ব্যবসাতেও দারুণ স্লাম্ একদিন আসবেই। সেদিন আসতে দেরী নেই। যে ভাবে ফাইনান্সকে কর্ণার করছে সকলে, তাতে সব টাকাই অন্ধকারে ঢুকে যাবে। লোকের কেনার ক্ষমতা যদি না থাকে -- কোন ব্যবসাই চলবে না। কলকারখানাও বন্ধ হয়ে যাবে। তাই বলছিলাম মেক্ হে হোয়াইল সান সাইনস্। সময় থাকতে গুছিয়ে নাও। আচ্ছা চলি, পরে আলোচনা করা যাবে। গুড্ নাইট।

বিনয়বাবু কথাগুলো ওর মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে ভেতরে চলে গেলেন।

প্রাণগোপাল চমকে উঠেছে। ব্যপারটা ঘটে যায় কয়েক মিনিটের মধ্যে। এর জন্য তৈরী ছিল না সে।

বিনয়বাবু যেন একটা কুকুরের সামনে এক টুকরো মাংস ফেলে দিয়ে চলে গেলেন অবজ্ঞা ভরে। ও সেইটাই নিয়ে চুষবে আর কামড়াবে। প্রাণগোপাল বেশ বুঝেছে অত্তলে কোন পরম একটা বড় স্বার্থ আছে। নইলে তাকে অযাচিতভাবে ব্যবসার এই টাকাই বা দেবেন কেন।

গঙ্গাধর বিনয়বাবুর কাছারিতেই বসেছিল। লোকটা রোজ আসে। সারাদিনের এদিককার খবরাখবর সবই জানায়। সেইই জানিয়েছে বিনয়বাবুকে গ্রামে গ্রামে সেই আন্দোলনের কথা। ওরা এবার মাথা তুলছে।

ধান হয়নি। অজন্মা গেছে। এবার এখনও বৃষ্টি নেই। কামারপাড়ার কো-অপারেটিভ বন্ধ। কাজ নেই। জমিতে ধান নেই।

ওদিকে দুর্গাপুরের সেই আন্দোলনের সংক্রমণ এখানের মানুষের মনেও ধূমায়িত হয়ে উঠেছে।

তাতে অবশ্য গঙ্গাধরের মত মানুষেরই লাভ। সেবার ইলেক-

শনে কাজ দেখিয়ে গঙ্গাধর কয়েকশো টাকা পেয়েছিল মাত্র; বাকী ম্যানেজ করেছিল এদিক ওদিক থেকে। এবারও কিছু পাবার আশা রাখে, তাই রোজই আসে সেখানে।

ব্যাপারটা তারও নজর এড়ায় না। প্রাণগোপালের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আসছেন বিনয়বাবু বেশ সহজভাবেই। দেখে চমকে ওঠে গঙ্গাধর। তাহলে এতদিন যা শুনেছে সব মিথ্যা। ওদের নাকি মুখ দেখাদেখি নেই।

অথচ রাতের অন্ধকারে এত ভাব। গঙ্গাধর দেওয়ালের আড়ালে চুপি চুপি এসে ওৎ পেতে দাঁড়ায়। ওদের কথাগুলো ঠিক কানে যায় না, তবু শোনবার চেষ্টা করে।

মনে মনে তাব একটা ভয় ঢুকেছে।

বয়স হয়েছে গঙ্গাধরের, নিজের এলেম কি তা জানে। এখন বিনয়বাবুর মোসাহেবীই তার জীবিকা। প্রাণগোপালের মত ছেলেকে যদি হাতে পায়, বিনয়বাবুর গঙ্গাধরকে আর পোষবার দরকার হবে না। সেই মুহূর্তেই তাকে আবর্জনার মত দূরে সরিয়ে দেবে।

তাই ওদের দুজনের মধ্যে কোনদিন কোথাও মিল থাকুক এটা সে চায় না। ধূর্ত শুটকে লোকটার মুখে চোখে কিসের ঝকঝকে আভা ফুটে যায়।

বিনয়বাবু চলে যেতেই মাধবীলতার ঝোপ থেকে বের হয়ে আসে গঙ্গাধর গা ঝাড়তে ঝাড়তে। কালো রং-এর চাদরে সর্বাঙ্গ ঢাকা, তাতে ওই ঝোপের কাঠপিঁপড়েরা একসঙ্গে লাফিয়ে পড়ে আক্রমণ চালিয়েছে।

হাতে পায়ে গায়ের কোথাও কোথাও কামড়াচ্ছে তারা। জ্বলুনিও আছে। চুলকোতে চুলকোতে এগিয়ে আসে গঙ্গাধর।

—পানু! আরে শোন. শোন।

প্রাণগোপাল থমকে দাঁড়াল। অন্ধকার মূর্তির মত গঙ্গাধরকে

ওখানে ফুঁড়ে উঠতে দেখে অবাক হয়েছে সে। অবশ্য চমকায় নি। এইখানেই দিনরাত পড়ে থাকে লোকটা।

—কি বলছিলেন কত্তা? বেশতো ভাব সাব দেখছিলাম।

প্রাণগোপাল ওর দিকে চাইল। গঙ্গাধর মিটিমিটি হাসছে।

প্রাণগোপাল ওদের চেনে। তাই জবাব দেয় কঠিন স্বরে।

—কথাটা তাঁকেই শুধিয়ো। তুমি তো তাঁর খাস দপ্তরের লোক।

গঙ্গাধর নিজের প্রাধান্য রাখবার জন্য সেটা অবশ্যই স্বীকার করে ওর সামনে।

তাত বলবেনই! সব কথাই তো বলেন। তবে আমি বলছিলাম তোমাকে। মানে লোকটিতো নানা তালে থাকেন। একটু সমঝে চলো। বিশেষ করে কারবারের ব্যাপারে। কোথায় জড়িয়ে দেবেন কোনখানে।

প্রাণগোপাল ওর মুখে এই সব কথা শুনে অবাক হয়।

—জেনে শুনে পড়ে আছো কেন?

গঙ্গাধর কথাটা মাঝে মাঝে ভেবেছে। এককালে ব্রাহ্মণত্বের বড়াই করতো সে। প্রজাপতি ঋষি বলে সকলে ডাকতো তাকে। এ অঞ্চলের নানা ব্যাপারে থাকতো,—লিখতেও পারতো দু চার লাইন। অনেক অন্যায় অবিচার নিয়ে ছড়া কবিতা লিখে বাঁকুড়া দর্পণ—বর্দ্ধমানের বার্তা—আরও কাগজে লেখা পাঠাতো ছাপাও হতো।

দারিদ্রের মধ্যে ডুবেছিল, তবু নিজেকে এভাবে বিক্রী করেনি। আজ! তিলে তিলে তার সব ব্যক্তিত্বকে সেই কঠিন প্রতিবাদ-মুখর মানুষটিকে হত্যা করেছে বিনয়বাবু।

গঙ্গাধর হঠাৎ প্রাণগোপালকে কথাটা বলতে গিয়ে সেইটাই অনুভব করে।

প্রাণগোপাল জবাব দেয়।

—এর আগেও তিনি আমায় দলে টানতে চেয়েছিলেন, সেদিন

এত সব বুঝিনি। তবু জবাব দিয়েছিলাম। আজও সেই কথাই বলবো। কথাটা তুমিই জানিয়ে দিও প্রজাপতি ঋষি। জীবনে আদর্শ বলে যেটাকে জেনেছিলাম—সেটাও মিথ্যা হয়ে গেল। সুন্দর বলে যাকে জানতাম—দেখলাম তা ময়লা আর কালো। সেই দুঃখকে শুধু টাকা আর মিথ্যা প্রতিষ্ঠার মোহে ঢাকতে চাই না। সত্য তা সত্যই থাক—দুঃখ পাবো, সে দুঃখও সইবে, এমনি করে বঞ্চনা আমার সইবে না।

গঙ্গাধর অবাক হয় ওর কথায়। ওর হিসেবী মন চমকে ওঠে।

—এই সুযোগও ছেড়ে দেবে পানু?

প্রাণগোপাল হাসছে।

—এ দিনও ফুরিয়ে আসবে একদিন প্রজাপতি ঋষি। এই কাজ আর বিরাট ফাঁকিটা আজকের মানুষের চোখে ধরা পড়তে দেরী হবে না। সেদিনের মানুষের মনে শান্তি ছিল। সমস্যা এত বড় ছিল না তাই অনেক আঘাত সে সহ্য করেছে।

আজ তারা ঠকে ঠকে মরিয়া হয়ে উঠেছে। সেই মরিয়া মানুষগুলো একদিন আগ্নেয়গিরির মত ফেটে পড়বে। সেই ভয়টার জন্যেই ওরা আজ রং বদলাতে চায়।

গঙ্গাধর ওর কথাগুলো শুনছে।

মিথ্যা কথা নয়। এটা তার কাছেও সত্য বলে মনে হয়েছে। সহরের কারখানতেও নানা গোলমাল চলেছে। কারখানার শ্রমিকরাও মাইনে বাড়াবার দাবী তুলেছে।

তাছাড়া আরও চারিদিক থেকে খরচ বেড়ে গেছে, তাই বিনয়বাবুও বেশ চিন্তায় রয়েছেন।

গঙ্গাধর এটা অনুমান করে মনে মনে খুশীই হয়।

প্রাণগোপাল চলে গেছে। গঙ্গাধর তবু খবরটা শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছে।

প্রাণগোপাল নেহাৎ বোকাই।

নইলে এই ডামাডোলের বাজারেও ওর দলে ভিড়ে যা হোক কিছু হাতাবার চেষ্টা করতো। আদর্শ! প্রতিবাদ করার চেষ্টা! ধ্যাৎ! সব বাজে কথা। বেঁচে থাকার কথাটাই বড়। তার কাছে ওসবের দাম কি ওই নিয়ে বক্তৃতা দেওয়া যায়। পেট ভরে না।

তাই পান্নু গ্রামেই পড়ে রইল।

মাঝে মাঝে সহরে যায়—দুর্গাপুর, আসনসোলের দিকে। গঙ্গাধর নানা কথা ভাবছে। এসব তার কাছে পুরানো হয়ে গেছে। নিজের সেই অভাবের দিনগুলোকে সে ভুলেছে।

সেদিন নানা ভাবনায় পড়েছিল গঙ্গাধর। অভাবের সেই নগ্ন ছায়াটাকে আজও ভোলেনি। হেরেই গেছল, তাই আদর্শকেও বিকিয়ে দিয়েছে।

বিনয়বাবু বৈঠকখানায় এসে বসেছেন। এখানকার জরুরী কাজকর্ম সারতে রাত্রি হয়। ওর ঘরে আলো জ্বলছে।

গঙ্গাধর আস্তে আস্তে গিয়ে ঢুকলো। বিনয়বাবু ওর দিকে চাইলেন।

গঙ্গাধর কি বলবে তা মনে মনে ঠিক করে রেখেছে।

চাষীদের নানা গোলমাল বেঁধেছে। ভাগ চাষ রয়েছে অধিকাংশ জমি নানা নামে। দূর দূরান্তরের গ্রামেও বিনয়বাবুর অনেক জমি আছে। ধান সেখান থেকেই বিক্রী হয়ে যায়। হাজার হাজার টাকার ধান। আজ চাষীরাই মাথা তুলেছে। তাদের ও জমিতে বর্গাদারী স্বত্ব চাই। হুট বলতে কেড়ে নিলে চলবে না। তারাও দখলী স্বত্ব কায়েম করতে চায়।

গঙ্গাধরের কাছে খবর এসেছে তারা একজোট হয়ে উঠছে। সেদিন বি. ডি. ও অফিসে প্রসেশন করে গেছে। আরও অনেক এমনি চাষীরাও দল বাঁধছে। দরকার হলে এইবার তারা ডি-এম-এর কাছে যাবে। না হয় মন্ত্রীদের কাছে কলকাতায় গিয়ে দরবার করবে।

বিনয়বাবু শুনছেন ওর কথাগুলো। গঙ্গাধর বলে চলেছে।

—আজ্ঞে, চাষীদেরও খ্যাপাবার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। উস্‌কে দেবার লোকের অভাব হয় নি।

—হুঁ।

বিনয়বাবুর মুখ চোখে গম্ভীর একটা ভাব। চারিদিকে অশান্তি যেন জট পাকিয়ে উঠছে। সহরের সেই অন্ধকারের জীবগুলোও আজ অর্দ্ধেক বখরার দাবী জানায়। এরা তো জানাবেই। সহরের ছোঁয়া লেগেছে এদের মনেও।

বিনয়বাবু বলেন,

—বুঝলে গঙ্গাধর, কাল হয়েছে ওই দুগ্‌গোপুরের কারখানা। ওই চিমনীর স্ল্যাগ ব্যাঙ্কের লাল আলোর আভা যতদূর যাবে ততদূর জ্বলে উঠবে। লেবার ট্রাবল আর চাষী মজদুর সমস্যা এ আরও এমনি করে বাড়বে। শান্তিতে বাস করতে দেবে না।

গঙ্গাধর বলে,

—আমাদের পান্নু এইবার এইদিকেই ভিড়েছে। উনিও তো এ সবের গুরু। চেলার অভাব নেই।

অনাদি কামার তো দলবল নিয়ে লাল শালুর পতাকা হাতে এখন থেকেই চীৎকার তুলেছে—চাষীর হাতে জমি দিতে হবে! সে কি লাফানির কথা বলবো স্যার।

—প্রাণগোপালও ছিল ওদের দলে?

বিনয়বাবু একটু অবাক হন। তার কাছে এমন কোন খবর আসেনি। আন্দোলন চলছে তা জানেন তিনি। এটা শোনেননি।

গঙ্গাধর বিনয়বাবুর ওই কথার সুরে একটু থতমত খেয়ে যায়। বোধ হয় তার মিথ্যা কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। তাই সামলে নেয় সেই ধূর্ত লোকটা।

—ওতো সামনে সহজে আসবে না, তবে ওদের বুদ্ধি টুদ্ধি দেয়।

বিনয়বাবু কি ভাবছেন।

কথাটা কতদূর সত্যি তা কে জানে। তবে অসম্ভবও কিছু নয়। এককালের ঘোরতর বিপ্লবীরা আজ নতুন মতবাদেই বিশ্বাসী হয়েছে। তারা বিপ্লবে বিশ্বাস করে। উপরেরতলার মানুষদের তারা আদৌ বিশ্বাস করে না। এটা তিনি বাইরের রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখেছেন। প্রাণগোপালের পক্ষে সেটাও সম্ভব হতে পারে।

গঙ্গাধর এরই জন্য যেন অপেক্ষা করছিল। শোনায়—

—আপনি ওকে কি কথা বলেছেন, তারই জন্যে যেন বেশ রাগ রাগ ভাবই দেখালো। বলে—তোমাদের বাবুকে বলো ওসব আমার চাই না। আমি আদর্শে বিশ্বাসী, সামান্য পাওয়ার জন্য সেই আদর্শকে বেচে দিতে পারবো না। হেনা—তেনা লম্বা লম্বা অনেক বাতই শুনিয়ে গেল! আমাকে ও বলে—কি হয়েছে এ্যাদ্দিন ওদের কথা শুনে! শুনুন কথা! বল্লাম তো চ্যাংড়া কিনা সব হারিয়ে স্রেফ্ উদ্‌মো আপসানি। মুরোদ কতো জানা আছে!

বিনয়বাবুর মুখ চোখ কঠিন হয়ে ওঠে।

গঙ্গাধর ওর দিকে একবার চেয়ে নিয়ে থামলো। এ প্রসঙ্গে আর বেশী কথা বলার দরকার হবে না। এইটুকুতেই কি কাজ হয় দেখে পরে আবার কিছু ছাড়া যাবে।

গঙ্গাধর এসব ব্যাপার খুব ভাল করেই জানে। তাই অন্য প্রসঙ্গে গিয়ে পড়ে।

নিজের মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে গঙ্গাধর বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। কিছু টাকার দরকার। তাই কথাটা পাড়ে।

—কিছু টাকা দিতে হবে স্যার। মেয়েটার বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করে ফেলি।

বিনয়বাবু কথা বলেন না।

ক'দিন থেকে কেবল লোকসানই চলেছে। সহরের ওই নীরোদের দল তাকে মাসে বেশ কয়েক হাজার টাকাই এনে দেয়। তারাও বিগড়ে গেছে। ভয় দেখিয়েছে বিনয়বাবুকে। এদিকে চাষীরাও

অনেকে এবার অজন্মার দোহাই পেড়ে ধানও দেয়নি। উল্‌টে বর্গাদার স্বত্ব কায়েম করবার জন্য জোট বেঁধেছে।

প্রাণগোপালকে বিশ্বাস করতে চেয়েছিলেন, হয়তো তাতে কিছু সুরাহা হত্তো এদিককার গোলমালের। কিন্তু তাও কেঁচে গেল।

গঙ্গাধর বলে,

—হাজার তুয়েক টাকা দিতে হবে স্যার।

আগুনে যেন ঘি পড়েছে। বিরক্ত হয়ে দপ্‌ করে জ্বলে ওঠেন বিনয়বাবু।

—খোলামকুচি হে! টাকা তো নয় যেন খোলামকুচি! চাইলেই দিতে হবে? এত টাকার কাজ কিছু করো না যে তোমায় দিতে হবে।

গঙ্গাধর চুপসে যায়।

এদিকে ওই ভরসায় সে সব ঠিক করে ফেলেছে। এখন হাঁকিয়ে দিলে বিপদেই পড়বে সে। গঙ্গাধর তখন আর কিছু বলে না, চুপ করে সরে এল তখনকার মত।

তবু কেমন বিরক্ত হয়ে উঠেছে সে ওই বিনয়বাবুর উপর।

এত করেছে ওর জন্য, সারা এলাকার লোক তাকেই গালাগালি দেয়; দালাল, আরও অনেক কিছু বলে। নোংরা কথাও কানে এসেছে। গঙ্গাধর তবু পড়েছিল কিছু টাকার জন্য। অনেকের নামে অনেক কিছুই লাগিয়েছে। বিপদে ফেলেছে তাদের। বিনয়বাবুর ভোটের ব্যাপারে দিনরাত খেটেছে। জয়ী করেছে তাকে।

আজ তিনি একদম ভুলে যেতে চান তাকে।

বড়লোকের দস্তুরই আলাদা। ওরা নীচের সিঁড়িগুলোকে লাথি মেরে অবলীলাক্রমে উপরে উঠে যায়। আরও উপরে, নীচের কথা মনে রাখবার প্রয়োজনও বোধ করে না।

গঙ্গাধর ক্ষুণ্ণ মনে পথ দিয়ে চলেছে। বাতাসে মদ চোলাই-এর

গন্ধ উঠছে। সমানে কারবার চালিয়ে যাচ্ছে বলহরি সামন্ত। অনেক টাকা রোজগার করে সে।

সবাই রোজগার করছে, পারেনি শুধু গঙ্গাধর। ও কেবল তুমুখো কাল সাপ হয়ে উপবাসেই দিন কাটালো।

একটা গাড়ি চলে গেল। পুরানো ঝড়ঝড়ে গাড়ি। জানে গঙ্গাধর, বলহরি সামন্তের মাল চালান যাচ্ছে।

হাজার হাজার টাকার মাল। কোথায় যায় তাও জানে।

কি ভেবে বলহরির গদির দিকেই এগিয়ে গেল সে।

গঙ্গাধর শেষ পর্যন্ত বলহরির কাছেই ধর্ণা দেয়।

বলহরি তখন মালের হিসাব করতে ব্যস্ত। কাঁচাটাকার কারবার। অনেক মন্দিরে দরজায় তাকে পূজা দিয়ে কারবার চালাতে হয়। নেহাৎ পাটোয়ারী বুদ্ধি ধরে—তাই টিকে আছে।

গঙ্গাধরকে দেখেই বুঝেছিল তার আসার কারণ। তাই ব্যস্ততার ভান করে সে।

গঙ্গাধর চেপে বসল কাঙ্গালী ব্রাহ্মণের মত। কথাটাও জানায়,

—কর্তা বলেছিলেন দেবেন টাকাটা। এখন—

বলহরিও সায় দেয়।

—ব্যবসা বড় মন্দা হে। বাড়তি টাকা কি আছে যে দেব। চারিদিকে ষ্ট্রাইক আর গোলমাল। সারাদেশে অজন্মা খরা, কোথাও আবার বন্যা। বাঁচতে কি আর দেবে?

বলহরি উঠে পড়ে।

গঙ্গাধর তবু ব্যাকুলস্বরে জানায়।

—কিছু যাহোক দিতে হবে সামন্ত মশাই। গরীব বামুনের কন্যাদায়—

হাসে বলহরি।

—আজকাল কন্যারা আর দায় নয় হে। সহর বাজারে দেখগে দিব্যি তারা চাকরী করছে মোটা মাইনের।

গঙ্গাধর বলে,

—আমার মেয়েতো লেখাপড়া তেমন শেখেনি।

হাসছে বলহরি। এখনও তার সহরের সেই কারবার চলছে। মেয়েছেলের দাম আছে চিরকালই। তাই বলে।

—নাই বা লেখাপড়া জানলো, বলি তোমার মেয়ে তো দেখতে শুনতে খারাপ নয়, সুন্দরীই বলা চলে।

গঙ্গাধর তবু ওর দয়ার আশা ছাড়েনি। তাই জানায়,

—তবু বিনি পয়সায় কে ছেলের বিয়ে দেবে বলো? খরচা কিছু না কিছু চাই।

হাসছে বলহরি সামন্ত। এ হাসি সে বিশেষ সময়ে হাসে। শান্তস্বরে বলে।

—একটু তলিয়ে কথাটা ভাবো গঙ্গাধর। মেয়েই তোমাকে মাস মাস শ দরে টাকা এনে দেবে। আজকাল তো এসব আকৃচার হয়। পাঠিয়ে দাও না সহরে। তোমাদের ওই বিশাখা? এখন তার খবর জানো? মাসে হাজার টাকা তো নির্ঘাৎ কামায়। তাই বলছিলাম মেয়েকে একটু সহরমুখো করে ছেড়ে দাও। হাঃ হাঃ হাঃ

হাসছে সামন্ত মশায়, অভয় দেয়,

—আমার ওখানেও পাঠাতে পারো।

—সামন্ত মশাই! গঙ্গাধর চমকে উঠেছে ওই কথায়। রেগে উঠেছে সে। লাল হয়ে ওঠে মুখচোখ। তাকে এমনি হীন জঘন্য ভাবে অপমান করতে পারবে সামন্ত—সে কথাটাও ভাবেনি গঙ্গাধর। বলে ওঠে সে।

—এত নীচ ভাবতে পারলে আমাকে! নিজের মেয়েকে বিক্রী করবো এমনি পাপ টাকার জন্যে?

বলহরি শোনায়,

—নিজের ধর্ম নিজের বিবেককে তো আগেই বেচেছি গো

আমরা। আমাদের আর সবকিছুই যদি টাকা দিয়ে বিকিয়ে দিতে পারি তবে মেয়ে বৌকেই বা পারবো না কেন! লজ্জা লাগছে কথাটা শুনে, না?

গঙ্গাধর উঠে পড়ে।

তার সারা মনে ওই কথাগুলো ঝড় তুলেছে। কে যেন প্রচণ্ড ভাবে চড় মেরেছে তার গালে।

অসহায় বিবর্ণ অপমানিত গঙ্গাধর আজ কাঁপতে কাঁপতে বের হয়ে আসে। মনে হয় তার সবকিছুই বিকিয়ে গেছে এমনি শয়তানদের কাছে। বাকী আর কিছুই নেই।

বলহরি সামন্ত ওর মুখচোখের দিকে চেয়ে থাকে। দেখছে ওকে। লোকটার অতীত তার জানা। একরকম ভিক্ষা করেই দিন কাটাতো। আজ তারও জাতে ওঠবার সখ হয়েছে।

গঙ্গাধর আর ওর কাছে টাকা চাইবে না। যদি সে কিছু টাকা দেয় তার পিছনে ওই অলিখিত সর্তই থেকে যাবে। ওর মেয়েটাকে দেখেছে সে। উঠতি বয়স, ভাঁটালো সতেজ বর্ষার জল পাওয়া শাল গাছের মত লকলকে হয়ে উঠেছে।

গঙ্গাধর তখনও ফুঁসছে।

—এত বড় কথাটা বলতে পারলে সামন্তমশাই? আমাদের মান সম্মানও কি এতটুকু নেই?

বলহরি সামন্তের এসব বাজে কথা ভাববার সময় নেই। তাই ওকে এড়াবার জন্য বলে।

—তোমার ভালোর জন্যেই বলেছিলাম। দুটো পয়সার মুখ দেখতে। কইরে—পানাগড়ের ঋষি মোড়লের টাকাটা এলো? এ কিস্তির টাকা বেবাক না মিটুলে মাল এক ছটাকও যাবে না। জি টি রোড়ের বুড়ো ড্রাইভার তো ওর দোকানের খদ্দের, তবে আমি পয়সা পাবো না কেন?

টাকা! টাকাগুলো গুণে চলেছে বলহরি। এখানের বাতাস

পূতিগন্ধময়। এখানে আর জায়গায় কুলুচ্ছে না। তাছাড়া একটু রাখ ঢোকেরও দরকার। বলহরি এবার ওই গোঁসাইপাড়ার অন্য শরিকদের বিরাট পুরানো ধ্বসে পড়া বাড়িগুলো নামমাত্র মূল্যে কিনেছে।

বলহরি শোনায় গঙ্গাধরকে,

—দিন বদলায় হে, রীতিনীতিও বদলায়। গোঁসাইদের ওই নিরিমিশ্যি দেবতাকে এবার মালের নেশা লাগিয়ে দোব।

গঙ্গাধরের ওসব কথা শোনবার মত মন নেই।

আজ সত্যই তার সামনে জগতের অন্যরূপটা প্রকাশিত হয়েছে।

রাত হয়েছে। বলহরি সামন্ত খবরটা শুনে চমকে উঠে। —বলিস্ কি মদন ?

মদন জানায়—সত্যি গো। বলেছিলাম ছুঁড়িটা বড্ডো বেড়েছে, তা কথা কানে লাগুনি। এখন বোঝো ?

—তাই বলে নিশি পালিয়ে গেল ওই সিংজীর সঙ্গে। মালকড়িও ছিল সঙ্গে। হাজার দুয়েক টাকার মাল হবে। চেখে ধুলো দিয়ে পালালো ?

নিশি ইতিমধ্যে বলহরির দলের অনেক খবরই জানে। ওই ড্রাইভার ছোঁড়াটাই তাকে ফুসলে নিয়ে পালিয়েছে। আর শুধু হাতে যায়নি নিশি। দুর্গাপুর—বেনাচিতি--পানাগড়ের কয়েকটা ঘাঁটি থেকে মালের দাম বাদ এতগুলো টাকা নিয়ে পালিয়েছে।

বলহরি গর্জায় —বুঝলি, একেই বলে কলিকাল।

মেয়েটা কাজের ছিল। মাল পাচার করার কাজে মেয়েদেরই দরকার বেশী।

নিশি এ কারবারের ঘোঁৎ ঘাঁৎগুলো জেনে ফেলেছিল। মদন বলে।

—যাক, জলের দামই নিয়ে গেছে বাবু। দুধে হাত পড়েনি।

বলহরি ধমকায়—থাম তুই। এখন ভাখ আর কাকে পাস।

ওইটাকে, ওই যে ছুঁড়িটাকে—একটু বাজিয়ে দেখে তবে কথা বলবি।

বলহরি কি ভাবছে।

কারবারে মাঝে মাঝে এসব অসুবিধায় পড়তে হয় তাকে। লোকসানও যায়। তবু এ কারবারে এগুলো তেমন কিছু নয়।

বলহরির এই অন্ধকারের কারবার বেশ ভালই চলেছে। ইস্পাত নগরী দুর্গাপুর—ওদিকে পানাগড়—এপাশে কোলিয়ারী অঞ্চল আসানসোলেও তার মালের বেশ ভাল চাহিদা রয়েছে।

লোকজনও জুটতে দেরী হয় না। বলহরি জানে মানুষের চিরন্তন দুর্বলতার সংবাদ। বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে। টাকার জোরেই সে সবাইকে কিনে নিয়েছে।

আর এই অভাবটা যতদিন থাকবে, তার—দলে মেয়েছেলেও জুটবে। গঙ্গাধরকেও তাই কথাটা বলতে পেরেছে। এখন কথাটা ভাবুক গঙ্গাধর।

আপাততঃ বলহরি অনাদির বোন বীণার কথা ভাবছে। মেয়েটার কাজের দরকার। তবে বলহরিও ইচ্ছে থাকলে সহসা কাউকে দলে নেয় না।

অনাদির বোন বীণার উপর এইবার তার নজর পড়েছে। ভরপুর স্বাস্থ্য মেয়েটার। অনাদিও গরীব। কাজকম্মো তেমন কিছু নেই। বীণাও সেদিন এসেছিল। পরণের শাড়িখানা ময়লা,....মুখে-চোখে অভাবের নগ্নতা। তবুও ওই নিটোল যৌবন তার হারায় নি।

—একটা কাজকম্মো দেখেছেন বাবু?

—কাজ! বলহরি সকলকেই প্রথমে এক জবাব দেয়।

—কাজ কই। ওসবে আমি নেই বাছা। লোকের উপকার করে কথা শুনতে আমি পারবো না।

বীণাকে বাজিয়ে দেখতে চায় সে।

—তাছাড়া তোমার দাদা তো লীডার। তাকে শুধিয়ো?

শেষকালে আমার কোমরে দড়ি পড়বে ?

বীণা অভাবকে নগ্নভাবে দেখেছে। দাদার অবস্থাও সে জানে। তাই বলে।

আমি তো সাবালিকা, আমার নিজের ইচ্ছায় যদি কাজ করি তাতে কার বলার কি আছে ?

বলহরি কথাটা ভাবছে—আচ্ছা ভেবে দেখি। তবে কি জানো—বিপদের কাজ।

মেয়েটা চালাক চতুর। বলতে কইতে পারে। তাছাড়া ওই ডাঁটো দেহখানা দেখিয়ে অনেক কাজই হবে। বলহরি ভাবছে' বলে,

—জিনিসপত্র কিছু পোঁছে দিতে হবে মাঝে সাঝে। গাড়িতে যাবে। তবে সাবধানের কাজ কিনা ?

বীণার কাছে আজ সবই সমান। দাদার রোজগারপাতি তেমন নেই। তবু দাদা কিছু বলেনি। উপোস দিতে আর পারে না সে। তার উপর বৌদির গঞ্জনা আছে। একথা বৌদিও বলেছে।

—যাহয় করে খাওগে, দেহখান্ তো আছে।

বীণার এই জীবনের উপর ঘৃণা ধরে গেছে। জীবনের সবকিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে নিশ্চিন্ত উপবাস করে বাঁচা যায় না। তার সামনে আজ কোন ভবিষ্যৎ নেই। সব অন্ধকারে ঢাকা।

সেও বাঁচতে চায়, সেই সমস্যার কাছে আজ সব তুচ্ছ, বীণা জানায়।

—সব কাজই করবো সামন্ত মশাই।

বলহরি ওকে দেখছে। এমনি মরীয়া হয়ে না উঠলে কেউ তার কাছে আসে না। এদের দিয়ে তখনই দুঃসাধ্য কাজ করানো যায়। সামন্তমশায় ওর হাতে কিছু টাকা দিয়ে বলে।

—বেশ, তাহলে লেগে যা কাজে। মদনই সব বুঝিয়ে দেবে। বলহরির কাজে লোকের অভাব কোনদিনই হবে না।

রাতের অন্ধকারে প্রাণগোপাল খবরটা শুনে চমকে উঠে। নিশি কোথায় গিয়েছিল গতকাল, আর ফেরেনি। বলহরির চেনা কোন ড্রাইভারের সঙ্গে পালিয়ে গেছে ওই অন্ধ মনুকে ফেলে। মেয়েটাকে দেখেছিল প্রাণগোপাল—কেমন যেন বদলে গেছে একেবারে। কিন্তু এমনি নির্মম হয়ে উঠবে তা জানতো না। অন্ধ মনু ওকে এতদিন খাইয়েছে—আজ অসহায় লোকটাকে ফেলে চলে গেল মেয়েটা। ওর স্নেহের কোন দামই দিল না।

কি ভেবে প্রাণগোপাল খবর নিতে বের হয়েছে। রাতের অন্ধকারে গ্রামটা ঢাকা, তারাগুলো জ্বলছে কি আতঙ্কে। বনের দিক থেকে শিয়ালের ডাক ওই জমাট অন্ধকারকে আদিম করে তোলে। মানুষ নেই, শুধু এক আদিম আরণ্যক রাজ্য।

জীর্ণ ঝুপড়িটাও অন্ধকার। অযত্নে—উঠানে ঘাস গজিয়েছে। প্রাণগোপাল এগিয়ে যায়।

…কার কান্নার শব্দ শুনে থমকে দাঁড়াল প্রাণগোপাল। কে জানে বোধ হয় নিশি ফিরেছে তার কাকার কাছে। অনুশোচনায় কাঁদছে সে।

এগিয়ে যায় প্রাণগোপাল—মনুদা!

কেউ নেই, কাঁদছিল অন্ধ মনু। এত বড় পৃথিবীতে আজ সে একা। এই পৃথিবীর দেওয়া আঘাতে তার বুক ভেঙ্গে গেছে। অবোধ অসহায় শিশুর মত কাঁদছে লোকটা। প্রাণগোপালের মনে হয় আজ ওর সব হারিয়ে গেছে।

—মনুদা! প্রাণগোপাল ওকে ডাকছে।

‥ ওর ডাকটা অস্পষ্ট শোনে মনু। লাফ দিয়ে উঠে। মনে হয় মেয়েটাই ডাকছে তাকে। ফিরে এসেছে। আজ মনুর সেই দুঃখ দুর্বার রাগে ফেটে পড়ে। হাতের লাঠিটা তুলেই ওই দিকে এক ঘা বসিয়ে দেয়।

—এসেছিস! কেনে গিইছিলি ওখানে, ওই বলহরির খপ্পরে? বল—কেনে, কেনে গিইছিলি?

প্রাণগোপাল লাঠিটা ধরবার চেষ্টা করে, তার পিঠেই লেগেছে লাঠিটা।

—মনুদা—আমি।

—পানু! তোকে মারলাম!...ওরে মেয়েটা চলে গেল, সত্যিই চলে গেল!

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে মনু। প্রাণগোপাল ওকে দেখছে।

মনু বলে চলেছে—তোকেও মারলাম শেষকালে?

এই আঘাতে প্রাণগোপালের অসাড় মনে কি সাড়া আনে। এই লোকগুলোর জন্য কিছুই করতে পারেনি সে। অন্ধকারে এরা মরে যাবে,...সব হারাবে এদের। প্রাণগোপাল কঠিন হয়ে ওঠে।

—মনুদা তুমি চুপ করো।...কেঁদো না - এর প্রতিকার হবে একদিন।

—হবে? আমার বুক ভেঙ্গে দিল ওরা।

—নিশ্চয়ই এর প্রতিকার হবে মনুদা।

প্রকম্প হাতে মনু ওর হাতখানা ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে,

—তাই হোক ভাই। একদিন তোদের ওই শক্ত মুঠি দেখেছিলাম। আজ, আজ কি তোরা সবাই মরে গেছিস?

প্রাণগোপাল জবাব দিল না। ওর চোখ নেই, তাই একালের হতাশা আর বিকৃতিকে সে সম্যক দেখেনি। দেখলে একথা বলতো না বোধহয়।

এত যন্ত্রনা আর হতাশার মাঝে প্রাণগোপালের দিশহারা হয়ে গেছে।

পথ কোনদিকে জানে না প্রাণগোপাল। পথঘাটে শুনেছে অনেক কথা। গঙ্গাধরই সেদিন হাটতলায় বসে আসর জমিয়ে গল্প করছে।

—বুঝলে ? ওই মন্নুর ভাইঝির জন্যেই তো পান্নুর বেশী শোক। মানে মুখের গ্রাস কিনা ?

হঠাৎ কাকে দেখে চেপে গেল গঙ্গাধর। এরই মধ্যে প্রাণ-গোপালের সমর্থক বেশ একটা দল গড়ে উঠেছে তা টের পেয়েছে সে। সে গাঁয়ের জিতু বলে,

—মেয়েটাতো বলহরির দলেই ছিল যে গো। আপনার মেয়েকেও নাকি ভর্তি করবেন শুনছিলাম।

—এ্যাঁও ! গঙ্গাধর সরে গেল।

কথাটা শুনেছে পান্নুও। তার মনের অতলের রাগটা চাড়া দিয়ে উঠেছে আরও, কিন্তু করার কিছু নেই।

চারিদিকে দেখেছে ওদের সেই লোভী হাতটা এগিয়ে চলেছে। নীলাদের স্কুলের ব্যাপারেও বলহরি সামন্ত একজন মাতব্বর। সেক্রেটারীই। বিনয়বাবুও আছেন, গঙ্গাধরও জুটেছে সেখানে। তার নাকি সংস্কৃতের কি উপাধিও আছে। এ খবরটা কেউ জানতো না। স্কুলে তাই গঙ্গাধরও মাঝে মাঝে সংস্কৃত পড়াতে যায়।

মাইনের টাকা—এড্ এর টাকা সবই আসে। কিন্তু তবু মাষ্টাররা পুরো মাইনে পান না। বলহরির ইমারত উঠছে স্কুলের ইঁট পাঁজার ইঁট নিয়ে।

....তবু বলার কিছু নেই।

প্রাণগোপাল দেখেছে। কোথায় চারিদিকে একটা বিরাট শক্তি ধীরে ধীরে মাটির তল থেকে মাথা তুলছে। কৃষি ঋণ জলসেচ, রাস্তার দাবী—নানা কিছুর বিরুদ্ধে ওরা সংঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদের জোয়ার, তুলেছে। ওরাও দেখেছে এই অবিচার আর অত্যাচার। তাই গ্রাম গ্রামান্তরের চাষী মজুর মধ্যবিত্তরা আজ নতুন কি দাবী নিয়ে একত্রিত হচ্ছে। ওরা বের হয়েছে পথে।

প্রাণগোপাল তবু এ আন্দোলনের সামিল হতে পারেনি।

দেখছে সে। ভয় হয় তাদের আগেকার সেই বৃহৎ প্রচেষ্টার মত এও ব্যর্থ হয়ে যাবে বোধ হয়।

তাই এবার সাবধানী মন সহজে সাড়া দিতে চায় না।

কিন্তু প্রতিকারের পথ কই ?....এই জগদ্দল পাথরটাকে সরাবার পথ তার জানা নেই।

সেটা আরও চেপে বসছে তাদের উপর।

গোঁসাইদের ওই বিরাট বাড়ি এখন লরিকান সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। মালিকদের অনেকেই এখন বাইরে চাকরী করছে। কেউ বা দুর্গাপুর কেউ বা কোলিয়ারীর দিকে বাসা পেয়ে সেই-খানেই চলে গেছে। এতবড় বাড়ি রাখাও আর সম্ভব নয়।

ইঁট খুলে পড়ছে, দরজা জানালা ভেঙ্গে পড়েছে। কোথাও ছাদের কার্ণিশে গজিয়ে ওঠা অশথগাছ বটগাছগুলো বেড়ে উঠেছে; প্রাণগোপাল ওরই একটা অংশকে কোন রকমে বাস-যোগ্য করে রেখেছে। দুখানা ঘর, তাও আদ্যিকালের ছাদ। বর্ষার জলে সেগুলো ভিজে ভিজে জল চুইয়ে পড়ে।

ভাঙ্গা সিড়ি অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। মাঝে মাঝে দুচারটে চামচিকে মানুষের পায়ের শব্দে উড়ে বেড়ায় এদিক ওদিকে। ওদের বিশ্রী বদগন্ধ ওঠে।

অতীতের এই ধ্বংসস্তূপে ওরা একা ওই প্রাণগোপালকেও যেন সহ্য করতে পারে না। তবু প্রাণগোপাল ওখানে টিকে আছে। আর আছে একজন, সে ললিতা।

মন্দিরের দেবতা এখনও আছে। পূজারী ব্রাহ্মণের জন্য তখন জমির ব্যবস্থা ছিল, তাছাড়া নিত্যপূজার প্রসাদ, ভোগ, অন্যান্য পাওনা গণ্ডা ছিল, ভালোই পেতো সে এখান থেকে। তাই সেদিন পূজারীর ভক্তির অভাব হয়নি। রোজ সমারোহে পূজো হতো। কিন্তু এখন সে সব জমি পূজারীর খাস হয়ে গেছে।

সরকারকে সেইই খাজনা দেয়। এদিকের প্রণামী ভোগরাগ ও উঠে গেছে, তাই ভক্তিরও অভাব হয়েছে।

নিত্যসেবার নমো নমো ব্যাপারটা এখন প্রাণগোপালকেই সারতে হয় মাঝে মাঝে। পুরুতঠাকুর বৃদ্ধ হয়েছেন, শরীর বয় না। রাতের বেলায় চোখেও দেখেন না, তাই এক একদিন এই পাথরের ঠাকুরকে নিয়ে পড়তে হয় প্রাণগোপালকে। পূজারীর ছেলেরাও আর এ পথে আসেনি।

একজন দুর্গাপুর কারখানায় স্কিল্‌ড লেবার, অন্যজন স্পেশ্যাল ক্যাডারে মাষ্টারী করছে। যজমানবৃত্তিকে তারা ছেড়ে দিয়েছে। প্রাণগোপাল প্রথমে রাজি হয়নি।

—কি হবে এসব দেবসেবা - নিত্যসেবা করে? পাথরের পূজো নাইবা করলাম।

ললিতা অবাক হয়!

—সে কি কথা গো? হেই মা। ঠাকুর বলে কথা! কুলদেবতা।

—কুলদেবতা!

প্রাণগোপালের আজ আর কোন বিশ্বাসই নেই ওই সবে।

ললিতার দুচোখে ভয়ের চিহ্ন। ওর শূন্য জীবনে ওইটুকুই মাত্র অবলম্বন। সব গেছে তার। জীবনে অনেক কিছুই পেয়েছিল। দেখেছিল সেই শান্তি আর প্রাচুর্যের দিনগুলোকে। গোঁসাইবাড়ির সেই দোল দুর্গোৎসবের জমজমাট ভাবটা আজও তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

আজ সব হারিয়ে গেছে। ভগ্নমন্দিরে ওই দেবতাকে কেন্দ্র করেই বেঁচে আছে সে। ললিতা বলে।

—তা হয়না পানু। দেবসেবা বন্ধ করতে পারবে না, তাহলে এই মন্দিরেই আমি তিলে তিলে শুকিয়ে মরবো, আত্মঘাতী হবো।

হেসেছিল প্রাণগোপাল।

—কতদিন ধরে রাখতে পারবে তুমি এগুলোকে?

ললিতা জবাব দেয় নি। তবে ওর জীবনভোর যে এই ব্যবস্থা চালাতে হবে সেটা বুঝেছিল প্রাণগোপাল। ললিতাকে আঘাত দিতে চায় নি সে। কোথায় যেন তার জন্য একটা দুর্বলতা রয়ে গেছে।

তাই ভগ্নপুরীতে আজও সন্ধ্যার শঙ্খ বাজে, আরতির কাঁসর বাজে ভয়াবহ সেই নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে।

প্রাণগোপাল জানতে পারে সেই ধ্বংসস্তূপের অধিকাংশটাই কিনে নিয়েছে বলহরি ওদের শরিকদের কাছ থেকে। প্রাণগোপাল খবরও পায়নি এতদিন। দখল নেবে এইবার বলহরি।

একদিন যে বলহরি সামন্তকে শাসিয়েছিল প্রাণগোপাল উদ্যত বন্দুক হাতে, সেই বলহরি সামন্ত আজ দখল নিতে আসে এই বাড়িতে।

বেশ মিষ্টি কণ্ঠস্বরেই কথাটা জানায় বলহরি।

—এমনিই পড়ে আছে তাই কিনে নিলাম বাড়িটা।

গাড়িতে করে টিন, মালপত্র-ড্রাম-হাড়ি বড় বড় পাইপ আসছে। বলহরি এতদিন পর এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ব্যবসা সুরু করবে। বলে সে।

—বিড়ির কারখানাই করবো। তবু কিছু লোক পরিপোষ হবে। বুঝলেন পানুবাবু—দুটো পয়সা কামাই বটে, তবে একা খাই না। যথাধর্মো বলছি।

প্রাণগোপাল চুপ করে ওর কথাগুলো শুনছে।

জানে বলহরি কিসের কারবার শুরু করবে এইখানে। ওই চোলাই মদের গন্ধে সারাবাড়ি ভরে তুলবে। চোরাই মালপত্রের গুদামও হবে। এই বাড়িতে একদিন ছিল শুচিতা আর পবিত্রতার স্পর্শ।

আজ সেখানে নারকীয় লীলা চলবে। প্রাণগোপাল তাকে বাধা দিতে পারবে না।

এই স্রোতকে তার জীবনেও ঠেকাতে পারেনি সে, চুপ করে সয়েছে কেবল। আর ওদের দাপটে কোণঠাসা হয়েছে কেবল।

একা সে নয়।

তার আশপাশে দেখেছে সেই কোণঠাসা ভাবটা। তার নিজের জীবনের সব আশাকে ওরা ব্যর্থ করে দিয়েছে। বিশাখার কথা মনে পড়ে। সেও হারিয়ে গেছে ওদের যন্ত্রণায়।

রমার স্বামী ঘর সংসার সবকিছু বিষিয়ে দিয়েছে ওরা। সব হারিয়ে ফিরে এসেছে ব্যর্থ একটি নারী, কি দুঃসহ জ্বালা বুকে নিয়ে। অন্ধ মনুকেও দেখেছে। তার একমাত্র অবলম্বন তার বোন নিশিকেও ওরা ঘরছাড়া করেছে। সব কেড়ে নিয়েছে ওদের।

ভটচায মহাশয়ের নাতনী নীলাকে দেখেছে, তার জীবনে কোন শ্যামসবুজ ওরা রাখেনি। প্রতিদিনের সংগ্রামে সে ক্লান্ত। বলহরি সামন্ত আর বিনয়বাবুর মত মানুষগুলো তাদের জীবনের সব আশাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।

ললিতা বলে—এসব কি হচ্ছে পানু? দেবতার স্থান।

প্রাণগোপাল জবাব দেয় তিক্তকণ্ঠে।

—দেবতা অনেকদিন আগেই চলে গেছে মাসী, যারা আছেন তারা অপদেবতা। দেবতা আর নেই।

—তোর ওই এক কথা!

প্রাণগোপাল হাসে। সেও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বেশ বুঝেছে, একালে মুখ বুজে সবকিছু যন্ত্রণাকে এড়িয়ে মানুষ বাস করতে পারবে না। তাকে যে কোন একটা পথ নিতেই হবে।

হয় ওদের মতকে সমর্থন করে তাদেরই গোলাম হয়ে থাকতে হবে। বিনয়বাবু সেই লোভও তাকে দেখিয়েছেন। আজ প্রাণগোপালের সামনে দুটো পথ খোলা। হয় প্রতিবাদ করতে হবে, না হয় মেনে নিতে হবে ওদের সব কিছু।

ললিতা বলে—এর কোন বিহিত হবে না?

প্রাণগোপাল এর জবাব কি তা জানে না। চুপ করে সরে গেল। কাদের হাসির শব্দ কানে আসে।

ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ওরা আজকের নতুন কারখানার উদ্বোধন করছে।

বাতাসে চিমসানি বিশ্রী গন্ধ ওঠে। খিস্তী করছে তারা।

—শ্লা দিব্যি জায়গা মাইরী। মাগীটাকে এইখানে আসতে বল।

কে বলে—কত্তা জানতে পারবে মাইরী।

—হ্যাঁঃ! কত্তা তোর গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসীপাতা। বীণা ফীণা কত্তো মেয়ে আছে তা জানিস্। মাল নিয়ে যায়, আর কত্তা যেন হ্যাবতা।

ওরা আরও কি যেন বলছিল। প্রাণগোপাল সরে এল। ওসব কথা সে শুনতেও ঘৃণা বোধ করে।

মনে মনে সে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। আগেকার সেই মনের জ্বালাটা ঠেলে উঠছে। এতকাল সে কোন কিছুই করতে চায় নি। ভেবেছিল সব এড়িয়েই সে থাকবে। কিন্তু আরও অসহ্য বোধহয় প্রাণগোপালের।

শান্ত গ্রামসীমায় কাদের চীৎকার উঠেছে, ছন্দবদ্ধ চীৎকার। উত্তেজিত বহু মানুষের ভিড় জমেছে।

আমাদের দাবী মানতে হবে। চাষীর হাতে জমি চাই।

বাঁচার মত বাঁচতে হবে।

ধুলো উড়ছে, হাজার মানুষ ভিড়েছে ওই শোভাযাত্রায়। দূর দূরান্তরের চাষীরা সাধারণ মানুষ শোভাযাত্রা করে চলেছে সহরের দিকে। আবেদন নিবেদনে ফল হয়নি, ওরা তাই এবার পথে নেমেছে।

ছেলে-মেয়ে-বৃদ্ধের দল চলেছে।

গাড়ির ভিতর বিনয়বাবু আর বলহরিকে দেখে ওরা যেন বেশী করে চীৎকার করছে।

চুপ করে বিবর্ণমুখে বসে আছে বলহরি।

চোখাচোখি হয়ে যায় অনাদি কর্মকাবের সঙ্গে। তার চেহারা যেন বদলে গেছে! উস্কো খুস্কো চুল, লাল হয়ে উঠেছে দুচোখ। চীৎকার করে যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

বীণার কথা মনে পড়ে।

ওদের অতলের জীবনে সেই অসহায় করুণ অবস্থার কথা জানে বলহরি। মেয়েটা এ দলে নেই, বোধহয় তারই কাজে আজ পানাগড়ের দিকে গেছে।

তবু ওদের সংখ্যা সামান্যই। দলে এরাই ভারি হয়ে উঠেছে।

নীরোদের দলও চুপ করে বসে নেই।

তাদের নতুন মহাজন জুটেছে। কাঁচা পয়সার লোভ সবলেরই আছে। বিনয়বাবুর কাঁচা পয়সাটা হাতছাড়া হয়ে গেল। বলহরিও শুনেছে কথাটা।

বলে—ব্যাটাদের একটু বুঝিয়ে দিতে হবে স্যার। দেবো একদিন একটু টিকটিকি লাগিয়ে।

বিনয়বাবু রাগলেও সেটা প্রকাশ করে না। এ ব্যবসাটায় কাঁচা পয়সা আছে। সেটা হাতছাড়া হয়ে যেতে দেখে মনে মনে রাগই হয়েছে। ওদের একটু প্যাঁচে ফেলার দরকার। তাই ওই অপ্রিয় কাজটা বলহরিকে দিয়েই করাতে চায়।

নীরোদ অবশ্য ভাবেনি এমনি একটা বিপদে পড়ে যাবে সে।

নতুন মহাজনের কাছে মাল পৌঁছে দিতে হবে। সেদিন বরাকরের কাছে পলাশবনে ঢাকা চড়াই-এ মালগাড়ী থেকে মাল নামিয়েছে। তামার তারের বাণ্ডিল সেই সঙ্গে পিতলের চাদরও। সরেস মাল।

রাতের অন্ধকারেই ট্রাক বোঝাই করে তারা চলেছে বর্দ্ধমানের দিকে। নিঃস্তব্ধ জি-টি রোড। দুর্গাপুরের শালবনে চাঁদের আলো পড়েছে। কুয়াশার সাদা চাদর জড়ানো রাত্রি। চারিদিক থমথম করছে।

হেডলাইটের আলোর চমকানো ঝলক ফেলে দুচারটে মাল বোঝাই ট্রাক ছুটে চলেছে।

পিছনে একটা জিপে রয়েছে তারা। সামনের ট্রাকখানার উপর নজর রেখে চলেছে।

হঠাৎ একটা চীৎকার শোনা যায়।

—রোখো।

নীরোদ জানে এই হুকুমের অর্থ কি। চোখের নিমেষে এক্সি-লেটার চাপ দিয়ে গাড়িখানার গতি বাড়িয়ে দেয়।

পিছন থেকে দুটো গাড়ি আসছে। আবছা অন্ধকারে শুনতে পায় ফায়ারিং-এর শব্দ। এক ঝলক আগুনের শিখা দেখা যায়। হাওয়ায় গুলির শব্দ ওঠে।

গাড়িখানা যেন চারচাকা মাটি থেকে আসমানে তুলে ছুটছে।

একটা তীব্র শব্দ ওঠে।

তাদের ট্রাকের সামনের টায়ারে বিঁধেছে একটা বুলেট। চাকাটা সশব্দে ফেটে গেল। কাৎ হয়ে গেছে গাড়িটা।

...নীরোদ জানে এসময় পালানোই ভালো। ওরা ট্রাকটাকে পাশ কাটিয়ে তীরবেগে বের হয়ে গেল। জি-টি রোড নয়, একটু দূরে অজয় রোডের দিকে বাঁ হাতে আলো নিভিয়ে চাঁদের আলোতেই গাড়ি চালিয়ে কোনমতে পালিয়ে গেল তারা।

পুলিশের হাতে আজ তাদের মালপত্রের ট্রাকটা ধরা পড়ে গেছে।

ওরা পালিয়ে গিয়ে জঙ্গলের ধারে ছায়া ঢাকা পুরানো শিব-মন্দিরের কাছে গাড়ি থেকে নামল। এতদূরে ওরা তাদের তাড়া

করে আসেনি। কোনমতে জাল কেটে আজ বের হয়ে এসেছে সব হারিয়ে।

রাগে উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে নীরোদ, ঘেমে উঠেছে।

—মাল আছে?

কেষ্টা সিটের নীচে থেকে একটা বোতল বের করে দেয়। গলায় খানিকটা তাজা মদ ঢেলে জিব দিয়ে ঠোঁট মুছতে মুছতে গর্জায় নীরোদ।

—শ্লা হারামির বাচ্চাকে দেখে লোবো এইবার।

ওপাশে দাঁড়িয়েছিল কেষ্ট, দলের সবচেয়ে বুদ্ধিমান কৌশলি সে। সব খবরই রাখে। সে বলে।

—এ ওই বিনয়বাবুরই কাজ। কালই ওর লোক জেনেছে মাল নামবে। পাচার হবে। ওরাই সবটা ঠকিয়ে নেবার মতলবে ছিল ওস্তাদ!

নীরোদ গর্জে ওঠে—ইয়ে দেবে শ্লাকে। শ্বশুর বাড়ির গাঁয়ের লোক কিনা—

কথাটা মনে পড়ে নীরোদের। রমার কথা।

একদিন তাকে কেমন ভালো লেগেছিল। এতদিন কাছেই ছিল সে। তার অভাবটা ঠিক বুঝতে পারেনি। আজ রমাও চলে গেছে তার উপর রাগ করে।

ওই বিনয়বাবুর জন্যই সে এই কাজে এসেছিল। নইলে কারখানার চাকরী করে যা পেতো তাতে আরও পাঁচজনের মত বাঁচতে পারতো। রমাও খুসী হতো। নীরোদ নিশ্চিন্তে বাস করতো। রাত বিরেতে প্রাণ হাতে নিয়ে পাগলা কুকুরের মত বাঁচতে হতো না।

বিনয়বাবুই তাকে টাকার লোভ দেখায়। লোভ দেখিয়ে এই পথে আনে।

মদটা গিলেছে নীরোদ।

হুনিয়ার ছবি তার সামনে কেমন বিষিয়ে উঠেছে। কি পেয়েছে সে এতদিনের পরিশ্রমে?

কানাকড়ি মাত্র। হারিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী। সব কিছু তার লুঠ করে নিয়েছে ওই বিনয়বাবুরাই, আজ তাদের চরম বিপদে ফেলতেও দ্বিধা করেনি।

নীরোদ বলে,

—দেখে লোব এইবার ওকেই একহাত। জেলে যেতে হয় তাই সই।

—অন্ধকার রাত্রি, চাঁদের ম্লান আলো ঘন কুয়াসার আড়ালে যেন হারিয়ে গেছে। ওরা ঘুরপথ দিয়ে উখরা—রাণীগঞ্জ হয়ে আসানসোলের দিকে ফিরছে শূন্য হাতে।

রাগটা তাই বেড়ে উঠেছে নীরোদের।

বলহরি ওৎ পেতেছিল, ওদের দলের সবশুদ্ধ ধরার খবর সে শুনবে, কিন্তু থানায়—এদিক ওদিকে তেমন কোন খবর পায় না। মাল কিছু ধরা পড়েছে। তবে লোকজন তেমন ধরা পড়েনি। ড্রাইভারও গাড়ি ফেলে বনের মধ্যে পালিয়েছে। গাড়িখানাও বিহারের কার চোরাই গাড়ি।

সুতরাং সবই সেই অন্ধকারেই রয়ে গেছে।

বিনয়বাবু খবরটা শুনে ভাবনায় পড়েন।

—এসব নাইবা করতে যেতে, তোমাকেও কাজ কারবার করে চালাতে হয়। বুঝলে বলহরি, ওরা চুরি করে—তুমিও করো। চোরে চোরে ঝগড়া করতে গেলে? তাই বলছিলাম কাজটা ভাল হল না।

বলহরিও তা জেনেছে, কিছুদিন তাকেও সাবধানে থাকতে হবে। চারিদিকে গোলমাল চলছে। গ্রামেও ঠিক সেই শান্ত আবহাওয়া নেই।

দরখাস্ত পড়েছে তার নামে। গ্রামের লোকও ক্ষেপে উঠেছে যেন। আজকের ওই শোভাযাত্রার কথা মনে পড়ে। তবু বলহরি বলে,

—আপনি থাকতে কাউকে ভয় করি না স্যার। সবাই আপনাকে মানে, ভালবাসে। কলকাতার হোমরা-চোমরা মহলে এত ভাব।

—কিন্তু দিন বদলাচ্ছে বলহরি। আমার কথা কেইবা মানবে? ওদিকে দেখে এলে তো গ্রামের মানুষের মনের অবস্থা!

বিনয়বাবুও রীতিমত ভাবনায় পড়েছেন।

বলহরি বলে, তাই যে কদিন পারেন কিছু হাতিয়ে নিন স্যার। তারপর দেখা যাবে।

নীলা তখনও ফেরেনি। ওরা দল বেঁধে সদরে গেছে। এত দিনের অভিযোগের কোন কিনারা হয়নি। ওদের সব নালিশ বোধহয় ওদের ফাইলের তলেই চাপা পড়ে অগস্ত্য যাত্রা করেছে।

বিনয়বাবু, বলহরি সামন্তের অদৃশ্য হাত অনেক দূর অবধি এগিয়েছে। তাই ওরাও এর শেষ দেখতে চায়।

তারানাথ তর্কতীর্থ একা বসে আছে। সামনে জীর্ণ পুঁথির একটা পাতা খোলা। পুঁথির বুকথেকে বহু অতীতের কোন একটা বিস্মৃত যুগের ম্লান গন্ধ জেগে ওঠে।

কার পায়ের শব্দে মুখ তুলে চাইল তারানাথ।

—নীলা ফিরলি?

নীলা নয়, এগিয়ে আসে প্রাণগোপাল। হ্যারিকেনের আলোয় ওকে দেখে তারানাথ কথা বলবার একটা লোক পেয়ে যেন একটু খুশী হয়।

—বসো। নীলা নেই। ওরা সব শহরে গেছে।

প্রাণগোপাল তা দেখেছে। ওদের রৌদ্রদৃপ্ত চেহারা—ওদের

সতেজ কণ্ঠস্বর শুনে মনে মনে খুশী হয়েছিল। তবু ওরা প্রতিবাদ করতে পারবে, এ যেন নতুন কোন লীলা।

ফর্সা রং রোদে লাল হয়ে উঠেছে। কোঁকড়ানো একরাশ চুল মাথায় খোঁপা করে বাঁধা। পিছনে আরও অনেক মেয়ে চলেছে।

প্রাণগোপালের কথাটা মনে হয়, সে এখনও কেন বসে আছে। সেদিনের সেই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত সেই মানুষটি যেন মরে গেছে। তার অন্তরের হিম ঠেলে কোন আবেগ জেগে ওঠে।

কি একটা দুর্বার লোভ তার মনে জাগে। এগিয়ে যাবার লোভ। জয় করার নেশা।

তারানাথ বলে,

—এও দেখতে হবে পানু। ঘরের বৌ, মেয়ে, ঘরের লক্ষ্মীকেও পথে বের হতে হয়েছে। অন্যায় এত বড় হয়ে উঠেছে চারিদিকে।

প্রাণগোপাল হাসে।

—ওরা বলে, এ নাকি বেহিসেবী উন্মাদনা।

তারানাথ মাথা নাড়েন। বৃদ্ধের কাছে আজ এই বহিঃপ্রকাশকে স্বাভাবিক সত্য বলেই মনে হয়।

—তা নয় পানু। এরও দরকার আছে। নীলাকে প্রথম প্রথম বাধা দিতাম। কিন্তু জীবনে ওদের কি ভবিষ্যৎ বলো?

—বর্তমানটাই ওদের কাছে সবচেয়ে সত্যি। সেইটাই কেবল জ্বালা আর বঞ্চনায় ভরা। তিনমাস মাইনে পায় নি শুনলাম। সে টাকা নিয়েছে অন্যজন। তারা আবার ওদের উল্টে শাসায়। মেয়েদের ইজ্জৎ নিয়ে তারা বিকিকিনি শুরু করেছে—ছিঃ ছিঃ।

তারানাথ চুপ করে গেল।

রাগে উত্তেজনায় বুড়ো হাঁপাচ্ছে। বলে চলেছে বৃদ্ধ।

—বাঁচতে আর সাধ নেই পানু, এতদিন যে সমাজ, যে মানুষগুলোকে দেখেছি, এরা তাদের তুলনায় অমানুষ। দেবতায় বিশ্বাস করাটা মানুষের স্থিরচিত্ততার লক্ষণ। একটা কিছু আদর্শকে

বিশ্বাস না করলে সে বাঁচবে কি নিয়ে বলতে পারো ? তার কাছে বাবা-মা, সমাজ সামগ্রিক কল্যাণ সব মিছে হয়ে যায়। চেনে সে একমাত্র টাকাকেই। সেইটাই তার জীবনে একমাত্র মূল মন্ত্র হয়ে ওঠে।

প্রাণগোপাল ওর কথাগুলো শুনছে। কোথাও একটা শূন্যতা রয়ে গেছে তার মনে। নিদারুণ একটা শূন্যতা। তাই এত জ্বালা, অপমান সয়েও সে চুপ করে আছে।

কিসের ভয় তা জানে না। ভয় তার নেই।

ওই আদর্শের কথা। তার মনের সবটাই হতাশায় ভরে উঠেছে। তাই শূন্য মন নিয়ে সে জড়ের মত বেঁচে আছে। দেবতাকে সেও বিশ্বাস করে না।

বিশ্বাস করতে পারে না মানুষকেও। কারোও কাছে তার বিন্দুমাত্র পাওয়ার আশা নেই। পায়নি কিছুই।

তারানাথ বলে,

—এরা ভালোবাসতেও জানে না। ভালোবাসার অর্থ বুঝবে কি করে ? টাকা দিয়ে সব কেনা যায় ভাবে, তাই কাঁচ নিয়ে খুশী থাকে। আর ঠকে বার বার। ততই ভুলতে চায় টাকার পাহাড় জমিয়ে।

বাইরে কাদের গলার শব্দ শোনা যায়। এক ঝলক টর্চের আলো সামনের বাঁশবনের সবুজ আঁধারে ঝক ঝক করে ওঠে।

নীলারা ফিরছে।

রমা আরও কারা গিয়েছিল বোধহয়।

—দাদু ! এবার দেখবে কি হয় ? চাকা নড়বে এইবার দেখে-নিও। শুধু আরও দু-একজন কাজের লোকের দরকার।

নীলা খুশী উছল মন নিয়ে ঢুকছে। সামনেই প্রাণগোপালকে দেখে বলে সে,

—তুমি ! কতক্ষণ এসেছো ?

—একটু আগে। তারপর সদরে কি হল?

নীলা সারাদিন ঘুরেছে এই রোদে গরমে। চেহারায় এসেছে ক্লান্ত একটা ভাব। তবু মনের সেই উছলতাটুকু হারায়নি। বলে,

—কাজ হয়েছে। তোমাকেও দরকার। এমনিভাবে এড়িয়ে থাকলে চলবে না।

প্রাণগোপাল হাসে। মলিন বিষণ্ণ সেই হাসি।

—আমায় আবার জড়ানো কেন?

নীলা মনের সত্যজাগর উষ্ণতা দিয়ে সে জীবনকে দেখেছে। তাই সব কিছুর মাঝেই সাড়া পেতে চায় সে।

চোখের সামনে দেখেছে বলহরিদের মত মানুষকে—বিনয়বাবুকে। এবার জবাব দিতে বাধ্য করাবে তারা। এই নতুন জাগরণের দিনে কিছু ভালো মানুষের দরকার। যারা উত্তেজনাটাকে সামলে ঠিক পথে নিয়ে যেতে পারবে।

নীলা বলে,

—একালে বাস করে একালের রাজনীতির নোংরামিকে এড়িয়ে চলতে পারো, কিন্তু জীবননীতি—সামাজিক চেতনাকে এড়িয়ে থাকতে পারো না। সেদিন দেশের জন্য সব দিতে পেরেছিলে—আজ স্বাধীনতা পাবার পর এমন বীতশ্রদ্ধ হলে কি করে বলতে পারো?

প্রাণগোপালের মনে ওরা প্রশ্নটাকে বার বার জাগাতে চায়। ওই সবকিছুকে এড়িয়ে থাকতে চায় প্রাণগোপাল।

—রাত হয়ে গেছে নীলা, তুমি ক্লান্ত। এখন খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করো, পরে কথা হবে।

নীলা দুচোখের তারায় কৌতুকের হাসির ঝিলিক তুলে বলে,

—এড়িয়ে যেতে চাও? বেশ—

রমাও গিয়েছিল তাদের সঙ্গে। তার অন্তরের সেই জ্বালাটা এখনও রয়েছে। সব হারিয়ে গেছে তার। আজ নীরোদের কাছ থেকে দূরে সরে এসে বার বার তার কথাই মনে পড়ে।

এককালে লোকটা ভালোছিল। ভালোবাসতো তাকে। কারখানার হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম—ওভারটাইম সেরে ফিরতো বাসায়। সামান্য সেই রোজগারেও রমা সুখী হয়েছিল।

কিন্তু কি দুর্বার নেশায় মেতে উঠলো সেই মানুষটা। বিনয়বাবু আর বলহরি সামন্তই তার সর্বনাশ করেছে। আজ সেও বের হয়েছিল ওদের সঙ্গে, তার মনের জ্বালা জানাতে।

পথের মাঝে দেখে প্রাণগোপালকে।

রমা একাই যাচ্ছিল, ওকে দেখে দাঁড়ালো!

—পানুদা!

—প্রাণগোপাল ওকে দেখছে। এমনি কত সন্ধ্যায় ওকে দেখেছে। দুজনে দুজনকে চিনেছে। আজ সব কিছু অর্থহীন হয়ে গেছে।

—ফিরছো বুঝি? তুমিও গিয়েছিলে ওদের সঙ্গে?

রমা ওর দিকে চাইল। তার মনে সেই পুঞ্জীভূত প্রতিবাদের জ্বালা ফুটে ওঠে। দুচোখের চাইনিতে জানায়।

—হাঁ। ওই বলহরি, বিনয়বাবুদের সহ্য করতে পারছি না।

প্রাণগোপাল ওর দিকে চাইল। ও জানে রমার জীবনের সেই বিরাট আঘাত আর বেদনাকে। একই ঝড়ের আঘাতে ওরা সবাই ছিটকে পড়েছে। রমা বলে,

—আর তো পথ দেখি না।

প্রাণগোপাল চুপ করে কি ভাবছে। পথের সন্ধান তারও হারিয়ে গেছে। একটা ঝড় উঠেছে এইবার ধীরে ধীরে। মনে হয় কি দৃপ্ত তেজে ফেটে পড়বে প্রাণগোপাল।

বারুদের স্তূপ জমেছে তার অন্তরে। একটি মাত্র স্ফুলিঙ্গের প্রত্যাশায় সেই স্তূপ স্তব্ধ হয়ে আছে। প্রাণগোপাল বলে,

—বাড়ি অবধি এগিয়ে দিতে হবে?

হাসে রমা। —কার বৌ তা জানো তো? ভয় বস্তুটা আমার নেই।

প্রাণগোপাল ওর দিকে চেয়ে থাকে। আগেকার কত ফুলগন্ধময় সন্ধ্যায় দেখা সেই মেয়েটির এতটুকু অবশেষ এখনও ওর হাসি ওই চাহনিতে লেগে আছে। কোথাও একটু এখনও বদলায়নি।

দীঘির বুক থেকে জলো হাওয়া আসে। শীতের পর নতুন পদ্মফুল ফুটেছে। একটা পাখী ডাকছে। ডাঙ্গার দিক থেকে ভেসে আসে বনতিতিরের কান্না। আজকের সমস্যাজর্জর জীবন থেকে পিছনের সেই সুন্দর দিনের ছবি দেখে প্রাণগোপাল।

আজ থেকে বেশ কয়েক বৎসর পিছনে ফিরে গেছে। সেই ব্যাকুলতার আভাষ সারা মনে।

—রমা!

রমা চমকে ওঠে ওই ডাক শুনে। অনেক দিন পেরিয়ে তারা ফিরে গেছে অতীতের এমনি একটা সন্ধ্যায়। রমাও আজ সেই স্মৃতি ভোলেনি। সব হারানোর বেদনার অতলে সেই স্বপ্ন মনে জেগে ওঠে।

রমা চুপ করে থাকে।

আজকের ব্যর্থ জীবনে ওই ডাক কি দুর্বার কান্নার জোয়ার আনে। প্রাণগোপাল বলে চলেছে।

—এমনি করে সব কিছু বদলে যাবে তা জানতাম না। সব হারিয়ে এমনি নিছক হতাশার বোঝা বয়ে বেড়ানোর মত দুঃখ আর নেই। মনে হয় আমিও আগেকার মত আবার জ্বলে উঠি। কিন্তু! থামলো প্রাণগোপাল।

রমা ওর কথাগুলো শুনছে। বলে সে,

—এছাড়া পথ কই বলো? আমারও তো সব গেছে। তবু

আজও বাঁচতে চাই। কি নিয়ে বাঁচবো বলতে পারো? চারিদিকে অমনি অন্ধকার, পথ কোথাও নেই।

ওরা সবাই যেন অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। ভালোবাসার স্বপ্ন সঞ্চয়ও আজ নেই। আছে শুধু স্মৃতি আর বেদনা।

বুড়ি তখনও গজগজ করছে। সব রাগ পড়েছে এইবার রমার উপরই। সব ছেড়ে মেয়ে এসে পড়ল কিনা তার ঘাড়ে। এত তেজ, দেমাক কিসের তা জানে না সে। নিজে সামান্য কুড়িটাকা করে দান পায় সরকার থেকে। কেউ নেই—জমি-জারাত নেই। সব গেছে। তাই এই দয়া। ওরা সেই অগ্নিমন্ত্রের পূজারী বিষ্টুপদর মাকে এইটুকু দয়া করেছে।

বিনয়বাবুকে ধরে এটুকু হয়েছিল। ক'দিন টাকা আসেনি। ব্রাঞ্চ পোষ্টাপিসে গিয়ে ধর্ণা দিয়েছে মনি অর্ডার এসেছে কিনা জানতে।

সেখানে ওসব কিছু আসেনি।

রমার মায়ের মেজাজ সপ্তমে ওঠে। শীর্ণ বেঁটে খাটো মানুষটি। পোষ্টমাষ্টার নাকু দত্ত বেশ একচোট গালিগালাজ দিয়ে পোষ্টাপিস-ওয়ালাদের অনেকেরই উদ্দেশ্যে বলে,

—তোদের কি জ্ঞান আক্কেল নাই? তোদের মাগদের রাঁড়ি করি, তখন বুঝবে জ্বালা। একদিনের টাকা সাতদিনে আসে না? মাগ মেয়েদের পিছনে খর্চা হচ্ছে। ওরে বিষ্টুরে দেখে যা বাবা। তোর মায়ের দুর্দশা দ্যাখ একবার।

সেখান থেকে নাকুমাষ্টারই বলে—বিনয়বাবুর ওখানে যাও। ওদের রিপোর্ট গেছে কি না শুধোওগে পিসী।

কোন রকমে নাকুমাষ্টার ওকে সরাতে পারলে বাঁচে।

বুড়ি ওখানে যেতেই গঙ্গাধরের সঙ্গে দেখা। গঙ্গাধর বোর্ডের

কেরাণী, আর বিনয়বাবুরও বাহন। প্রসেশনে সে দেখেছিল রমাকে। ওদের এই লাফালাফি তার মোটেই ভালো লাগেনি। তাই রমাকেও ওদের সঙ্গে দেখে রেগেই ছিল।

বুড়িকে আসতে দেখে গঙ্গাধর ফোঁস করে ওঠে।

—এ্যাই যে। পেনসন্ বন্ধ হয়ে যাবে এইবার। খুব বেড়েছো। দেখলাম রমাকে—সেও ওই ইনকিলাবের দলে ভিড়েছে। বেশতো খাটিয়ে মেয়ে ঘরে এনেছো, আবার ভাবনা কি? পেনসন নিতে এসেছো এখানে?

বুড়ি এইবার ব্যাপারটা বুঝতে পারে। তাহলে গঙ্গাধরই কল টিপেছে। বুড়ি জ্যা মুক্ত ধনুকের মত দেহখানাকে টানটান করে রুখে দাঁড়ায়।

—কি বললি গঙ্গাধর? পেনসিল কি তোর বাপ দেয় যে বাগড়া দিবি? রাঁঢ়ী মানুষ। আমি কি গেছি ওই দলে যে আমার ভাত মারবি? তোর মাগ রাঁঢ় হোক তবে বুঝবি পেনসিল খাওয়ার কত মজা! যদি বিষ্টে থাকতো—তোর মাথাটা ছাতু করে দিতো। আজ সব গেছে তাই ব্যাংএও লাথি মারতে আসে। হেঁই ঠাকঁর!

গঙ্গাধর অবশ্য কথাটা এমনিই বলেছিল। কিন্তু তা নিয়ে এত ভাগবত পাঠ হবে তা জানতো না।

লোক জমে যায়। বুড়ি তখনও গঙ্গাধরকে ঝুড়ছে।

—গাঁয়ে গাঁয়ে ফিরতিস লোককে ধাপ্পা দিয়ে। জল এনে দোব মানসিক করো। ঘটকালী করতে গিয়ে সেবার মার খেয়েছিলি বেদম, তাও মনে নেই? স্বদেশী আমলে পুলিশের কাছে চুকলি খেয়েছিস, আজ হয়েছিস এলাকার মেম্বর। ঝাঁটা মারি তোর মুখে, তোর মাগকে রাঁঢ় করি—ওলাওঠায় যা, শোকা তাপা মানুষকে দুঃখ দিস!

ব্যাপারটা তখনকার মত চাপা দিতে পারলে বাঁচে গঙ্গাধর। তাই শোনায়—

—ঠিক আছে। কথাটা আর সবাই বলছিল। আমি কি তা করতে পারি জেঠিমা। তুমি যাও। আমি কাল সদরে গিয়ে খোঁজ নেবো।

বুড়ি আপাতত চুপ করে। তবু মন মানে না। সারাটা দিন তার অশান্তিতে কেটেছে। এদিকে আফিমও নেই।

পয়সা অভাবে আফিমও কিনতে পারেনি। ভাত একদিন তার নাহলে চলে, কিন্তু ওটা চাই। কত্তা বেঁচে থাকতে আফিমের সঙ্গে ঘন আওটানো তুধও খানিকটা থাকতো। কিন্তু এখন হয়েছে

খুতুর দোকান থেকে আফিমের শুকনো ফলের খোসা ওই ঢেঁড়ি কিনে এনেছে। তাই সেদ্ধ করে জলটা খেয়ে আপাততঃ থাকতে হবে। গজ গজ করছে বুড়ি।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এখনও রমা ফেরেনি। মেয়ে যেন কি? দেখেও দেখে না এসব। বলে উপোস দোব তবু যাবো না ওখানে।

রমা ফিরছে। রাতের অন্ধকারে তুএকটা তারা জ্বলে। ওর মনে আজ ক্ষণিকের জন্য বিচিত্র সুর জাগে। হঠাৎ ফেলে যাওয়া সেই জীবনকে চকিতের জন্য সব মাধুর্য নিয়ে দেখেছে।

মনে পড়ে নীরোদের কথা। তার আগেকার সেই কৈশোরের দিনে প্রাণগোপালের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মেশার তাৎপর্য খুঁজে পায়নি। হয়তো মনে তখন সেটা রেখাপাত করেনি।

আজ সব হারিয়ে সেই দিনগুলোর সন্ধান করে। প্রাণগোপালও এত বছর পর একজায়গায় যেন বদলায়নি। কেমন শূন্য ব্যর্থই রয়ে গেছে।

তাই এই ব্যাকুলতা। জীবনে কি পেয়েছে! নিঃস্ব—ব্যর্থ তারা তুজনেই।

— এই যে এলেন রাজকার্য সেরে ?

মা ওকে দেখে ফোঁস করে ওঠে। বুড়ির মুখ থেকে তোড় বের হয়।

—বলি, এই সব করবার জন্যেই কি সোয়ামীর ঘর ছেড়ে এসেছিস ? লাজ লজ্জা নাই তুর ? গলায় দড়ি জোটে না ?

রমা হাসছে।

—এইবার দোব। তোমার কথাতেই দোব। এ্যাদ্দিন দিই নি।

—গঙ্গাধর বলে কিনা, পেনসিল বন্ধ করে দেবে। তুর জন্যেই!

- তাই নাকি। হাসছে রমা।

—হাসছিস লো তুই ? হাসি আসে ?

রমা বলে—তাহবে না। এই নাও—

সহর থেকে মায়ের জন্যে বেশ খানিকটা আফিম এনেছে। বুড়ি আফিম দেখে খুশী হয়। তার বকুনিও থেমে গেছে তখুনিই।

—আঃ বাঁচলাম বাছা! ঢেঁড়ি সেদ্ধ জলে কি আশ মেটে! নে, হাত মুখ ধুয়ে নে, পেনসিল বন্ধ করবে গঙ্গাধর, ভারি সাধ্যি কিনা।

প্রাণগোপালের কানেও কথাটা যায়। সে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। বুড়ির ওই রাগ একনিমেষেই জল হয়ে যায়। রমা জানে মাকে শান্ত করার উপায়।...ওকে কেউ বড় একটা চটায় না। বুড়ি দরকার হলে সদরে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের গিন্নীকেই দু দশকথা শুনিয়ে দিয়ে আসবে ; তাই স্বয়ং ডি. এম. অবধি তাকে চেনেন।

তবু গঙ্গাধরের এই কথাটা শুনে অবাক হয়েছে। ওদের সামান্য স্বার্থে ঘা দিলে ওরা ছেড়ে কথা বলবে না। বিনয়বাবুর কানেও গঙ্গাধর কথাটা তুলবে। হয়তো বিপদে ফেলবে অসহায় এই বুড়িকে।

প্রাণগোপাল আর ভিতরে গেল না। বাড়ির দিকে চলতে থাকে। অন্ধকার এই এলাকা। তু চারজন লোক ওই অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মত ফিরছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এখানে কেউ আসতো না।

সন্ধ্যায় ভাঙ্গা মন্দিরের কাঁসর ঘণ্টার শব্দ স্তব্ধ হয়ে যেতো। প্রাণহীন এই রাজ্য অতীতেব আঁধারে হারিয়ে যেতো। বাতাসে জেগে থাকে বৃদ্ধ বকুল গাছের ফুলগুলোর মিষ্টি সুবাস। পাঁচীল ভাঙ্গা বাগানে এখনও তুচারটে গন্ধরাজ, একটা কনকচাঁপা গাছ আরও কি সব ফুলের গাছ টিকে আছে।

তাদের মিষ্টি সুবাসে এই জায়গাটা ভরে থাকে। আজ থমকে দাঁড়াল প্রাণগোপাল।

ওদের ফিস্ ফিস্ কথা শোনা যায় অন্ধকারে। বাতাসে ওঠে তীব্র একটু বদগন্ধ।···সেই ফুলের মিষ্টি সুবাস কোথায় চাপা পড়ে গেছে।

বলহরি সামন্ত এখানেই দখল নিয়ে নতুন করে চোলাই-এর ভাটিখানা খুলেছে। ওদের মত্তপ কণ্ঠের হাসির শব্দ শোনা যায়। কে ভাঙ্গা গলায় হিন্দী গান গাইছে।

জায়গাটাকে বিকৃত কুৎসিত করে তুলেছে। একালের সব বিষক্ষত এসে হাজির হয়েছে এই অতীতের স্বপ্নজাগর একটি ঠাঁই এ। প্রাণগোপাল বিরক্ত হয়।

···তার ঘরের ওপাশ থেকেই সীমানা। বাধা দেবারও কেউ নেই, তাই সে সীমানা নিজের খেয়ালেই বাড়িয়ে নিয়েছে ওরা। প্রতিবাদ করতে পারেনি প্রাণগোপাল। ওরা উড়িয়ে দিয়েছে তার কথা।

নরককুণ্ডে পরিণত করেছে তার এই শান্ত আশ্রয়টুকু। ললিতা মাসীও বার বার বলেছে তাকে। প্রাণগোপাল চুপ করেছিল এতদিন। আজ সামনে তার অনেক প্রশ্ন। প্রাণগোপাল কঠিন হয়ে উঠছে।

এমন করে জীবনের সব চাওয়া পাওয়া এড়িয়ে মুখ বুজে বাঁচা যায় না। নীলার হুচোখে সে দেখেছিল জীবনের সেই আহ্বান। তার হাসিভরা সুন্দর মুখখানা ওর মনে চকিতের জন্য ভুলে যাওয়া সেই স্বপ্নকে মনে পড়িয়েছিল।

কেমন বদলে গেছে সে। নতুন চোখে দেখেছে নীলাকে। তার অন্তরের সেই শুকিয়ে যাওয়া উৎসকে যেন প্রাণবন্ত করে তুলেছে ওই মেয়েটি, তার কৈশরের সঙ্গী।

হঠাৎ আবছা অন্ধকারে কাকে দেখে একটু অবাক হয়। পুরোনো ভাঙ্গা বাড়ির সামনে বকুল গাছটার নীচে জমাট বাঁধা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে একটি বৌ।

—কে?

প্রাণগোপাল ডাকছে। কোন সাড়া নেই।···কি কৌতুহল-বশে এগিয়ে যায় প্রাণগোপাল। জোনাকির আলোয় হঠাৎ এক নজরেই চিনতে পারে তাকে।

—বীণা! একি সাজ বেশ তোর?

বীণা ধরা পড়ে গিয়েছে। আজ সে স্বাধীন হয়ে উঠেছে। দাদার অভাবের সংসারে সে বোঝা হয়ে নেই। বিয়েথাও দিতে পারেনি অনাদি। খেতে পরতে দিতে যার সাধ্য নেই সে আবার বিয়ে দেবে কি করে।

বীণা বলে,

—হ্যাঁ। বিয়ে করিনি। তবে বৌ সাজতে হয়। ঘোমটা দিয়ে মালপত্র পাচার করা অনেক সোজা। ভেক নিতে হয় বৈকি।

প্রাণগোপাল ওর দিকে চেয়ে থাকে। সেই মেয়েটার চোখে মুখে কথা বের হয়েছে। নিটোল পুরুষ্ট দেহে এসেছে যৌবনের মদির লাস্য। বীণার কথাবার্তার ছন্দে নিটোল বুক কাঁপছে। হাসতে হাসতে বলে,

—সত্যি সত্যি যখন হল না কিছু, মিথ্যে সেজে তবু আশা মেটানো যাক্। কি বলো ছোটবাবু? কই গো হল?

ওদিকে একটা গাড়িতে বিছানা বাক্স উঠছে। সঙ্গে রয়েছে দক্ষিণপাড়ার গুপীনাথ। লোকটাও এ দলে ভিড়েছে। ধুতি পাঞ্জাবী পরে দুজনে কর্তাগিন্নীর অভিনয় করে যাবে। কে জানে এই খেলা কতদূর এগিয়েছে।

বীনা যেন নেশায় মেতে উঠেছে। এ এক দুর্বার নেশায় ডুবে গেছে ওরা। ব্যর্থ জীবনের সব শূন্যতাকে গরল দিয়েই পূর্ণ করে নিয়েছে। তার জন্য এতটুকু ক্ষোভ নেই। এইটাকেই ওরা জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া হিসাবেই দেখেছে।

বীণা বলে গলা নামিয়ে,

—সরে যাও ছোটবাবু, এসময় মালপত্র চালান যাচ্ছে বেটাদের, যদি পথে কোন বিপদ আপদ হয় ওরা তোমাকেও ছেড়ে কথা কইবে না। ওরা সব পারে।

প্রাণগোপাল অবাক হয়।

—জেনে শুনেও এই সব কাজে নেমেছিস?

হাসছে বীণা—এছাড়া পথ পেলাম কই গো? রূপ যৌবন—ভাল বাসা সবই ছিল, কিন্তু কাজে লাগলো কই? ঘরও হোল না—তাই পথেই নেমেছি। বাঁচতে হবে যে। মাষ্টারীর চেষ্টা করছিল গুপী, সেও কাজ না পেয়ে এই পথেই এসেছে, খাবে কি?

প্রাণগোপাল চমকে ওঠে—তাই নাকি! মরতে পারল না সে? তার মত ছেলে কিনা শেষকালে এই পথে এলো!

বীণার দুচোখ ছলছল করে ওঠে। ওপাশে ছই দেওয়া গাড়িতে মাল তোলা হয়ে গেছে। হঠাৎ অন্ধকারে ওপাশে প্রাণগোপালের ছায়া মূর্তিটা দেখে বলহরি চমকে ওঠে।

—কে! কে ওখানে? ছাখতো ভজা—ব্যাটা টিকটিকি নাকি?

ধরতে পারলে—সাবড়ে দিবি একেবারে !

প্রাণগোপাল দেখে বীণার মুখে চোখে ভয়ের চিহ্ন। প্রাণগোপাল সরে গেল। ওরা তখনও হন্যে কুকুরের মত খুঁজছে। বীণাই বলে,

—কে আবার থাকবে ওখানে ? আমিই দাঁড়িয়ে রইছি।

—অঃ! বলহরির সন্দেহ ঘোচে না। বলে—সাবধানে যাবি, ওঠ গুপীনাথ গাড়িতে।

বীণাও গিয়ে গাড়িতে উঠল।

প্রাণগোপাল অবাক হয়েছে। নিজের বাড়িতেও আজ তাকে থাকতে হবে চোরের মত। এই নোংরামি—ওই শয়তানির বিরুদ্ধে কোন কথাই বলতে পাবে না ?

রাত হয়ে গেছে, নিঝঝুম রাত্রি। প্রাণগোপালের ঘুম আসেনি। কি ভেবে বাইরে ওই দিঘীর পাড়ে এসে দাঁড়ালো। দূর আকাশের বুকে দিগন্তরে পড়েছে দুর্গাপুরের আলোর আভা।···শান্ত জন পদে ওরই উত্তপ্ত জ্বালা বিছিয়ে পড়েছে।

বাতাসে কোথায় পদ্মফুলের সুরভি জাগে। হঠাৎ সামনেই জলের উপর উঁচু পাড়টায় কাকে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে যায় প্রাণগোপাল। উঁচু পাড়ের নীচেই দীঘির জল, জল ওখানে বেশ গভীর।

—কে! মনুদা! ওখানে ?

···তারার আলোয় দেখা যায় ওর জীর্ণ রুক্ষ মূর্তিটা। অন্ধ দুচোখের কোলে জলধারা। ঠোঁট দুটো কাঁপছে। প্রাণগোপাল ওর হাতটা ধরেছে।

—সরে এস, পড়লেই দিঘীর জলে তলিয়ে যাবে।

কান্না ভেজা গলায় মনু বলে—তারই জন্যে তো এসেছিলাম ভাই!

—সেকি। এত কষ্ট সয়েছ—

—আর পারছি না ভাই।...সব আমার মিছে হয়ে গেল। নিশিও মুখ পুড়িয়ে দিয়ে গেল। তোমরাও কি সুখে আছো তাও জানি। দুনিয়ায় বাঁচার আলো কোথায়? বাঁচবো কেনে? গায়েন নাই—গায়েন, আমার ফুরিয়ে গেছে পানু ভাই। তাই ছুটি নিতে এসেছি চিরকালের জন্মে।

...ওর সারামনে হতাশার জ্বালা। প্রাণগোপাল ও কোন পথ দেখাতে পারেনি, কোন আশা দিতে পারেনি। অন্ধ মনু বলে,

—খিদের জ্বালা সইতে পারি ভাই, কিন্তু বুকের জ্বালা! ও যে বুকটাকে পুড়িয়ে আংরা করে দেয়।

—তবু বাঁচতে হবে।মনুদা। দেখো, দিন বদলাবেই, মানুষ এখনও মরেনি। সবাই জানোয়ার হয়ে ওঠেনি। তুমি সেই দিন বদলের পালায় আবার নতুন গান গাইবে।

মনু ওর দিকে চেয়ে আছে। ওর সব হারানো মনে আবার আশ্বাস আসে।

—সত্যি! সত্যি বলছো পানু ভাই? আবার দিন বদলাবে, —মানুষ দুঃখ ভুলবে?

—হ্যাঁ! সেই দিন বদলের পালায় আমরাও বাঁচতে চাই মনুদা। তুমি—আমি।

—বিষ্টু! বিষ্টু ফিরে আসবে তো?

অন্ধ মনু সেই বিষ্টু পদকে ভোলেনি। ও তার কাছে যৌবনের প্রতীক। অন্ধকারে ওরা কি আশ্বাস খোঁজে।

রাতের অন্ধকারে গরুর গাড়িটা বলহরির মাল নিয়ে চলেছে। ভেতরে বসে আছে বীণা আর গুপীনাথ। এই দায়িত্ব আর বিপদের মাঝেও কেমন সহজ হয়ে উঠেছে তারা।

—বীণার দেহটা গুপীনাথের গায়ে,...কি আবেশে ওরা দুজনে যেন হারিয়ে গেছে। দুটি ব্যর্থ জীবন দুজনের মাঝে যেন কি নির্ভর খুঁজছে।

গুপীনাথ বলে—এভাবে চলে না বীণা। এই নোংরা কাজে থেকে মনও নোংরা হয়ে যায়। মনে হয় সারা জীবন বুঝি এই কাজই করতে হবে। এর থেকে বাঁচার কোনও পথ নেই ?

বীণা চুপ করে ওর দিকে চেয়ে থাকে।

বনের স্তব্ধতার মাঝে ভিজে বাতাসে ভেসে আসে কুর্চফুলের উদগ্র সুবাস। আকাশমণি ফুলের গন্ধ মিশেছে তাতে।

দুএকটা রাতজাগা পাখী ডেকে উঠে আবার থেমে যায়। বীণাও পথ পায়নি, গুপীনাথের মাঝে তবু সে যেন আশ্রয় খোঁজে।

—চেষ্টা করো। আমারও কিছু জমেছে—আর কিছু টাকা হলে দুজনে কোথাও সহরে গিয়ে একটা দোকানই দেওয়া যাবে। দুজনের চেষ্টায় কোন রকমে দিন ঠিকই চলে যাবে।

শেষ রাত। তখনও ভোরের আলো ফোটেনি। পাখীগুলোর ঘুম ভাঙ্গেনি। এক ফালি চাঁদের কুয়াসাভিজে আলো পড়েছে রাস্তায়। বনের গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে ঢলে পড়া চাঁদের ম্লান আলোয় বনভূমি ওদের ব্যর্থজীবনের মতই সকরুণ হয়ে উঠেছে।

দুজনে তবু নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে।

হঠাৎ কলরব ওঠে। জিপ গাড়িখানা এসে সামনেই দাঁড়িয়েছে। লাফ দিয়ে তার থেকে ক'জন নেমে পড়ে গাড়িখানাকে ঘিরে ফেলে। গাড়োয়ান কিছু বলবার আগেই ওরা তাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলে মালপত্র গাড়ি থেকে টেনে নামাতে থাকে।

এতক্ষণ গুপীনাথ কি অন্য জগতের স্বপ্ন দেখছিল। মালের বাক্স নামাতে দেখে সে বাধা দেবার চেষ্টা করতেই একজন খাকি পোষাক পরা লোক এগিয়ে আসে।

চমকে ওঠে গুপীনাথ। বোধ হয় আবগারী পুলিশের লোকই ওরা। এতদিন ওদের নজর এড়িয়ে এইসব কাজ কারবার চালাচ্ছিল। আজ হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে।

—ওটা কে ?

গুপীনাথ ঘোমটাপরা বীণাকে দেখিয়ে বলে থতমত খেয়ে।

—মানে!

—বেড়ে কারবার চালিয়েছে দেখছি বলহরি?

চুপ করে ভয়ে কাঁপছে গুপীনাথ। বীণাও এমন ঘটনার জন্য তৈরী ছিল না।...একাজে এতদিন নেমেছে। এমনি হাতে নাতে ধরা পড়েনি। দুএকবার এমন বিপদে পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে।

বলহরিও বলে—মাল যায় যাক্, ধরা দিবি না। খবরদার।

আজ তাই ঘটে গেল।...কাঁপছে তারা দুজনে।

ওরা মালপত্র তুলে বাকী সব ছত্রাকার করে ছিটিয়ে বের হয়ে গেল। যাবার সময় বলে ওদের একজন,—বলহরিকে বলিস, তাকে এইবার দেখবো একহাত।

ওরা চলে গেছে।

গাড়োয়ানটা চীৎকার করছে।

—খুলে দাও গো গুপী, জাড়ে যে কালিয়ে গেলাম। বাপরে ইকাজে এমনি হাঙ্গামা জানলে কে আসতো গো। ডাকাত পড়েছিল যে!

ওদের গ্রামে ফিরতে বেলা পড়ে যায়। বলহরি কথাগুলো শুনে চমকে ওঠে মনে মনে। নীরোদের দলবলের কথাই মনে হয়। ওকে তারাও শাসিয়েছিল। একদিন বলহরি তাদের পিছনে লেগেছিল। আজ তাই তারা শোধ তুলছে। ভয় হয় মনে মনে—ওরা তাকে বিপদেই ফেলবে। তারই সূত্রপাত করেছে ওই নীরোদ কেষ্টার দল। তবু বলহরি গুপীকে ধমকায়।

—মিছে কথা! জিব টেনে ছিঁড়ে দোব কুত্তা কোথাকার? হাজার টাকা লোকসান—

উঠে গিয়ে ওর পেটেই এক লাথি মারে সটান।

যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠে গুপী।

বীণাও এই দৃশ্য দেখে চমকে ওঠে। বলহরির অনেক কাজই করেছে তারা। তার বদলে বলহরি তাদের এমনি চোখে দেখবে তা ভাবেনি। গুপীনাথের যন্ত্রণাটা তার বুকেও বাজে।

বীণা চটে ওঠে।

—ওকে মারবা নাই সামন্তমশায়। ও মিছে কথা বলেনি।

বলহরি গর্জে ওঠে।

—থাম তুই, লষ্টা ছিনেল মাগী কোথাকার। আবার সতীপনা কলাতে এসেছিস! তুজনে তোদের সড় করে মাল লুকিয়ে বিক্রী করেছিস—বল কোথায় সেই টাকা?

বীণা অবাক হয়ে যায়।

তার মুখে চোখে রাগ আর অপমানের কালো ছায়া ফুটে ওঠে। জবাব দেয়,

—তুমি অমানুষ সামন্তমশায়। ওখানে কথা বল্লে সেই বনের মধ্যে তারা শেষ করে দিতো।

—মরতিস!

বীণা জ্বালাভরা কণ্ঠে শোনায়,

—তাহলেই তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হতো—না? সবই তো নিয়েছো। মান ইজ্জৎ সবকিছু। বাকী ছিল এই প্রাণটা, তাও নিয়ে খুশী হতে চাও?

প্রাণগোপাল রাতের অন্ধকারে ওপাশের পড়োবাড়ির অন্ধকার থেকে এতক্ষণ একটা তর্জন গর্জন মারধোরের শব্দ শুনছিল। বলহরি সামন্ত গর্জাচ্ছে।

তার ঘুম ভেঙে গেছে। জানলা দিয়ে চেয়ে দেখবার চেষ্টা করে।

হঠাৎ মেয়েছেলের কণ্ঠস্বর শুনে অবাক হয়েছে সে। কাঁদছে বীণা। তার গলা সে চেনে।

রাতের অন্ধকারে এখানে এই শান্ত পরিবেশে অনেক যন্ত্রনার কান্না, বিকৃত মত্তপ হাসির বিশ্রী শব্দ ওঠে। চুপ করে সহ্য করে যায় প্রাণগোপাল।

দেবস্থানকে কলুষিত করেছে তারা। গ্রামের স্নিগ্ধ শ্যামশ্রীকে বিষিয়ে তুলেছে ওদের লোভ লালসা আর অত্যাচার। আজ বীণার কান্না শুনে প্রাণগোপাল চমকে উঠেছে।

ওর তীব্র কণ্ঠের অভিযোগগুলো শুনেছে সে। কোন প্রতিকার করার সাধ্য আজ তার নেই। পারেনি ওই পাপকে ধ্বংস করতে। তবু দেহের শিরায় শিরায় আজও উত্তপ্ত রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়ে ওঠে।

নেমে আসে প্রাণগোপাল। দাঁড়াল অন্ধকারে। বীণার কান্না ভেজা কণ্ঠস্বর যেন ঘৃণায় হতাশায় ভরে উঠেছে। সে বলে চলেছে।

—এর নাম বেঁচে থাকা? তিলে তিলে ধুঁকে ধুঁকে ক্ষয় রোগীর মত বাঁচতে চাই না সামন্তমশায়। তুমিই বরং এই বাঁচার হাত থেকে মুক্তি দাও। যা বলবে তাই মানবো, তুমি আমাদের শেষ করে দাও। কোথাও বাঁচার পথ পাইনি, এবার তাই মরেই বাঁচতে চাই!

জল এতদূর গড়াবে সামন্তমশাই তা ভাবেনি।

গুপীনাথ বীণার ফুঁপিয়ে কান্নার কাঁপুনি ভরা দেহটার দিকে চেয়ে আছে কি ব্যথা নিয়ে।

বীণা দেখল ওই কঠিন লোকটাকে।

ওর মনে দয়া মায়া নেই। বেশ জেনেছে এবার আর সে ওকে নিষ্কৃতি দেবে না। দরকার হলে বিনা কারণেই গুপীনাথকে শেষ করে গায়েব করে দেবে। এর আগে একাজ করেছে সে। তাই ভয় পায় বীণা।

গুপীনাথও ভয়ে চুপ করে গেছে।

বলহরি গর্জন করে।

—কাল সকালে বাড়িতে দেখা করবি গুপে।

গুপীনাথ বের হয়ে আসছে।

বীণাও দাঁড়াল না। এখানে এক মূহূর্তও থাকতে চায় না সে। বীণাও বের হয়ে গেল।

বলহরি গর্জাচ্ছে।

—পিরীতি! সব ঠাণ্ডা করে দোবো। ভজা নজর রাখবি একটু। দুটোতে নির্ঘাৎ কিছু করেছে। আমার সঙ্গে চালাকি?

প্রাণগোপাল চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। অন্ধকারে দুটো ছায়া মূর্তি বের হয়ে এল ওই আঁধার ঘেরা ধ্বংসস্তূপ থেকে। গুপীনাথ তখনও চুপ করে চলেছে।

—দাঁড়াও।

বীণা এগিয়ে ওর হাতখানা চেপে ধরলো।

দীঘির জলে শেষ চাঁদের আলো পড়েছে। তারই আভা ওদের দু'জনের মুখে। বীণার মুখে চোখে কাঠিন্য ফুটে ওঠে।

—তুমি আর এ কাজে যাবে না। কখনো না?

গুপীনাথের কণ্ঠে ভয়ের স্বর—কিন্তু ও দারুণ লোক।

—হোক। তবু ওকে জানাতে হবে ওর শাসন মানবো না। দরকার হয় ওকেও শিক্ষা দোব। কি আছে এখানে যে এমনি করে জানোয়ার হয়ে পড়ে থাকতে হবে! তার চেয়ে এখান থেকে চলেই যাবো ওর নাগালের বাইরে।

গুপীনাথ অবাক হয়।

—বীণা! কি বলছো তুমি?

—ঠিকই বলছি। এখনও কোথাও হয়তো মানুষ বাস করে।

এখান থেকে বাইরে গিয়ে তারই সন্ধান করবো। সব হারিয়ে এমনি করে মরতে পারবো না গুপী, মরতে চাই না।

গুপীনাথ কি ভাবছে। সেও আজ বাঁচতে চায় এখান থেকে মুক্ত পরিবেশের মধ্যে সরে গিয়ে।

প্রাণগোপাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ওদের কথাগুলো শুনছে।

মনে মনে তার চেতনাটা জেগে ওঠে। সেও নীরবে এই যন্ত্রণা সয়ে চলেছে জীবনের সব দাবীকে অস্বীকার করে।

সে প্রতিবাদ জানাতে পারেনি, ওরা পেরেছে।

অবাক হয় প্রাণগোপাল। ওরা গ্রামের দিকে গেল না। আবছা চাঁদের আলো ঢাকা প্রান্তরের মাঝ দিয়ে ওরা চলে গেল। হারিয়ে গেল তুজনে।

সবকিছুকে তারা অস্বীকার করে চলে গেল। ওদের চোখে এখনও বাঁচার স্বপ্ন—মনে রয়েছে নতুন জীবনের আশ্বাস। তাই বলহরি সামন্তকে আজ ওরা অগ্রাহ্য করে গেল।

যাক!

প্রাণগোপাল কি ভাবছে। তার মনের একটা নীরব তন্ত্রীতে কোথায় সাড়া জাগে। সে বেঁচে আছে কি না ঠিক বুঝতে পারে না।

বোধ হয় জড় একটা পদার্থের সঙ্গে তার মিল রয়েছে। নইলে এত সব কিছু শুধু দেখেই চুপ করে আছে কেন? ভালো মন্দ সব কিছুর বাইরে নির্লিপ্ত উদাসীন হতাশ্বাস একটি প্রাণীর টিকে থাকার কি সার্থকতা তা জানে না সে। আঘাতের পর আঘাত এসেছে তবু বিদ্রোহ করেনি। কত সইবে আর জানে না।

রাতে ভালো ঘুম হয়নি।

অনেক কথাই ভেবেছে প্রাণগোপাল। আগেকার সেই রঙ্গীন

স্বপ্নগুলো বার বার তার মনে এসেছে। একটি, ছুটি, অনেক মেয়েকেই দেখেছিল। বিশাখা, রমা, নীলা আরও অনেকের কথাই মনে পড়ে।

ওই বাগানের রৌদ্র স্নিগ্ধ ছায়ায় কতদিন নীলাকে দেখেছে। বিশাখাকে চিনেছে কত চাঁদনী রাতে, গলায় ওর ফুলের মালা। কপালে চন্দন ছাপ—ছুচোখের তারায় কি নিবিড় আহ্বান। ওর গানের স্থরে সন্ধ্যার অন্ধকার ভরে উঠতো।

রমার নিটোল যৌবনমদির দেহে দেখেছে কি লাস্য।

তিনটি মেয়ে তবু আলাদা ধরণের। নীলা ওকে মনের মত করে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। ও বলতো,

—তুমি পাশ করে কলেজে পড়বে। এম-এ পাশ করে প্রফেসর হবে।

নীলার ছুচোখে জাগতো নিজের জীবনকে স্থন্দর করে গড়ে তোলার স্বপ্ন। ভালোবাসার স্বপ্ন।

তার তুলনায় বিশাখা অন্য ধরণের। স্থন্দরকে ভালবাসে ওরা। সে ভালবাসায় কোন খাদ নেই। ওর জীবন ফুলের মতই নির্জনে ফোটে। রূপের জ্যোতি নিয়ে চেয়ে থাকে আনমনে পথিক ভ্রমরের পথ চেয়ে। ওরা দিয়ে নিঃশেষে বিলিয়েই স্থখী থাকতে চায়।

তাদের তুলনায় রমা যেন নদীর মত। ছুর্বার ওর প্রবাহে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়। ওরা ভাসে—আবার নতুন চরভূমিকে গড়ে তোলে সবুজ শস্য সম্পদে।

ওরা এসেছিল তার জীবনে, কিন্তু কিছুই কি চায়নি প্রাণ-গোপাল! সেইই নিতে পারেনি। সেদিন সময় ছিল না।

যেদিন সেই লগ্ন এল সেদিন দেখে চারিদিকের রূপ বদলে গেছে। অন্তহীন শূন্যতার অভিশাপে সব নিঃশেষ হয়ে গেছে। সেই চোখ তার নেই। চারিদিকে শুধু ক্ষয় আর যন্ত্রনা। তার মাঝে এতটুকু সান্ত্বনাও খোঁজেনি সে।

—এ্যাই! ওঠো!

হঠাৎ কার ডাকে ধড়মড় করে উঠে বসে প্রাণগোপাল।

সকালের এক ঝলক আলো এসে পড়েছে জানলা দিয়ে। বকুল অশত্থ গাছের উপর পড়েছে সেই আলোর ঝল্‌কানি।

—এখনও ঘুমুচ্ছো? ওঠো।

নীলা তাকে ডাকছে। প্রাণগোপাল হক্‌চকিয়ে গেছে।

—তুমি! হঠাৎ!

নীলা ওপাশের একটা টুল টেনে নিয়ে বসল। সদ্য স্নান সেরে এসেছে। মাথার একরাশ কোঁকড়ানো চুলে উঠছে মিষ্টি একটু সুবাস। সুন্দর ফর্সা মুখখানায়—নিটোল দুটো বাহুর লাবণ্য তখনও ফুরোয় নি। পাতলা ঠোঁটের উপর নাক যেন আলতো করে বসানো।

প্রথম যৌবনের শিহর ওর দেহে রেখে গেছে এখনও হারানো সেই মাদকতা।

নীলা বলে—কাজ তো কিছুই নেই, ঘুমেরও আর শেষ নেই। ঘুমোও কি করে এতো?

—একটু চায়ের ব্যবস্থা করি।

ললিতা নীচের একখানা ঘরে থাকে। সেই এখন দেখাশোনা করে প্রাণগোপালকে। ওইই চা করে এনেছে। প্রাণগোপাল নীলার দিকে এক কাপ চা এগিয়ে দিয়ে নিজেও চুমুক দিতে থাকে।

নীলা হাসছে।

—গোঁসাই বাড়ির ছেলে, প্রাতঃকৃত্য সন্ধ্যা আহ্নিক করা নেই, দিব্যি চা খাচ্ছো?

—দিন বদলে গেছে। নইলে তুমিই ছাখ না—এদ্দিনে কোথায় কোন স্বামীর ঘরে থাকতে। কাচ্চা বাচ্চা সামলাতে আর একজনের ঘাড়ে চেপে দিব্যি রাজত্বি করতে। তা নয় নিজের রুজি রোজগারের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছো।

নীলা চুপ করে হাসাতে থাকে। কথাটা মাঝে মাঝে তারও মনে হয়েছে। কিন্তু সেটা নিছক ভাবনাই। বলে,

—তা আর হল কই। দিন বদলের পালায় সব হিসাবই বদলে গেলো যে। যা বলছিলাম তাই শোনো।

নীলা ব্যাপারটা সবই গুছিয়ে এনেছে। স্কুল কমিটির নতুন ইলেকশন হবে। বলহরিকে, বিনয়বাবুকে এইবার তারা আঘাত হানবে। সেই বিরুদ্ধ শক্তি ধীরে ধীরে মাথা তুলেছে।

নীলাও নিজে এই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছে। বলে,

—বাঁচতে গেলে আজ সব কিছুকে এড়িয়ে যাওয়া চলবে না। আমিও প্রথমে ভেবেছিলাম—এসবে লাভ কি? শান্তিতে তবু দিন কাটাবো। কিন্তু দেখলাম তা হবার নয়। এ যুগে বাস করে তার যন্ত্রণাকে এড়ানো যায় না। বাঁচতে গেলে এর মধ্যেই সমাধানের পথ খুঁজে নিতে হবে। ঘরে নয়—পথেই দাঁড়িয়ে নতুন ঘরের সন্ধান করতে হবে। তাই তোমাকেও ডাকতে এসেছি।

চুপ করে থেকো না তুমি।

সকালের গিনিগলা রোদে গেরুয়া প্রান্তর—ওই পাতা ঝরা হলুদ শালবনের বুকে রং এর বৈচিত্র এনেছে। পাখীগুলো তখনও কলরব করে। পথের ধুলোয় ছাতারে পাখির দল লুটোপুটি জুড়েছে।

প্রাণ উছল প্রকৃতি। এত ধ্বংশ এত মৃত্যু এত সর্ব্বনাশা অন্ধকারের পরও দিনের আলো জাগে কি আশা নিয়ে।

বীণার কথা মনে পড়ে। গুপীনাথের মনে সেও জোয়ার এনেছে।

—চুপ করে রইলে যে?

নীলার দুচোখে কিসের আহ্বান। প্রাণগোপালের দিকে চেয়ে আছে সে। ওর দেহের সুবাস উঠছে। উষ্ণ একটু আবেশ জাগে মনে। প্রাণগোপাল কি ভাবছে। একটু স্পর্শ তার মনের জমাট পাথরটাকে যেন ধীরে ধীরে কি প্রচণ্ড উত্তাপে গলিয়ে দিচ্ছে। নতুন দিনের কথা সেও ভাবে। দেখেছে এখনও মানুষের মনে

বিদ্রোহ। দেখেছে হাজার মানুষের প্রতিবাদ মিছিল। দেখেছে অন্ধ মন্বুর যন্ত্রনা। সে কিছুই করবে না?

—নীলা।

একটা দুরন্ত আবেগে ও নীলার দেহটাকে কাছে টেনে নিতে চায়। সেও সব পেয়ে খুশী হয়ে বাঁচতে চায় আজ। নতুন আশ্বাস খোঁজে। দ্বিধা ভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করে সে।

—আমি কি পারবো?

নীলা ওকে আশ্বাস দেয়,

—নিশ্চয়ই পারবে! একদিন এত বড় কাজে এগিয়ে গিয়েছিলে, আজ এটুকু পারবে না? পারতেই হবে তোমায়। পারবে তুমি!

ওর উষ্ণ নিটোল হাতদুটো প্রাণগোপালের হাতে। দুচোখে সেই জানার ব্যাকুল তৃষ্ণা। ওই স্পর্শটুকুর মধ্যে সে আবার প্রাণের সাড়া পায়।

—তুমি পাশে থাকবে তো?

নীলা এই কথাটা শুনতে চেয়েছিল ওর মুখ থেকে। সেই মৃত-প্রায় আগুনকে সেও জাগিয়ে তুলবে হৃদয়ের উত্তাপ দিয়ে। দুচোখ তুলে ওর দিকে চাইল। বলে সে,

—নিশ্চয়ই! তাইতো তোমার কাছেই এসেছি।

প্রাণগোপালের মনে একটা সুর জাগে। পাখী ডাকা এই গ্রাম প্রান্তে মিষ্টি আলোয় আবার হারানো সেই দিনগুলোকে যেন খুঁজে পায় সে নতুন করে। কি একটা আশ্বাস জাগে মনে। এ যেন নতুন সেই প্রাণগোপাল—কি দুঃসহ প্রদীপ্ত তেজে জেগে উঠেছে। ওদের সব অনাচার অত্যাচারের জবাব দেবে সে।

একজনের এই গ্রামে মন টেকে না।

রমা কতদিন এসেছে; এখানের পরিবেশে সে অতীতের দিন-

গুলোকে খুঁজতে চেয়েছিল নিজের বিষময় বর্তমানের সব জ্বালা ভুলে। তাই বোধ হয় প্রাণগোপালকেও ভালো লেগেছিল। এমনি করে এগিয়ে এসেছিল তার দিকে।

মনে হয়েছিল তার সামনে ওই একটি মানুষই আছে।

নিজের কাছে সতীত্ব শুচিতার সংজ্ঞাও বদলে গিয়েছিল। তাই সে ঝড় তুলতে চেয়েছিল প্রাণগোপালের মনে। রমার কাছে জীবনের অর্থ আজ বদলে গেছে। সে আজ সামান্য যেটুকু পায় তাই নিয়েই বাঁচতে চায়।

সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে তারার আলোয় দেখেছিল রমা প্রাণগোপালের সত্বার নতুন সেই রূপকে। ভালো লেগেছিল, তাই রমা মনে মনে খুশী হয়ে উঠেছে।

বুড়ী মেয়েকে সকালেই সেজে গুজে বের হতে দেখে বলে,

—কোথায় যাবি লো? সবতো খুইয়ে এসেছিস, এখানে আবার ঢলানি না করলেই লয়? সবই আমার বরাত। একমাত্র ছেলে সেও দেশান্তরী হল, আর মেয়ে কিনা স্বোয়ামীর ঘর ছেড়ে—

রমা চমকে ওঠে কথাটা শুনে। ফর্সা কাপড় একখানা পরেছে। তাতেই যেন মনের অতলের সেই সুপ্ত নারীর ছবিটা প্রকট হয়ে ফুটে ওঠে।মায়েরও তা নজর এড়ায়নি।

রমা চুপ করে বাড়ি থেকে বের হয়ে এল।

যে যাই বলুক, অনেক ঠকেছে অনেক হারিয়েছে সে। আজ দেখেছে ওই সাধুতার কি দাম!

চোখের সামনে দেখেছে যারা সব পেয়েছে, অনেক পেয়েছে, তাদের কাছে সব সৎ অসৎ বঞ্চনাই একাকার হয়ে গেছে। বীণার খবরও শুনেছে।

অনাদি এ নিয়ে অনেক দুঃখই করেছে। বলহরি সামন্তের কাছে ওরা হার মেনেছে। ওদের সব কেড়ে নিয়েছে বলহরি।

তাই বীণাও সরে গেছে গুপীনাথের সঙ্গে। কোথায় চলে গেছে তারা। তবু সুখী হবে। তাদের এ সাহস হয়েছে।

রমাও আজ সব পেতে চায়।

প্রাণগোপালের বাড়ির ওখানে এসে থামল। কেমন যেন আজ লজ্জা আর সঙ্কোচ বোধ হয়। পরমুহূর্তেই সে সব সঙ্কোচ দ্বিধা কাটিয়ে সাহসী মন নিয়ে ওর জীর্ণ ভাঙ্গা বাড়িতে ঢুকলো।

কেন এসেছে তার জবাব সঠিক জানা নেই। বোধহয় নিজের ফেলে যাওয়া জগতটাকেই আবিষ্কার করতে এসেছে সে। ফিরে পেতে এসেছে হারানো অতীতকে।

ভাঙ্গা সিড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসে। জানালাগুলো ছোট ছোট। তাও মেরামত অভাবে ঝুলে পড়েছে কোনটার জীর্ণ পাল্লা। চূণ বালির আস্তর খসে পড়েছে।

প্রায়ান্ধকার বারান্দা দিয়ে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল রমা।

এ বাড়ি তার খুব চেনা। আগে অনেকবার এসেছে—ওই বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে আর প্রাণগোপাল রাসের সময় যাত্রা শুনেছে।

রাজা রাণীর প্রেমালাপ শুনে হেসেছিল দুজনে।

সদ্য কিশোরীমনে কি কল্পনার রং ধরেছিল।

হঠাৎ কার গলার শব্দে থমকে দাঁড়াল রমা। নীলা!

নীলার কণ্ঠস্বর শুনেছে সে। ও তাহলে প্রায়ই আসে। বিছানায় বসে দুজনে কি কথা বলছে। নীলার হাতখানা প্রাণগোপালের হাতে। ওর চোখেমুখে পড়েছে একফালি আলো, তাতে দেখা যায় কামনা-ব্যাকুল সেই চাহনি।

রমা থমকে দাঁড়াল।

নীলার জীবনেই ওর ঠাঁই অনেকখানি জুড়ে। রমার নিজের সেই সঞ্চিত গ্লানি আর ক্লেদ যেন চোখের সামনে ফুটে ওঠে। তার ফুলের মত সেই জীবনটার সব সুরভিসঞ্চয় যেন কীটদষ্ট হয়ে বিষিয়ে গেছে।

হেরে গেছে সে।

নীলার মিষ্টিহাসির ধারালো শব্দটা কানে আসে। এই শব্দটা তাকে ব্যঙ্গ করছে নিষ্ঠুরভাবে।

সরে এল রমা।

কাদের পায়ের শব্দ উঠছে! ওরা বের হয়ে আসছে ঘর থেকে!…নেমে চলে যাবার পথ নেই! রমা যেন ধরা পড়ে যাবে।

আবিষ্কার করে রমা—সে কাঁদছে। এতদিন এত বেদনা আঘাত ব্যর্থতায় তার চোখে জল নামেনি। নীরোদের সব আঘাত সে কঠিনভাবেই সহ্য করেছে। সয়েছে সব বঞ্চনা—ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস। আজ কিন্তু এই প্রাণগোপালের জীবনে তার সব ঠাঁই মুছে যেতে দেখে মনে হয় এইবার তার চরম পরাজয় আর সর্বনাশ ঘটেছে।

সব হারাবার বেদনায় তাই চোখে জল নামে। ধরা পড়ে যেতে চায় না সে। সরে গেল ভীত ত্রস্ত পরাজিত একটি নারী। ওপাশের থামের আড়ালে সরে দাঁড়াল।

নীলা আর প্রাণগোপাল ঘর থেকে বের হয়ে নীচের দিকে চলেছে। নীলার ফর্সা মুখে হাসির আভা। ওকে বিজয়িনীর মতই দেখাচ্ছে। যৌবনমদির দেহের সব সম্পদ প্রকট হয়ে উঠেছে। প্রাণগোপাল ওকে নীচে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসছে।

আজ সকালের আলোয় যেন জীবনের অন্ধকার তার উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। অনেক বিপদ—অনেক যন্ত্রণা, সব কিছু থেকে সে এড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু ওই নীলার চোখে সে শুনেছে দুরন্ত জীবনের সাড়া, …হঠাৎ সিড়ির মুখেই রমাকে দেখে অবাক হয় প্রাণগোপাল।

—তুমি!

রমার দুচোখে জলের রেখা, মুখে সেই ভাবটা তখনও মুছেনি। রমা নীচে চলে যাচ্ছিল। ভাবেনি প্রাণগোপাল ফিরে আসবে এখুনিই।

হঠাৎ মুখোমুখি হতে অপ্রস্তুত হয়ে যায় সে।

রমা নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করে বলে,

—ললিতা মাসীর কাছে এসেছিলাম।

আর দাঁড়াল না সে। সিড়ি দিয়ে নেমে চলে গেল। প্রাণগোপালও অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ওর দিকে।

কোথায় যেন একটা কি ঘটে গেছে। রমার ওই মুখচোখে সে দেখেছে কি অসহায় বেদনার ছায়া।

…তার আজ সময় নেই। সহরে যেতে হবে কতকগুলো জরুরী কাজে, নীলাও চলে গেছে সোজা পাকা রাস্তায়। প্রাণগোপালের মনে হারানো দিনের সেই উত্তেজনা ফিরে আসে।

আবার সব যোগাযোগগুলোকে ঝালিয়ে নিতে হবে। এক বার শেষ চেষ্টা করে দেখবে এবার।

...বলহরি সামন্ত, বিনয়বাবু অনেকের কথাই মনে পড়ে। রমার ওই কান্নাভেজা মুখখানাও তার মনে সেই প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ়তর করে তোলে। ওর সংসারও ভেঙ্গে পড়েছে। মনে পড়ে বীণাকে, বিশাখাকে।

সব কেমন এক সঙ্গে তাকে একটা আরব্ধ কাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

সে থামবে না।

ললিতা বেরুবার মুখে এসে দাঁড়ায়!

—সহরে যাচ্ছো?

—হ্যাঁ!

ললিত ইতঃস্তত করে কথাটা জানাতে।

—দেবসেবার খরচও নেই। শুনেছি দেবোত্তর অপিসে কম্পেনসেসন কিছু পাওয়া যাবে। যদি যাও,

প্রাণগোপাল জানে সংসারের অবস্থা। দেবোত্তর—দেবতার সেবা ভোগ ঠিকমত জুটছে না। হাসে প্রাণগোপাল।

—দেবতার চেয়ে আজ মানুষেরই দরকার বেশী মাসী। বলো আমাদের ভোগ জুটবে না ওটা না হলে।

—সেকি কথা! ললিতা চমকে ওঠে।

—তোমার পাথরের দেবতাকে আর দরকার নেই মাসী। মানুষের চাওয়াটাই আজ সবচেয়ে বেশী। দেখা যাক তার কতদূর কি করা যায়।

প্রাণগোপাল বের হয়ে গেল।

গ্রাম ছাড়িয়ে বাস রাস্তার দিকে চলেছে। এখন আর ডাঙ্গাটা হেঁটে পার হতে হয় না। বিনয়বাবুর গাড়ি যাবার জন্য রাস্তা হয়ে গেছে। তুচারটে বেকার ছেলে ধার দেনা করে সাইকেল রিক্সা এনেছে। কোন মধ্যবিত্ত গৃহস্থও কিছু দমকা রোজগারের আশায় রিক্সা কিনে দিন ভাড়ায় বাইতে দিয়েছে ওদের।

—আসুন ছোটবাবু!

পদা বাউরী রিক্সা নিয়ে যাচ্ছিল বাস রাস্তার দিকে। সেই ওকে ডাকছে।

কি ভেবে প্রাণগোপাল গিয়ে উঠল—কত দিতে হবে রে? রেট।

হাসে নদা। প্যাডেল ঠেলছে। বেঁকে গেছে পিঠটা ধনুকের মত। পদা তবু বলে,

—কি আর দেবেন গো। আপনার কাছে ভাড়া লোব কি? আপনাদের খেয়েই তো মানুষ।

প্রাণগোপাল অবাক হয় ওর কথায়।

এখনও ওরা যেন কোথায় বদলায় নি এত কষ্টের মধ্যেও। ওই ধনুকবাঁকা শিরদাঁড়া বেরকরা বুকের খাঁচায় একটা অন্তর ধুঁকে ধুঁকেও এখনও টিকে আছে।

মনে হয় বিনয়বাবু, বলহরি সামন্তের দল তাই বোধ হয় ভয় পেয়ে গেছে এই সংবাদ জেনে। প্রাণগোপালের মনে হয় এদের সে অনেক দিন চেনেনি। আজ নতুন করে চিনছে।

তবু বাস রাস্তায়—শালবনের ধারে নেমে ওর হাতে একটা আধুলি ধরে দেয়।—রাখ, চা খাবি।

নীলা তার আগেই এসে পৌঁচেছে। পিচ ঢালা রাস্তা—খোয়ায় ঢাকা সেই আদ্যিকালের রাস্তার রূপ বদলে গেছে। এখন তার রং-রূপ স্বতন্ত্র। পাশ দিয়ে টেলিফোনের তার গেছে সবুজ শালবনের বুক চিরে, রাস্তার বুক কাঁপিয়ে মাঝে মাঝে দু একটা মাল বোঝাই মার্সিডিজ বেন্‌জ—না হয় লেল্যাণ্ড ট্রাক ছুটে যায়। বাতাসে ডিজেলের গন্ধ ওঠে।

—তুমি এসে গেছো?

নীলার দুচোখে আনন্দের উচ্ছলতা। প্রাণগোপাল বলে।

—কেন, ভেবেছিলে বোধ হয় আর এলাম না?

নীলা হাসছে—তা নয়।

বাস আসছে। দুর্গাপুর থেকে বোঝাই বাসগুলো আসছে, কারখানার শিফ্‌ট শেষ করে ওরা বাড়ি ফিরছে।

প্রাণগোপাল অনেক আশা নিয়ে আজ দীর্ঘদিন পর সহরে চলেছে। তবে নিজের জন্য কোন দিন কারোও কাছে কিছু চায় নি। আজ কি এক দুর্বার তেজ তার মনে আলোড়ন তুলেছে। বলে সে,

—তুমিই আবার আমাকে নামালে এ পথে।

রমা ফিরে গেছে শূন্য মনে।

ওর মা তখনও গজ গজ করছে। পুকুর ঘাটে চান করতে গিয়ে কোথায় খড়কুটো মাড়িয়ে এসেছে—আবার ডুব দিয়েও খুসী হয় নি। ঘরে ফিরছে পাড়ার হতভাগা ছেলেদের মুণ্ডপাত করতে করতে।

সেই সঙ্গে তামাম বৌঝিদের কোল খালি করার সদিচ্ছাও জানায় তারস্বরে, এটা তার নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।

কেউ কোন কথাও বলে না। কথা বললেই বিপদ। সারাদিন বকবে বুড়ি। আর যে ভাষা প্রয়োগ করবে তার অনুপ্রাশ অলঙ্কারও বিচিত্র। ছন্দও সেইরকম মনোহর।

মেয়েকে বাড়ি ফিরতে দেখে বুড়ি গলা তোলে।

—ফিরলেন তা'হলে? পিণ্ডীর যোগাড় কি হবে আজ?

রমা কথা বললো না।

বুড়ি ফোঁস করে ওঠে ওকে জবাব না দিতে দেখে।

—গুম খেয়ে রইলি যে? আজ একাদশী, খেয়াল আছে?

রমার সারা মন জ্বলছে। এখানে এসে ভেবেছিল হয়তো শান্তিতে থাকবে। সেখানে প্রাত্যহিক এই খাওয়া পরার ভাবনাটা ছিল না। মনের গহনের অন্য জ্বালাই সেখানে তাকে যন্ত্রনা দিয়েছে। সেই মানুষটাকে সহ্য করতে পারেনি।

এখানে এসেও সেই যন্ত্রনাটা আরও বেশী করে তাকে জ্বালিয়ে তুলেছে। বাঁচার আশ্বাস কোথাও নেই। ভালোবাসার কোন স্পর্শও নেই। ব্যর্থ, বঞ্চিত হয়ে তিলে তিলে এই অপমৃত্যুকে আজ সে চোখের সামনে বড় করে দেখে। এই জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছে। মায়ের কথায় জবাব দেয়।

—তোমার সঙ্গে একাদশীই করবো আজ।

বুড়ী তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে।

—তা বলবি বইকি লো, নাহলে যে ঢলানি করার সুবিধে

হবে না। তাই বলছিলাম তার চেয়ে দড়ি কলসি বেঁধে তাল বনার জলে ডুব দে গে! জ্বালা জুড়াবে—বদনামও ঘুচবে।

রমা সরে গেল। জানে এর পর মায়ের রামায়ণ একবার সুরু হলে সপ্তম কাণ্ড অবধি না হোক লঙ্কাকাণ্ড অবধি না হয়ে থামবে না।

নিজের কাছেই আজ বিশ্রী লাগে, এতদিন তা হলে আলেয়ার পিছনেই ঘুরেছিল। নীরোদের কথা মনে পড়ে।

মরতে সে চায় না। এমনিভাবে অভাব যন্ত্রণা আর হতাশার মাঝে সবকিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে বাঁচতেও চায় না সে। সুনাম, অপযশ সব তার কাছে একাকার হয়ে গেছে। আজ মনে হয় সেই উন্মাদনাময় জীবনে সে ফিরে যাবে।

তারপর ভেসে যাবে বানেভাসা খড়কুটোর মত, দুঃখ নেই। সেও ভালভাবেই বাঁচতে চেয়েছিল, কিন্তু তা হয় নি। কোন নিষ্ঠুর বিধাতার অভিশাপে তার সব হারিয়ে গেছে।

সন্ধ্যা নামছে গ্রামের আকাশে। পাখীগুলো কলরব করে ফিরছে বাসার সন্ধানে, হারানো সাথীর সন্ধানে! মেঘমুক্ত আকাশ কোলে ফুটে ওঠে দুএকটা তারা। ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হয় ওদের দীপ্তি।

দুর্গাপুর থেকে শিফ্‌টের লোকজন ফিরছে বাড়িতে। গ্রামের অন্ধকার পথে তাদের টুকরো কথার শব্দ শোনা যায়। সাইকেলে অনেকে ফেরে—স্তব্ধ অন্ধকারে সাইকেলের ঘন্টির শব্দও থেমে আসে।

স্তব্ধতা নামে গ্রামের পথে, গাছগাছালির মাথায় জোনাকি জ্বলে, রমা দাওয়ায় বসে আছে। মা সারাদিন উপোস দিয়ে আর বকে বকে এইবার ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে ওদিককার ঘরে।

হঠাৎ অন্ধকার উঠোনে কাকে এসে দাঁড়াতে দেখে চমকে ওঠে রমা। তারার আবছা মিটি মিটি আলোয় দেখে এগিয়ে আসছে নীরোদ। তার মুখে চোখে একটু আলো। কঠিন মানুষটার মুখে কি একটা কোমলতা ফুটে উঠেছে।

রমা ওকে দেখছে। রাতের অন্ধকারে ও সব কাজই করতে পারে। কে জানে এখানে কি মতলবে এসেছে। হয়তো তার পিছনের এই পরিচয়টাকে মুছে দিতেই এসেছে।

রমার ভয় করে। কথা বলবার সামর্থ্যও তার নেই।

নীরোদের মুখে হাসির আবেশ। এ যেন আগেকার কঠিন কঠোর হিংস্র সেই মানুষটা নয়। ও বদলে গেছে।

—রমা!

রমা ওর ডাক শুনে চমকে ওঠে। মনে মনে কি যেন আশ্বাস পায়।

—তুমি!

তার এত দিনের চাপাপড়া ব্যাকুলতা বুক ঠেলে ওঠে কি দুর্বার ঝড়ের উন্মাদনা নিয়ে। কাঁপছে তার সারা দেহ। নিজেকে ওর বুকের মধ্যে সঁপে দিয়ে নিঃশেষ হতে চায় একটি ব্যর্থ নারী।

উষ্ণ একটি নিঃশেষ আলিঙ্গনে নিজেকে সঁপে দিয়েছে।

নীরোদ জানতো না তার শূন্য জ্বালাময় জীবনে এমনি শান্তির অবকাশ কোথাও আছে। সে বার বার কথাটা ভেবেছে। এতদিন হাউই-এর মত জ্বলে পুড়ে উঠেছে সে। ভেবেছিল সব তছ্‌নছ করে দেবে।

তাই যা পেয়েছে লুট করেছে, ভেঙ্গেছে আর নিজেকে মদের নেশায়, দুর্বার সেই মাতনে ডুবিয়ে রেখেছিল। কিন্তু মনের অতলে কোন অন্য মন বার বার তার সেই চিন্তাকে বিঘ্নিত করেছে।

কি পেয়েছে সে?

এতদিন সামান্য কাজ কর্ম করতো। ছোট্ট একটি বাসা করেছিল। রমাকে নিয়ে সুখী হয়েছিল সে। সকালে বের হতো কাজে—উঁচু নিচু চড়াই উৎরাই এর বুকে গাছ গাছালি—বনতুলসীর ঝোপে সকালের মিষ্টি রোদ রঙ্গীন হয়ে উঠতো। সাইকেলে করে কারখানায় যেতো সে।

দিনান্তে শেষ রোদ মাখা পথ দিয়ে বাসায় ফিরতো। রমার সুন্দর নিটোল মুখখানায় ফুটে উঠতো মিষ্টি হাসির আভা। গুন গুনিয়ে গান গাইতো সে।

—হাত মুখ ধুয়ে এসো। চা খাবার তৈরী।

—উঁহু তার আগে—

নীরোদ বলিষ্ঠ দুটো হাত দিয়ে ওর সুন্দর নরম নেশা লাগানো দেহটাকে জড়িয়ে ধরতো। ওর গালে মুখখানা ঘসবার চেষ্টা করতো।

রমা বাধা দিতো—এ্যাই, ওমা! এ্যাই দরজা খোলা রয়েছে। হাসিতে তবু ওর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে শাড়ির প্রান্ত দিয়ে গাল ঘসতে ঘসতে দুচোখে হাসি এনে বলতো—দস্যি কোথাকার

হাসতো নীরোদ।

সেই সুন্দর হাসি-স্বপ্ন—কলকণ্ঠ ভরা বাসাটা কোথায় হারিয়ে গেছে। কি নেশায় তাকে ওরা মত্ত করে তুলেছিল।

হারিয়ে গেছল তার সব সঞ্চয় অনেক পাবার লোভে।

দিনরাত্রি কেটেছে অশান্তি উদ্বেগ আর উত্তেজনার মধ্যে। পুলিশের নজর এড়িয়ে চলতে হয়। তাকে শুধু ঠকায় সকলে সেই সুযোগে। বিনয়বাবু, বলহরি, ঝুনঝুনমল, লোচনরাম সকলেই। তার পরিশ্রমে ওরা লাল হয়ে উঠেছে। নীরোদ শুধু পরিচিত হয়েছে গুণ্ডা বলেই।

আজ তাই ঠিক করেছে সে ওসব পথ ছেড়ে দেবে। শুধু একটা মাত্র কাজ বাকী। বিনয়বাবুর সেই বিশ্বাসঘাতকতার জবাব দিতে

এখনও পারেনি। তার জবাব দিয়ে সে ওই পথ থেকে সরে যাবে।

অভাব, দুঃখ কষ্ট থাকুক তবু শান্তিতে বসবাস করবে একজনকে নিঃশেষে ভালবেসে।

তাই বোধহয় ফিরে এসেছে নীরোদ।

রমার শূন্য মনে তাই আবার সুর জাগে। আশার সুর।

নীরোদ বলে—এইবার নতুন একটা চাকরী নিচ্ছি রমা—চিত্তরঞ্জনের ওদিকে। ওই আসানসোল রাণীগঞ্জ থেকে সরে যাবো।

রমার আজ এ কথাটা ভালো লাগে। জীবনের সব শূন্যতার মাঝে এই পূর্ণতার কল্পনাই সে করেছে।

—সত্যি!

রমার দুটো হাত ওর হাতে। নীরোদের কণ্ঠে আজ অন্য স্বর শুনছে সে। আগেকার সেই হারানো মানুষটা কঠিন আঘাতে নিজের ভুল বুঝেছে। আজ ক্লান্ত সে।

রমার মনে জেগেছিল সেই ক্লান্তি আর হতাশা। নীরোদের কথাগুলো শুনছে সে। নীরোদ বলে চলেছে,

—বাসাও দেবে, অজয়ের ধারে নতুন বাসা দেখে এলাম। ওপারে সবুজ পাহাড়, শালবন আর তার ধারে সুন্দর গ্রামগুলো দেখা যায়। বর্ষায় অজয়ের বুক ভরে ওঠে গেরুয়া জলে। চারিদিকে সেই ডাঙ্গার রুক্ষতা মুছে যায় সবুজ ঘাস আর বুনো গাছের ভিড়ে।

রমার খেয়াল হয়।

—এই যা! এলে কতদূর থেকে, আর বসে বসে গল্প জুড়েছি। চা করি!

বুড়ির ঘুম আসেনি। এমনি ঝুম মেরে আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে পড়েছিল। কার কথার শব্দ কানে তবু যায়। রমা কোন

একজন পুরুষের সঙ্গে বসে বসে গল্প করছে। রাতের অন্ধকারে এ বাড়িতে তাহলে লোকজন আসে। নিজের মেয়ের এই ব্যবহারে বুড়ি ক্ষেপে ওঠে। তাই বিছানা থেকে উঠে চুপি চুপি বাইরে এসেছে।

হ্যারিকেনের আলোয় নীরোদকে দেখে চমকে ওঠে। তাহলে ভুলই ভেবেছিল সে রমাকে এতদিন! বুড়ি মাথায় ঘোমটা দিয়ে খুশিভরা কণ্ঠে বলে,

—এলে বাবা! তবু মনে পড়ল আমাদের?

নীরোদ কি ভেবে শাশুড়ীকে প্রণাম করে। রমা চা করতে উঠে গেল এই ফাঁকে।

রমার কাছে এই রাত্রিটি একটি স্মরণীয় রাত্রি। এ যেন তাদের কাছে নতুন এক মিলন রাত্রির মতই মধুর আর সম্ভাবনাময়। এ রাত ঘুমিয়ে শেষ করে দিতে চায়নি তারা তুজনে।

নীরোদও তার সান্নিধ্যে এসে বদলে গেছে একেবারে। নতুন যেন এক মানুষ, আজ সে ভালবাসতে চায়। সেই আলেয়ার পিছনে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে সে ফিরেছে রমার কাছে।

—শীগ্‌গিরই নিয়ে যাবো এইবার। ওখানের চাকরীতে জয়েন করি। বাসাটা পাই—

ওর কণ্ঠস্বরে আজ কোন ফাঁকি নেই।

রমা আশাভরে শুধোয়,

—কত দেরী হবে?

দেরীটা সত্যিই তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। নীরোদ মনে মনে কথাটা ভাবছে! আরএকটা কাজ তার বাকী। বলহরির অনেক ক্ষতি করেছে, শেষ আঘাত হানবার ব্যবস্থাও করেছে। এইবার বিনয়বাবুকে জবাবটা দিতে হবে। না দিতে পারা পর্যন্ত তার শান্তি নেই। প্রতিশোধ নিতে হবে।

সেটা চুকে গেলেই নারোদ নতুন করে তার জীবনে ফিরে যাবে। তাই জবাব দেয়,

—মাস খানেক বড় জোর।

—সত্যি! গা ছুঁয়ে বলো।

রমা ওকে কাছে টেনে নেয়। রাতের নিস্তব্ধ অন্ধকার নেমেছে বাইরে। শান্ত স্তব্ধ গ্রামসীমা বাতাসে জাগে রাতজাগা বকুল ফুলের সুবাস।

নীরোদের সারা দেহ মনে কি দুর্বার বুভুক্ষা।

রমার নিটোল দেহের মাঝে সে আজ খোঁজে শান্তি, স্তব্ধতা আর সব জ্বালা থেকে মুক্তির আশ্বাস।

রমা যেন এইটুকু পাবার আশায় উৎকর্ণ হয়েছিল এতদিন ধরে। আজ সে সব ফিরে পেয়ে সার্থক হতে চায়।

আজ কোন অভিযোগ নেই তার কারো বিরুদ্ধে। প্রাণগোপাল সত্যিই ভালো—অনেক ভালো, নীলাও। ওরা তাকে কি চরম অপমান আর দুঃসহ লজ্জার হাত থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছে।

সব পাবার অধিকার দিয়েছে তাকে প্রাণগোপাল।

ভোর রাতেই উঠে চলে গেছে নীরোদ। তাকে প্রথম বাসেই ফিরতে হবে, কি জরুরী কাজ আছে। রমা বাধা দেয়নি। যাবার সময় নীরোদ ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলে,

—আর দেরী হবে না রমা, এবার যাবার জন্য তৈরী থেকো।

রমা ঘাড় নাড়ে।

আজ সে প্রণাম করে নীরোদকে অনেক দিনের পর।

—সাবধানে থেকো কিন্তু। আর যেন ওসব হাঙ্গামায় জড়িয়ো না।

ঘাড় নাড়ে নীরোদ। তবু যেন চমকে ওঠে। তার নিজের

শক্ত কঠিন মনটা এইটুকু নিবিড় প্রীতির স্পর্শে কেমন আনমনা —দুর্বল হয়ে উঠছে।

মাথা নীচু করে বের হয়ে এল।

রমা তখনও দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। ভোরের আবছা আলোয় আর তাকে দেখা যায় না।

নীরোদ গ্রাম ছাড়িয়ে ডাঙ্গার বুকচেরা রাস্তা দিয়ে বাস রাস্তার দিকে এগিয়ে আসে। শেষ রাত। আকাশে তখনও শুকতারা জ্বলছে শালবনের কালো সীমা রেখার উর্দ্ধে।...কোথায় দুএকটা ঘুম ভাঙ্গা পাখী ডাকছে।

বুড়ি মেয়েকে শুধোয়।

—কি বলে গেল জামাই? হ্যারে? কথাবার্তা ভালো করে বলেছিলি না চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে মাঝরাতে ঘরছাড়া করলি লোকটাকে?

রমা জবাব দেয়।

—শুধোলেই তো পারতে তাকে?

বুড়ির দাঁতপড়া লালচে মাড়ি বের হয়ে পড়ে। মেয়ের মুখে চোখে তৃপ্তির সেই শান্ত ভাবটা তার চোখ এড়ায়নি। তবু ওদের মিল হোক। সুখী হোক তারা।

বুড়ি বলে,

—না বাপু; কথাবার্তা কইতে শেখ।

—তাই শিখবো।

রমার মনে খুশীর সুর জাগে। সকালের মিষ্টি আলোয় সব কিছুকে আজ যেন নতুন চোখে দেখছে সে। আর ক'দিন!

তারপরই আবার চলে যাবে এখান থেকে। এতদিন যে গ্রাম, যে লোকগুলো অসহ্য হয়ে উঠেছিল, তাদেরই নতুন করে ভালো লাগে।

নিজেকে অন্বেষণ করে আবার ফিরে পাবার আনন্দও এমনি। প্রাণগোপাল অনেকদিন পর আবার সদরে এসেছে। আগে এখানে প্রায়ই আসতো। তখন অসীমবাবুও সঙ্গে থাকতেন।

তিনিই তাকে সঙ্গে করে সদরের কর্মীদের সেই বিদ্রোহী তরুণদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। পুলিশী হামলা, খানা তল্লাসীর খবর তারা আগেই পেতো।

প্রাণগোপালও কত রাত্রে সদরে এসে থেকেছে নৃপতি উকিলের বাড়িতে, না হয় রেল লাইনের পারে সেই রাঙ্গা মাসীমার বিরাট বাগান ঘেরা বাড়িটায়। কখনও দল বেঁধে তারা বের হতো রাতের অন্ধকারে রিভলবার না হয় জরুরী কোন খবর, চিঠিপত্র পাচার করতে।

অসীমবাবুর খবর অনেকদিন পায়নি। শুনেছিল দীর্ঘদিন জেলেই ছিলেন তিনি। হিজলী—সেখান থেকে দেউলি, রাজস্থানের মরুভূমির মধ্যে সেই বন্দীনিবাস, তারপর বাংলার সীমান্তে দুর্গম পাহাড়ের মাথায় বকসা ক্যাম্পেও ছিলেন অসীমবাবু।

বন্দীনিবাস থেকে মুক্তি পেয়েও তিনি থামেননি। এখনও কলকাতায় সক্রিয় ভাবেই রাজনীতিতে জড়িয়ে আছেন। ওটা তার নিঃশ্বাসবায়ুর সঙ্গে মিশিয়ে গেছে।

অনেকদিন পর নৃপতিবাবুর সঙ্গে দেখা। তিনিও চিনতে পারেন তাকে।

—এতদিন দেখা নেই, ভাবলাম বুঝি ব্যবসা বাণিজ্য করে হাল বদলে ফেলেছো, সেই সঙ্গে দেশসেবার মতটাকেও?

হাসে প্রাণগোপাল।

নীলাও প্রণাম করে নৃপতিবাবুকে। তিনি জেলার অন্যতম শ্রদ্ধেয় জননেতা। কলকাতার সঙ্গে এমনকি দিল্লীর সঙ্গেও তার নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে।

নীলা এত সহজে এমনি একটি লোকের সমর্থন পাবে আশা করেনি।

নৃপেনবাবু বলেন,

—যদি তোমাদের দাবী সত্যকার হয় নিশ্চয়ই তা পূরণ হবে মা।

প্রাণগোপাল নীলাকে বলে,

—রাঙ্গাদি তোমার কথা বলেন। একবার দেখা করো তার সঙ্গে।

সেই রাত্রে ওরা ফিরতে পারেনি সদর থেকে। প্রাণগোপালের সামনে সেই হারানো কর্মময় জগৎটা আবার নতুনরূপে দেখা দেয় কি দুর্বার উন্মাদনা আর কর্মচাঞ্চল্য নিয়ে।

তার সামনে অনেক কাজ। রাঙ্গা মাসীমাই বলেন,

—এ সময় চুপ করে বসে থেকো না প্রাণগোপাল, তোমার এলাকার লোকদের জন্যও তো কিছু করতে পারো। সেদিন রাজনীতি করেছিলে—দেশের জন্য সব দিতে চেয়েছিলে, আজ সেই দিন বদলেছে। নতুন করে গড়ার কাজে তাই তোমাদের দরকার। কিছু ক্ষমতা-লোভী স্বার্থপর মানুষ এতবড় মহা যজ্ঞকে পণ্ড করে দিতে চলেছে। তোমরা এগিয়ে এসো—তাহলেই তারা বাধা পাবে।

নীলাও দেখেছে সেই মহিলাকে।

আজ বয়স হয়ে গেছে রাঙ্গা মাসীমার। মাথার চুলগুলো সাদা হয়ে গেছে। তবু চোখের দীপ্তি মুছে যায়নি। কণ্ঠস্বরে ফুটে ওঠে সতেজ ভাব। ওর মনে এখনও সার্থক সমাজ, সুখী মানুষ গড়ার স্বপ্ন রয়ে গেছে। তারই জন্য এতদিন দুঃখকষ্ট পেয়েছেন, সব হারিয়েছেন।

ওর কি ছিল তা জানতো প্রাণগোপাল। বিরাট জমিদারের ঘরের বৌ। এককালে অর্থসম্পদ ছিল প্রচুর। একমাত্র সন্তান স্বদেশী আমলে পুলিশের গুলিতে মারা যায়। স্বামী ছিলেন দীর্ঘ দিন জেলে। তিনিও ওই মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন।

আজ তার জন্যই যথা সর্বস্ব গেছে। বাকী যা ছিল তার অধিকাংশই দিয়েছেন দেশের জন্যই।

সেই বিরাট বাড়িটায় এখন কলেজ চলছে, তিনি সরে এসেছেন ছোট একটা বাড়িতে। কোন রকমে বেঁচে আছেন মাত্র। তবু আনন্দেই আছেন।

ওদের সেই রাত্রে থেকে যেতে হল ওর কাছেই।

নীলাও খুশী হয়েছে ওকে দেখে। নিজের কাছে মনে হয়েছিল সে যেন ঠকে গেছে কোথাও। কিন্তু মাসীমাকে দেখে মনে হয়েছে সে ধারণা ভুল।

সেও জিতবে একদিন।

মাসীমা বলেন—অসীম বাবুর ঠিকানা নিয়ে যেও, চিঠি দিও তাঁকে!

প্রাণগোপাল একদিনেই যেন নতুন সেই জগৎটাকে ভালোবেসে ফেলে। দেখে যে হতাশা নিয়ে সরে ছিল সব কিছু থেকে—সেটা সাময়িক। তার মন গড়া ভুলই ছিল মাত্র।

নীলা তার সেই ভুলটাকে ভেঙ্গে দিয়েছে। সেইই তাকে সেই বদ্ধ ঘরের পরিধি থেকে কর্মময় এই জগতের সন্ধান দিয়েছে। নিজেকে চিনেছে সে নতুন রূপে।

আজ এ তার কাছে নবজন্ম বলেই বোধ হয়।

নতুন আলোয় আজ দেখে নীলাকে। মনে হয় ও যেন দুর্বার কোন যৌবনমাতাল নদী। সব বাধা ভেঙ্গে ও কি অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়ে এগিয়ে চলে সমুদ্রের দিকে—অন্তহীন কাল প্রবাহে ওরা হারিয়ে যায় না—কলরব তুলে সোচ্চারে ঘোষণা করে নিজের অস্তিত্বের কথা।

রমার সেই কান্না ভিজে মুখখানা মনে পড়ে। কি সে চেয়েছিল তা জানে না। ওরা জীবনে ব্যর্থতার বেদনা নিয়েই গুমরে কাঁদে। তাই বোধ হয় তার বেদনাকেও ভালোবেসেছিল।

নীলা তা পারে নি।

আর বিশাখা! মনের অতলে সুন্দর, বিস্মৃত একটু সুরভিমাত্র। আজ তা ম্লান হয়ে গেছে—তবু জেগে আছে রাতের অন্ধকারে জাগর একটি তারার মত।

নীলা ওদের থেকে স্বতন্ত্র—প্রাণময়ী, আবেগময়ী। ওর মনের সুরে তাই তার আজকের নতুন মন সুর পেয়েছে, সাড়া পেয়েছে।

বিনয়বাবু কিছুদিন থেকে বলহরিকে সহ্য করতে পারছেন না। নিজের কাজেই ওকে রেখেছিলেন মাস মাইনে দিয়ে। ধীরে ধীরে বলহরি এইবার তাকেও টেক্কা দিয়ে আসমানে উঠছে।

ওর ব্যবহারেই নীরোদের দল বিগড়ে গেছে। এখানের জনসাধারণের সামনে বলহরি যেন মূর্তিমান শয়তানে পরিণত হয়েছে ওই বিনয়বাবুর নাম ভাঙ্গিয়েই। বিনয়বাবুও অপ্রিয় হয়ে উঠেছেন ওরই জন্য।

একটা বয়স অবধি মানুষ সব কিছু পেতে চায়। তার জন্য সর্বস্ব পণ করতে সে রাজী থাকে। তখন সে হয় দুর্দম—দুর্বার। বিনয়বাবু প্রথম জীবনে তেমনিই ছিলেন। কোন নীতি—কোন মনুষ্যত্বের ধার ধারেন নি।

এ নিয়ে বাড়িতেও তার স্ত্রী কমলার সঙ্গে অনেক অপ্রিয়তার সৃষ্টিই হয়েছে। তবু সেদিন কান দেননি।

আজ অনেক পেয়েছেন তিনি। কমলাও যেন ধীরে ধীরে তার উপরই খানিকটা প্রাধান্য বিস্তার করেছে। একমাত্র ছেলে শুভব্রত সেও এতদিন স্কুল কলেজেই পড়েছে। বিনয়বাবু ভেবেছিলেন পাশ করিয়ে নিজের ব্যবসায়ে এনে বসাবেন ছেলেকে।

শুভব্রত এম. এ. পাশ করেছে। সদরেই থাকে বেশীর ভাগ। তবে বাবার সঙ্গে তাই নিয়েই মনান্তর ঘটেছে। শুভব্রত বিনয়বাবুর ওই নীতিকে বিশ্বাস করতে পারে না।

এতদিন ধরে শুভব্রতও দেখেছে সব কিছু। তার মনে ব্যবসার সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণাই ছিল। কিন্তু সব যেন বদলে যাচ্ছে। তাই কথাটা বলে,

—এ সব আমার দ্বারা হবে না বাবা। এই ব্যবসাপত্রের নামে এমনি করে লোক ঠকানোকে আমি সমর্থন করতে পারি না কোনমতেই।

বিনয়বাবু চমকে ওঠেন।

এত দিন অনেক আশা করেছিলেন ছেলে তারই পথ নেবে।

বলেন তিনি,

—কি বলছো? ব্যবসাতে এসব নতুন কি? পয়সার নেশা আলাদা। বেশতো বিবেকে বাধে—বছরে কিছু টাকা নিয়ে দরিদ্র নারায়ণের সেবা করবে, না হয় হাসপাতালে ধরে দেবে, চ্যারিটি করো!

শুভব্রত বলে,

—তার চেয়ে যদি লোক ঠকানো, ভেজাল দেওয়া, এই ডাকাতিটা ওরা বন্ধ করে বোধ হয় ও-সবের দরকার হবে না।

বিনয়বাবু চুপ করে থাকেন। এতদিনের সব সাধনা, সব পরিশ্রম, মতবাদ এক নিমেষে যেন অর্থহীন বলেই বোধ হয়। শুধু তাই নয়, বেশ বুঝেছেন তিনি—তার সন্তানের চোখে তিনি ঘৃণ্য একটি মানুষ।

শুভব্রত বলে,

—ওই সব রাতের অন্ধকারের কারবার বন্ধ করতে হবে। বলহরিবাবুর মদের কারবারেও আপনার অনেক টাকা খাটে। আরও অনেক কথাই শুনেছি। ব্যবসা করতে হয় ক্লিন শ্লেটে সম্মানজনক ভাবে ব্যবসা করুন।

বিনয়বাবু চটে ওঠেন।

—তা হলে বলতে চাও এসব আমি অন্যায় ভাবে—মানে চুরি করে করেছি ?

শুভব্রত চুপ করে থাকে। কমলাও ওদের কথাবার্তাগুলো শুনেছে। স্বামীকেও সে এর আগে অনেক বার এসব নিয়ে সাবধান হতে বলেছে, কিন্তু তার কোনো কথাই শোনেনি সে। আজ ছেলের সামনে বাবার সেই লোভী ঘৃণ্য স্বরূপটা নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়ে গেছে।

বিনয়বাবুর চড়া গলার কথা শুনে ঘরে ঢুকলো কমলা। দেখে বাবা ছেলে দুটি বিরুদ্ধমতের মানুষ আজ মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।

শুভব্রতের মুখ কঠিন। বিনয়বাবুর দুচোখ কি জ্বালায় জ্বলছে।

বিনয়বাবু বলে চলেছেন।

—এই তোমাদের লেখাপড়া শেখা ? সব ভাবো, টাকাটার কোন মূল্য নেই। দাম তোমাদের ওই ভূয়ো আদর্শের। সাম্যবাদ, মার্কস্‌বাদ, সাধুতা, সৎ মনোবৃত্তি এসব নিয়ে বেঁচে থাকলে আজ কোথায় থাকতাম তা জানো ? ওই পথের ধারে। এই গাড়ি বাড়িও হতো না, এত উপরেও উঠতাম না। আজ দেশের লোকই তাদের প্রতিনিধি করেছে আমাকে।

শুভব্রত বলে,

—ওসব না বলাই ভালো। ব্যবসায় যেমন মালপত্র কেনেন, আপনিও তেমনি করে ওদের ঠকিয়ে ভোট কিনেছেন ! কিন্তু—

—শুভো !

বিনয়বাবু চমকে উঠেছেন। তারই বাড়িতে তার মুখের উপর নিজের ছেলে যে এমনি কথা বলবে তা ভাবতেও পারেননি।

কমলা বাধা দেয়।

—চুপ কর শুভো। কলেজে লেকচার দিয়ে আর সহরে থেকে এইসব শিখেছিস তুই ! যা এখন !

শুভব্রত আপাততঃ সরে গেল। তবু ওর মুখ চোখের কাঠিন্য

কমলার নজর এড়ায় না। ছেলেকে সে চেনে। ছোটবেলা থেকেই ও এমনি একগুঁয়ে আর কঠিন প্রকৃতির।

বিনয়বাবু রাগে উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছেন।

কখনও ভাবেননি এমনি করে তার এতদিনের কৃতকার্যের জন্য জবাব দিতে হবে।

কমলা বলে—কি ভাবছো?

বিনয়বাবু হাসেন। মলিন বিষণ্ণ একটু হাসি।

—রত্নাকরের কথা জানো তো? ডাকাতি করতো বনে। সাধুকে যখন হত্যা করতে যাবে, সাধু তখন শুধালো—এত পাপ করছো, নরহত্যা করছো, এই পাপের ভাগী কি তোমার স্ত্রী পুত্র হবে? দস্যু রত্নাকরের মনে হয় কথাটা একবার ওদের শুধানো দরকার। তাই সাধুকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে বাড়িতে এসে স্ত্রী পুত্র সবাইকে শুধোয়—তোমরাও এই দস্যুবৃত্তির পাপের ভাগী হবে তো?

স্ত্রী জবাব দেয়—তা কেমন করে হয়? এসব দায়িত্ব তোমার। ছেলেমেয়েরাও বলে, তোমার কর্তব্য আমাদের ভরণপোষণ করা, তার জন্য যা পাপ হবে সে সব তোমারই।

কমলা স্বামীকে এত অসহায় কোনদিনই বোধ করেনি। কঠিন একটি মানুষ, এতদিন নিজের সব কিছু মতবাদকে জোর করে প্রতিষ্ঠিত করেছে, দুহাতে অর্থ সম্পদ কুড়িয়েছে। প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে।

আজ অন্তরের মধ্যে একটা ঠেলে-ওঠা পরাজয়ের গ্লানি তার বাইরের সেই সত্তাটাকে নিদারুণভাবে হার মানিয়েছে।

কমলা বলে—ওসব কথা থাক।

বিনয়বাবু বলেন, একদিন এর মুখোমুখি হতে হবে তা ভাবিনি কমলা। তুমিও বলেছিলে, শুনিনি। এত পাপ তাহলে সবই একা আমার? এসবের কোন দামই ও দেয় না। ওরা কি নিয়ে তাহলে

বাঁচবে বলতে পারো? ওই আদর্শ ধুয়ে পেট ভরবে? বলে টাকার দরকার নেই!

বিনয়বাবুর সামনে তবু একটা প্রশ্ন মাথা তুলেছে বার বার। ছেলের মতকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। কাজ কারবার চালাচ্ছেন, ওটা চলছে নেহাৎ যন্ত্রের মতই। তবে রাতের সেই কারবার বন্ধ হয়ে গেছে। বলহরির কারবারেও বেশ মন্দা ভাব এসেছে।

কোথায় চারিদিকে একটা বিরুদ্ধ শক্তি মাথা তুলছে। নিজের ঘরেই দেখেছেন তার প্রকাশ। ঘরে বাইরে চারিদিকে তারা জেগে উঠেছে। বিনয়বাবুর মনে হয় এইবার যেন কোণঠাসা হয়ে উঠেছেন তিনি।

ক'দিন গ্রামেই এসেছেন। মনের অতলের সেই পরাজয়ের কালো ছায়াটা এখানে তত উদগ্র হয়ে ঠেকে না। গ্রামীন সবুজ শান্ত পরিবেশটাকেও তবু তাঁরাই বিষিয়ে তুলেছেন। সহযোগিতা করেছে ওই বলহরি সামন্তের মত হিংস্র মানুষগুলো, আর কিছু সুবিধা-ভোগীর দল।

বিনয়বাবু মনে করেন আজ—সত্যিই তিনি ভুল করেছেন। নিজের সামান্য স্বার্থের জন্য ওদের প্রশ্রয় দিয়েছেন। মূষিককে মুনি, বাঘে পরিণত করেছিলেন, কিন্তু সেই বাঘই একদিন মুনির উপরই হামলা করবে সে কথা অতীতের সত্যদ্রষ্টা ঋষিও জানতেন না।

জনসাধারণের দাবীতে এইবার স্কুলের সব কিছুরই তদন্ত হতে পারে।

বিনয়বাবু আজ সমস্ত ব্যাপারটা মোহমুক্ত মন নিয়ে বিচার করতে পারেন।

স্কুলের কাগজপত্র দেখতে দেখতে বলহরি সামন্তের ওই কথাটা শুনে ন্যাকামি না হয় শয়তানি বলেই মনে হয়।

বলহরি জানায়—গোলমাল তেমন কিছু নেই। থাকলেও আপনি যখন আছেন তখন ভয় কি স্যার!

বিনয়বাবু বলেন তিক্ত কণ্ঠে,

—ওসব কথা রাখো সামন্ত মশায়। হিসাব দিতে হবে নতুন কমিটির সামনে। না দিলে তোমাকে আমাকে কাউকেই ওরা ছেড়ে কথা বলবে না। টাকাটা গোলমাল করেছো, মিটিয়ে দাও বেশ কয়েক হাজার টাকার হিসাবেই নেই। বিলডিং ফাণ্ড থেকে অনেক টাকা গেছে। কোথা গেল সে সব টাকা?

বলহরি একটু যেন অন্য সুরের কথা শুনছে। ভেতরের ব্যাপার সেও জানে।

কারবারে মন্দা এসেছে চারিদিক থেকে। এতদিন যে বাড়তি টাকাটা বাজারে ছিল সেটা কোন রন্ধ্রপথে হারিয়ে গেছে। আর তার বদলে দিকে দিকে মাথা তুলেছে সাবধানী প্রতিপক্ষ।

বিনয়বাবুর নাম দিয়েই বলহরি এসব করেছে। বলহরিও আজ বিপদে পড়েছে। বেশ কিছু লোকসান গেছে ক'বারেই। মাল লুঠ করে নিয়েছে ওরা। তাছাড়া মাল চালানও বন্ধ।

বলহরি হাসে দাঁত বের করে।

—কমিটি! ওতো স্যার আমরাই আছি, থাকবো। তাছাড়া আপনি আবার তো আসছেনই!

বিনয়বাবু নিজের মনে সেই ভরসা আজ পান না। তাই ব'লেন,

—ওসব কথা থাক। হিসাবটায় দেখছি পনের বিশ হাজার টাকার গলদ আছে।

—আজ্ঞে! বলহরি চমকে ওঠে।

তার সব স্বরূপই যেন বের হয়ে পড়েছে। তাই বার হবার পথ খুঁজছে সে। তার দলবলকে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে, নইলে সমূহ বিপদ।

এমন সময় খবরটা আনে গঙ্গাধর। বানের আগে খড়কুটো

ভেসে আসে, গঙ্গাধরও তেমনি। বুড়ো হয়ে গেছে, মাথার চুল-গুলো সব সাদা, তাতে কদম ছাট লাগানো। গাল দুটো তুবড়ে গেছে। তোবড়ানো গালে শীর্ণ নাকটা খাঁড়ার মত ঠেলে উঠেছে।

একটা ঠং ঠংএ সাইকেলে চড়ে সে দিক্‌বিজয় করে ফেরে। সাইকেলের বয়সও তারই মতই, দশাও তার মতই শোচনীয়। বিবর্ণ তোবড়ানো, তাতে ব্রেক, বেলের বালাই নেই। লম্বা দুটো বকের মত ঠ্যাং মাটিতে ঠেকিয়ে ব্রেকের কাজ করে। মাথায় এখনও অতীতের সেই প্রজাপতি ঋষির ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় নিয়ে এক গোছা টিকিই টিকে আছে।

গঙ্গাধর লাফ দিয়ে সাইকেল থেকে নেমে ঘোষণা করে,

—দি ক্যাট ইজ আউট অব দি ব্যাগ স্যার। গ্রেট ট্রাবল!

ওর দিকে চাইলেন বিনয় বাবু।

গঙ্গাধর শোনায়,

—ওই পানু ইজ ইন দি পিকচার স্যার।

আন্দোলন, স্কুল কমিটির বিরুদ্ধে নালিশ—অসামাজিক কারবার ইত্যাদির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলেছে হি হিজ দি লিডার।

—প্রাণগোপাল! কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারেন না বিনয়বাবু। তিনি নিজে প্রাণগোপালকে ভালো একটা অফার দিয়েছিলেন, প্রাণগোপালও সেটা ভেবে দেখবো বলেছিল, হয়ত সে মতই দিতো। দুজনের চেষ্টায় এবার এদিকে শান্তি ফিরে আসতো।

কিন্তু প্রাণগোপাল যে এমনি করে তার জাল কেটে বেরুবে তা ভাবতেই পারেন নি বিনয়বাবু! নিজের ছেলের কথাই মনে পড়ে। শুভব্রতও এমনি কথা বলেছিল। সেও বিশ্বাস করে তার বাবার মত কিছু স্বার্থপর লোভী-মনের মানুষ আজকের সমাজের সুস্থ সুন্দর পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলেছে

বলহরি সামন্ত প্রাণগোপালের নাম শুনেই চমকে ওঠে।

আগেকার একটি দিনের কথা মনে পড়ে। ক্ষুব্ধ বিদ্রোহী একটি তরুণ সেদিন তার সামনে উদ্যত বন্দুক হাতে দাঁড়িয়েছে। দুচোখ তার জ্বলছে কি হিংসায়। বন্দুকের নল থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। ওদিকে ছিটকে পড়েছে বিশু সর্দারের প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহটা। তখনও রক্ত ঝরছে, প্রাণগোপালের সেই মূর্তির সামনে অসহায় বিবর্ণ মুখে প্রকম্প বলহরি সেদিন দাঁড়িয়েছিল কাঁপতে কাঁপতে!

সেদিন ঘৃণাভরে তাকে শাসিয়েছিল পানু।

—একটা বুলেট রেখেদিলাম, পরে কাজে লাগবে।

ভেবেছিল বলহরি সেইসব দিন পার হয়ে গেছে। আজ তাদেরই দিন। তাই অবাধেই চালিয়েছিল সেই অত্যাচার। কিন্তু হঠাৎ কেমন দিন বদলে যাচ্ছে।

তবু সাহসটুকু হারাতে চায় না সে। বলে,

—কোত্থেকে শুনে এলে হে গঙ্গাধর?

গঙ্গাধর একটু দম নিয়ে বলে।

—শোনা নয়, দেখে এলাম সামন্ত মশায়। পাঁচখানা গ্রামের লোক জুটেছে শিবথানে। মেয়েমদ্দ সবাই। ওই যে তারানাথ পণ্ডিতের নাতনী—তোমাদের মাষ্টারনী, লেগেছে কোমর বেঁধে। ভালো দিন পড়েছে হে! পুটিকে বললাম যাবি না মিটিংএ তা মেয়ে কি শোনে কথা?

আর শুনবেই বা কেন বলো, বিয়ে থাও দিতে পারলাম না। কি আর করবে? তাই বেরিয়ে পড়েছে। প্রাণগোপালকে দেখলাম—সেও বক্তৃতা করবে বোধ হয়। কি সব দরখাস্তে সই—টিপ ছাপ দিচ্ছে সবাই। দ্যাখো আবার কি আসে।

বলহরি সামন্ত চুপ করে আছে।

বিনয়বাবু বলেন,

—স্কুলের হিসাবটা ঠিক করে রাখো বলহরি। টাকা ভেঙ্গে থাকলে পুষিয়ে দাও। ওরা আর ছাড়বে না এইবার। প্রাণগোপালও এগিয়ে এসেছে।

বলহরি ভাবছে। ভাবনায় পড়েছে সে। প্রাণগোপালকে সত্যি ভয় করে তার।

বিনয়বাবু ওদের চিঠিখানা দেখান। বলহরি চমকে ওঠে। এতদিন পর প্রতিপক্ষ মাথা তুলেছে। স্কুলের সবকিছু হিসাব পেশ করতে হবে জেলা অডিটারের সামনে। গঙ্গাধরের কথা তাহলে মিথ্যা নয়। প্রাণগোপালই এসব করেছে।

বিনয়বাবু কঠিন স্বরে বলেন,

—বলহরি, টাকাটা তুমি জমা দিয়ে দাও তিনদিনের মধ্যেই।

বলহরি আমতা আমতা করে, - দেখি স্যার।

—দেখার কিছুই নেই। এতোদিন এইসব করেছো জানতাম না। তোমাকে বিশ্বাস করে ঠকেছি আজ। টাকাটা দিতে হবে।

বলহরি চতুর লোক। তাই এখানে বসে অস্বীকার করে না। বলে,

—দেখি স্যার। দোব। দিয়ে দোব।

কোন রকমে বের হয়ে এসে আবার সে অন্য মানুষে পরিণত হয়। সে নিজে ধরাছোঁয়ার মধ্যে নেই! বলহরি বুঝেছে এবার বিপদ আসছে। বিনয়বাবুও সেই বিপদ থেকে বাঁচবে না। ওর কাছ থেকে যেটুকু পাবার সবই সে শুষে নিয়েছে। এখন ওখানে থাকলে সেও বিপদে পড়বে। তাই মনে মনে সে তার পথ ঠিক করে নিয়েছে।

বিনয়বাবু এখন অনেক পেয়ে এবার ওসব পথ থেকে সরে একটু পরিষ্কার থাকতে চান। নামডাকও হয়েছে, টাকাও। কিন্তু বলহরি সামন্তের আরও চাই। তাই নিজেই এবার পথ করে নেবে।

বেশ কিছুদিন কাজকর্ম বন্ধ রেখেছিল বলহরি ওই নীরোদের দলের ভয়ে। আবার পুরোদমে কাজ স্থুরু করেছে ক'দিন থেকে। গোঁসাই বাড়ির বিরাট পাঁচীলের আড়ালে ভাঙ্গা ঘরগুলোয় বড় বড় উনুনে মদ চোলাই হচ্ছে। আবার চালান হচ্ছে সেগুলো। তাই নিয়ে ক'দিন ব্যস্ত ছিল বলহরি। বিনয়বাবুর ওখানে যায়নি।

বলহরিকে ডাকতে এসেছে তাঁর দ্বারোয়ান। বিনয়বাবু এখুনি যেতে বলেছেন।

বলহরি জানে কেন ডাকতে এসেছে লোকটা। তাই যেন শুনেও শোনে না।

—এ বাবু চলিয়ে! আমার সাথে যেতে বলেছেন বাবু!

বলহরির সম্মানে বাধে। ধমক দিয়ে ওঠে সে।

—তোর বাবুর কি কেনা চাকর আমি? যাবো যখন সময় হবে।

লোকটাও অবাক হয়েছে বলহরির মুখে এই কথা শুনে। সে তখনও দাঁড়িয়ে থাকে। বলহরি ধমকে ওঠে—দাঁড়িয়ে আছিস কেন? বল্লাম তো বাবা—পরে যাবো। যা।

দ্বারোয়ান চলে গেল। বলহরি গজগজ করে—গেলাম আর কি? কইরে মাল তৈরী হল?

বিনয়বাবুও জানতেন বলহরি সামন্ত এমনি কথাই বলবে। ওই লোকটা এইবার থেকে এড়িয়ে চলবে তাকে। বিনয়বাবুর গোপন অনেক খবর জানে লোকটা।

ওকে এতখানি বিশ্বাস করা ঠিক হয়নি। ওকে এইবার বিপদে ফেলে সরে যাবে বলহরি। বিনয়বাবুর সামনে আজ এমনি নানা ভাবনা। তার একমাত্র সন্তান শুভব্রত তাকে এ সময় সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে ভেবেছিলেন তিনি, কিন্তু শুভব্রতও তাকে চরম আঘাতই দিয়েছে। ওঁর অর্থের দিকে লোভ তার নেই। বিনয়বাবুর মতকে, এই লোভী মনোবৃত্তিকে সে সমর্থন করেনি।

এসব ছেড়ে দিয়ে সে নিজের পথ বেছে নিয়েছে। বিনয়বাবুর সঙ্গে তেমন সম্পর্কও রাখেনি।

শুভব্রত বাবার অমতেই সহরের কলেজে অধ্যাপনা সুরু করেছে। খবরটা জানায় সে মাকে। বাবাকে জানাবার দরকারও বোধ করেনি সে। এমনি করে বিনয়বাবুকে ওরা সবাই দূরে ঠেলে দিয়েছে।

বিনয়বাবু চুপ করে বসে আছেন।

বৈকালের আলো নামছে—সোনালী আলো। দুপুরের সেই অভ্রাবাদ গ্রামের ওদিকে বিস্তীর্ণ গেরুয়া প্রান্তরে কি শূন্যতার হাহাকার এনেছে। পাতাগুলো হলুদ হয়ে ঝরে ঝরে পড়ে। বিবর্ণ পত্রহীন ডালগুলো আকাশে হিজিবিজি আখরে কি শূন্যতার কাব্য রচনা করেছে।…বাতাসে তখনও শীত-শেষের রুক্ষতা জেগে আছে।

বিনয়বাবুর জীবনেও যেন এমনি সর্বহারার শূন্যতা এসেছে। ঝরেই যায় সবকিছু। জীবনের এতদিনের চেষ্টা—দর্শন, অর্জনের ব্যাকুলতার মাঝেও কোথাও একটা চিরন্তন সত্য রয়ে গেছে। সবই ঝরে যায়, হারিয়ে যায়।

এমনি করেই মানুষ একদিন শূন্য হয়ে শূন্য হাতে সরে যায় পৃথিবী থেকে।

বলহরি আজ তাকে অস্বীকারই করেছে কঠিন ভাষায়। তাকে এড়িয়ে গেছে। বিনয়বাবু তার কাছে অমনি শূণ্যপ্রায় একটি মানুষ বলেই গণ্য হয়েছেন। তাঁর সেই অর্থহীনতার কথা কঠিন-ভাবে জানিয়েছে তাঁরই সন্তান ওই শুভব্রত।

তার চিঠিখানায় একবার চোখ বুলিয়ে তিনি কমলার হাতে সেখানা ফেরৎ দেন।

কমলা দেখছে স্বামীকে। কঠিন সেই মানুষটার অন্তরের মধ্যে আজ একটা ঝড় উঠেছে।

—কি ভাবছো?

স্ত্রীর ডাকে বিনয়বাবু ওর দিকে চাইলেন, দুচোখের দৃষ্টিতে একটা নীরব অসহায় ভাব। বলেন,

—শুভো আমাকে জানালেও পারতো। সরে থাকতে চায় থাকুক, বাধা আমি দেব না।

— জানাতে সাহস পায়নি! কমলা ছেলের হয়ে কথাটা জানায়।

হাসেন বিনয়বাবু।

—ভয়! এতবড় একটা প্রতিবাদ যে করতে সাহস পায় জানাবার সাহস তার নেই এটা আমি বিশ্বাস করি না। প্রয়োজনও বোধ করেনি সে।

চুপ করে থাকে কমলা।

আজ মনে হয় তার স্বামী সত্যই হেরে যাচ্ছেন। বিনয়-বাবু বলেন,

—এতদিন এত পরিশ্রম করে যা কিছু করলাম, তার দাম যে কানাকড়িও নয়, সেই কথাটাই কঠিনভাবে প্রমাণ করতে চায় ওরা। কিন্তু তাহলে কি নিয়ে ওরা বাঁচবে বলতে পারো? আমি কি ভুল পথেই চলেছি এতদিন! এসব ভুল কাজই করেছি? তাহলে এর জন্য জীবনের সব শান্তি সব সুন্দরকে গলা টিপে মেরে এত জ্বালা কুড়োলাম কেন বলতে পারো?

কমলা এর জবাব কি তা জানে না। তবে মনে হয় কোথায় একটা বিরাট সংঘাত ঘনিয়ে উঠেছে। দুটো মতবাদের সংঘাত। আজকের দিনের লোভী, নীতিহীন মানুষের সামনে মাথা তুলছে নতুন একটি মানুষের দল যারা ঘৃণা আর কাঠিন্য দিয়ে এই ঘৃণ্য জীবনকে আঘাত হানতে উদ্যত হয়েছে। শুভব্রতও তাদেরই দলে।

হঠাৎ পড়ন্ত রোদে নির্জন প্রান্তরের বুকে লাল কাঁকরের রাস্তা দিয়ে একটা সাইকেল রিক্সাকে আসতে দেখে চাইলেন। প্রাণগোপাল আর নীলা ফিরছে সহর থেকে।

...বিনয়বাবু একটু অবাক হন।

নীলাকে চেনেন, কাজের মেয়ে। নিজের পরিশ্রমে আর বুদ্ধিতে সেইই স্কুলটাকে গড়ে তুলেছে। প্রাণগোপাল এতদিন সব কিছু এড়িয়ে ছিল, আজ আবার সেও মেতে উঠেছে।

এসব খবর কিছু কিছু শুনেছিলেন তিনি।

কিন্তু আজ দেখছেন এটা মিথ্যা নয়। সেই নিস্প্রভ প্রাণ-গোপালের চোখে মুখে কিসের সাড়া জাগে।

বিনয়বাবু ওদের দুজনের দিকে চেয়ে থাকেন।

নিজের সেই হতাশাময় জীবনটাকে আজ আরও বেশী করে শূন্য আর ভুলেভরা বলেই মনে হয় বার বার। ওদের তুলনায় আজ তিনি যেন ক্লান্ত, পরাজিত।

তবু সেই নিভে আসা আগুনের জ্বালাটা জ্বলতে থাকে। এতদিনের এই জয়, এই প্রতিষ্ঠাকে তিনি এমনি করে হারাতে পারবেন না।

চাকরটাকে বলেন,

—একবার গঙ্গাধরকে ডেকে আন। বলবি শীগগীর যেন আসে।

কমলা স্বামীর দিকে চেয়ে থাকে। ওর মুখ চোখের ভাব বদলে গেছে। আবার যেন চাপাপড়া ছাই-এর অতল থেকে ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে।

—কি হল আবার?

কমলার কথার জবাব দিলেন না বিনয়বাবু। নীচের বৈঠক-খানায় নেমে গেলেন। সব সমস্যাকে এইবার তিনি নিজেই সমাধান করবেন।

কমলা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ওই লোকটির দিকে। ওকে এতদিন পরও ঠিক চিনতে পারেনি।

হঠাৎ ঝড়ের মতই এসে পড়েছে তারা রাতের অন্ধকারে।

একটা জিপ আর পিছনে এক লরী ভর্তি পুলিশ এসে নিমেষের মধ্যে বাড়িটার চারিদিক ঘিরে ফেলে। কোথাও ফাঁক নেই। কোনোদিকে পালাবার পথ নেই। বেড়াজালে চারিদিক ঘিরে ফেলেছে। বলহরি সামন্ত ভাবতে পারেনি অতর্কিতে এমনি করে তার ডেরায় হানা দেবে তারা।

নতুন করে আজ মাল চাপিয়েছে। অনেক টাকার মাল। সে সব সরাবার কোন পথ নেই। টর্চের আলো পড়েছে এদিক ওদিকে সন্ধানী আলোর ঝলকে।

বঙ্কিম দু হাঁড়ি মাল নিয়ে পালাচ্ছিল ভাঙ্গা পাঁচীলের ফাঁক দিয়ে। হঠাৎ তাকে কে ধরে ফেলে। হাঁড়ি দুটো কেড়ে নিয়েছে। পালাতে যাবে সে, কোমরে একটা আঘাত পেয়ে ছিটকে পড়লো। ওঠবার সাধ্য নেই। ওদিকে কাকে ধরে ফেলেছে তারা।

বলহরি হকচকিয়ে গেছে। তাকে পালাতেই হবে। প্রমাণ করতে পারবে না ওরা সেইই এসবের নায়ক। তাই মোটা দেহ নিয়েই ভাঙ্গা পাঁচীল টপকে ওদিকে প্রাণগোপালের বাড়িতেই পড়েছে।

অন্ধকারে চারিদিক দেখছে, না - কেউ নেই এখানে।

সিঁড়ির তলায় অন্ধকারে লুকিয়ে থাকবে কিছুক্ষণ। তারপর সুযোগ বুঝে মন্দিরের দিকে পালাবে।

ওপাশে তখন দক্ষযজ্ঞ সুরু হয়ে গেছে। পুলিশ ঢুকে পড়েছে আস্তানায়। মালপত্র সব আটকেছে। দু একজনকে ধরে প্রহারও দিচ্ছে বোধ হয়। ওদের আর্তনাদ কানে আসে। ভীরু শয়তান বলহরি এপাশের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সরে এসেছে।

বাঁচতেই হবে তাকে। পালাবে সে!...

এতকাল পরে তাকে এমনিভাবে কোণঠাসা হতে হবে ভাবেনি বলহরি। চাকাটা আজ যেন কেমন ঘুরে গেছে। অন্ধকারে ভীত পলাতক একটা জানোয়ারের মত দাঁড়িয়ে আছে বলহরি।

প্রাণগোপাল এতকাল পর আবার জেগে উঠেছে। সেদিন শহরে গিয়ে দেখেছে এখনও তার করার অনেক কিছুই আছে। তাই এই পুঞ্জীভূত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে মাথা তুলেছে।

জানতো একদিন বলহরির উপর হামলা আসবেই। কিন্তু সেটা যে এত শীগগীর এমনিভাবে এসে পড়বে তা ভাবেনি প্রাণ-গোপাল।

এতকাল ওই লোকটা এখানের মানুষের মনে কি লোভ লালসা আর পাঁকের নোংরামি জমা করে দিয়েছে। অনেকেরই সর্বনাশ করেছে। গ্রামের আকাশ বাতাস—লোকগুলোর অনেকের মন সে বিষিয়ে তুলেছে।

আজ তার এ পর্বের শেষ হোক।

তাই চেয়েছিল মনে মনে প্রাণগোপাল। অন্ধকারে পুলিশের বাঁশীর শব্দ উঠেছে। টর্চের সন্ধানী আলো পড়ছে এদিকে ওদিকে।

কে পুকুরের জলে লাফ দিতে গেছে পালাবার জন্য, তারও রেহাই নেই।

ওরা জলে নেমে তাকে তুলে এনে নির্দয়ভাবে পেটাচ্ছে।

—বলহরি কোথায় ? জবাব দে ?

লোকটা মার খেয়ে জলে চুবুনি খেয়ে চিঁ চিঁ করে। নেশা ছুটে গেছে তার। মিন মিনে গলায় বলে।

—তা জানিনা আজ্ঞা। বাবুতো ইদিকেই ছ্যালেন।

ওরা খুঁজছে বলহরিকে। ধূর্ত লোকটা ওদের চোখে ধূলো দিয়ে কোনদিকে সরে গেছে অন্ধকারে। ডাঙ্গার একটু দূরেই শাল বন। প্রাণের ভয়ে বলহরি রাতের বেলাতে ওই শাল বনেও ঢুকতে পারে। একবার পালালে আর তাকে ধরা যাবে না। প্রমাণ করাও যাবে না যে সে এই সব ব্যাপারে জড়িত ছিল। ওরা তাই খুঁজছে তাকে।

প্রাণগোপালও শুনেছে খবরটা। এতদূর এগিয়ে এসে

বলহরি আবার জাল কেটে বেরুবে এটা সেও ঘটতে দিতে চায় না।

নেমে আসছে প্রাণগোপাল সিড়ি দিয়ে।

নীচের ভাঙ্গা ঘরগুলোয় কেউ থাকে না। একটা ঘরে কয়েকটা দুধেল গরু বাঁধা থাকে। গোয়াল বাড়ি ভেঙ্গে পড়েছে। তাই তারাও এসে ঠাঁই নিয়েছে বসত বাড়িতে।

অন্ধকারে হঠাৎ কাকে সিড়ির কোণে আবছা অন্ধকারে লুকিয়ে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়াল প্রাণগোপাল।

বলহরি ওকে দেখে ফেলেছে।

এতক্ষণ মনে মনে সে অনেকের কথাই ভাবছিল। নীরোদ আর তার দলবল তাকে এমনিভাবে আঘাত দেবে তা ভাবতে পারে নি। চায় ও নি।

তারা দরকার হলে তার মাল লুঠ করে নেবে।

কিন্তু পুলিশে খবর দেবার লোক তারা নয়। পুলিশকে তারাও এড়িয়ে চলে সাবধানে।

মনে হয় এই সবকিছু ওই প্রাণগোপালেরই কাজ। নইলে এতদিন এতকাণ্ড করেছে, বাধা দেয় নি কেউ। দিতে সাহস করে নি। কিছুদিন হল প্রাণগোপাল আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

স্কুলের ব্যাপারে তাকে ওরা আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। আজ আবার রাতের অন্ধকারে তাকে চরম আঘাত দিতেও দ্বিধা করে নি।

এতকাল এসব হয় নি। এবার তার কারণটা বুঝতে পারে। ধরা সে দেবে না।

প্রাণগোপালও থমকে দাঁড়িয়েছে।

—কে? কে ওখানে?

বলহরি লাফ দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। হাতে তার একটা

রিভলবার। ওটা সে প্রায়ই সঙ্গে রাখে। বিশেষ করে নীরোদের দলের সঙ্গে মন কষাকষির পর থেকেই সাবধান হয়ে থাকে বলহরি। রিভলবারটা সঙ্গেই রাখে।

বলহরি জবাব দেয় চাপা কণ্ঠে।

—আমি! চুপ করে থাকবে। কথা বলেছো কি তোমাকে শেষ করে দোব।

প্রাণগোপালও আবছা আলোয় দেখছে ওর হাতের অস্ত্রটা।

অতীতে একদিন দিনের আলোয় ওই বলহরির সামনে সে বন্দুক তুলছিল। শেষই করে দিতো তাকে, কিন্তু দেয়নি। যেন দয়া করে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

আজ! সেই বলহরি আজ তারই সামনে রিভলবার তুলে তাকে থামাতে চায়। বাধা দিতে চায়, পালাতে চায় সে—তাই দরকার হলে তার চরম শত্রুকেই আজ শেষ করে অতীতের সেই দিনের শোধ নেবে সে।

দিন বদলে গেছে। আজ ওরাই শুধু বাঁচতে চায়। যে কেউ তাদের স্বার্থে বাধা দেবে, তাকে ওরা ওই অস্ত্র দেখিয়ে থামাবে।

প্রাণগোপালের অন্তরে সেই চাপা পড়া শক্তিটা ঠেলে উঠছে। প্রাণের ভয় সে করে না। জানে বলহরি তার চেয়ে অনেক ভীতু।

প্রাণগোপাল নিমেষের মধ্যে একটা থামের আড়ালে সরে গেল। বলহরি লাফ দিয়ে এসেছে। বিশাল দেহখানা নিয়ে ওকে যেন পিষে মারবে। কিন্তু তার আগেই প্রাণগোপাল সরে গেছে ক্ষিপ্র গতিতে। নিজের বেগ সামলাতে পারে না বলহরি। হুমড়ি খেয়ে ভারি দেহটা নিয়ে সশব্দে আছড়ে পড়ল থামের উপর।

প্রাণগোপালও তৈরী ছিল।

ওর হাতের রিভলবারটা ছিনিয়ে নিয়ে রুখে দাঁড়াল।

এবার শিউরে ওঠে বলহরি।

ততক্ষণে পুলিশের লোক এসে পড়েছে। বলহরির দুটো হাত

ধরেছে দুজনে। তবু উন্মাদ বন্দী একটা পশুর মত বলহরি গোঁ গোঁ করছে আর নিজেকে ছাড়াবার বৃথা চেষ্টা করছে। দারোগাবাবুর দিকে চেয়ে থাকে বলহরি।

—আপনি স্যার!

অবাক হয় বলহরি। সেই নিরীহ গোছের মানুষটি ওই খাকি পোষাকের আড়ালে বদলে গেছে। তিনি জবাব দেন,

—হ্যাঁ! চিনেছেন তাহলে? আপনাকে কিন্তু অনেক আগেই চিনেছিলাম আমি। শুধু সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। এখন চলুন মালপত্র সমেত আপনাকেও থানায় যেতে হবে।

—আমাকে কেন? ওসব কার না কার মাল।

বলহরি হাড়ি চোলাই-এর বড় জ্বালা, তাজা মদ ওই বাখর-মাখানো কাঁচা মালের দিকে চেয়ে দেখছে। বেশ জোর গলায় হুঙ্কার দেয় সে,

—আমাকে নিয়ে যাবেন কেন?

—থানায় গিয়ে জবাব দেবেন। জমাদার—বাবুকে গাড়িতে নিয়ে গিয়ে তোল। হুঁশিয়ার, যেন আবার না পালায় এবার। ওরা দুজনে বেশ শক্ত করে ধরেছে বলহরিকে। আজ সে ওদের কাছে মদ চোলাই-এর আসামী ছাড়া আর কিছুই নয়। তবু দয়া করে গাড়িতেই তুললো তাকে।

অন্ধকারে এতখানি পথ এমন একজন নামকরা আসামীকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।

বলহরি কাকে যেন বলে,

—খবরটা বিনয়বাবুকে একবার পৌঁছে দিও!

দারোগাবাবুকে তবুও শাসায় বলহরি।

—নিরীহ একজন নাগরিককে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু বিনা দোষে। আমি নালিশ করবো।

দারোগাবাবু বলেন,

—তার জবাব পরে দেবো। এখন গাড়িতে উঠুন।

ওর এতদিনের সাজানো কারখানা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তছনছ করে দিয়েছে। বলহরি গাড়িতে বসে ফুঁসছে।

—অন্যায় জুলুম আপনাদের।

কথাটা বিনয়বাবুও শোনেন, ওই বলহরির কথা। গঙ্গাধরই খবরটা নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেয়।

—অল গন্ স্যার। পুলিশ রেড। বলহরি ক্যাচ কট্ কট্।

বিনয়বাবু কথাটা শোনেন চুপ করে। হঠাৎ অতর্কিতে এমনি আক্রমণ হবে তা ভাবতেও পারেন নি। বলহরির ব্যবহারে বেশ চটে উঠেছিলেন বিনয়বাবু।

স্কুলের খাতাপত্র টাকা পয়সার ব্যাপারে ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু বলহরি আসার প্রয়োজন বোধ করেনি। বরং বেশ কড়াভাবেই চাকরটাকে জানিয়েছিল—বিনয়বাবুকে সে আর পরোয়া করে না।

বিনয়বাবুকে বিপদেই ফেলেছে সে।

তবু আজ বলহরির ব্যবসায়ে পুলিশের এই নজরের কথা ভেবে একটু ঘাবড়ে যান বিনয়বাবু। বলহরি জানে বিনয়বাবুর অন্ধকারের অনেক ব্যাপার।

মদের চালান—শহরে সেই সব বাড়িগুলো—যেখানে একটা শ্রেণীর রাতের আমোদ আহ্লাদ চলে, সেগুলো তিনি বলহরির মারফৎ করেন।

যদি এসব প্রকাশ হয়ে পড়ে, কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বের হয়ে পড়বে। বলহরি নিজে ডুববার আগে তাকেও ডুবিয়ে যাবে। বিনয়বাবুর মান সম্মান তো যাবেই, দেশসেবকের এই সাজা মুখোশের আড়ালে একটি হীন জঘন্য সত্বার নগ্ন ছবি সারা দেশের মানুষের সামনে ফুটে উঠবে।

জীবনে এত বড় বিপদে তিনি পড়েননি। তবু ভিতরের সেই ভাবনাটা চেপে রেখে বলেন,

—ঠিক করেছে পুলিশ। এসব নোংরা কাজ করলে তাকে শাস্তি পেতেই হবে।

গঙ্গাধর মাথা নাড়ে।

—রাইট। আগুন খেলেই আংরা বেরুবে। লোহাচুর খাও—সাবল।

বিনয়বাবুর কঠিন মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে গেল গঙ্গাধর। কথাটা উনি পছন্দ করেননি। গঙ্গাধর মাঝে মাঝে গেঁইয়া নোংরা কথাও দুচারটে বলে ফেলে ভাবের ঘোরে।

বিনয়বাবু কি ভাবছেন।

গঙ্গাধর বলে—মালপত্র সমেত গাড়িতে তুলে থানায় নিয়ে যাবে বোধ হয়।

বিনয়বাবু বলেন,

—কিছু টাকা নাও। কাল ভোরেই সদরে গিয়ে বিভূতি উকিলের সঙ্গে দেখা করো। তাকে দিয়ে জামিনের ব্যবস্থা করে ওকে খালাস করে আনো। বলহরিকে দরকার। স্কুলের মিটিং আসছে।

গঙ্গাধর বলে,

—বিদ্যোৎসাহী হিসেবে আবার তাকে কমিটিতে রাখবেন স্যার? মানে চোলাই-এর কেসের আসামীকে!

—আঃ!

গঙ্গাধর থেমে যায়। বলে,

—না না। তাতে আর বিদ্যোৎসাহী হতে বাধা কি বলুন?

বিনয়বাবু ধমকান ওকে।

—এত কথায় কি দরকার তোমার। একশো টাকা নিয়ে যাও। কাজটা সেরে এসো। বুঝলে?

গঙ্গাধর এসব কাজ বেশই বোঝে। টাকাটা ট্যাঁকে গুঁজে একটু

খুশী মনেই বের হয়ে এল। গোলমাল এমনি সব বাধুক। তার দু'পয়সা আসবে। সদরে গিয়ে ভালো মন্দ খেতে পাবে।

অনেকদিন এসব জোটেনি।

--শোনো।

গঙ্গাধর সিঁড়ির মুখে এসে বিনয়বাবুর ডাকে দাঁড়াল। আবার কি হুকুম হয় কে জানে। সব বোধ হয় নাকচ হয়ে গেল। টাকাটা ফেরৎ দিয়ে শূণ্য হাতে আসতে হবে এইবার। মুখখানা বোদা করে দাঁড়িয়ে থাকে গঙ্গাধর।

—একবার প্রাণগোপালকে কাল আসতে বলো।

—পান্নুকে! গঙ্গাধর অবাক হয়। কেমন যেন উলটো পালটা কথা বলছেন বিনয়বাবু। হঠাৎ তিনি কি ভেবে বলেন।

—থাক। তার দরকার হবে না। তুমি যাও।

গঙ্গাধর হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তর তরিয়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে নেমে আসে।

সারা গ্রামের লোক জমা হয়েছে রাস্তায়। ভোর হয়ে এসেছে। পুলিশ তখনও ভোরের সেই ফিকে আলোয় বলহরির গুদাম বাড়ি, খামার বাড়ি, খানাতল্লাসী করে চলেছে। মদ ধরতে এসে তারা এতবড় শিকার ধরে ফেলবে তা ভাবতেও পারেনি। রাশি রাশি বোতল, টিন, নিশাদল, করবাইড, ধেনো পচাই-এর ড্রাম তো পেয়েছেই। তার বাড়ির গুদাম থেকে বের হচ্ছে গাঁট গাঁট কাপড়, দামী টেরিলিনের থান, রাশি রাশি তামার তার, বাট, পেটি দরুনে দামী ওষুধপত্র, বাক্স বাক্স বিদেশী নানা যন্ত্রের স্পেয়ার পার্টস। তাড়াবন্দী মোটরের টিউব টায়ার নানা কিছু।

সদর থেকে পুলিশের কর্তারাও এসেছেন। বলহরি চুপ করে ঠায় গাড়িতে বসে দেখছে। তার দুদিকে দুজন বন্দুকধারী পুলিশ পাহারা।

ওরা মালপত্র সমেত চলে গেল বলহরি আর ক'জনকে নিয়ে।

বলহরির মুখটা কঠিন হয়ে গেছে।

মেয়েছেলে গ্রামের প্রবীণ বৃদ্ধ বৃদ্ধারাও এসেছেন।

তারানাথ তর্কতীর্থও ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখছিল ব্যাপারটা। সকলেই খুশী হয়েছে। এতকাল ধরে একটা বুকজোড়া অন্যায় পাপকে তারা ভয়ে ভয়ে প্রশ্রয় দিয়েছিল। সেটা আজ প্রকাশিত হয়ে পড়েছে দিনের আলোয়। এর শেষ হোক।

কৌতুহলী জনতার ভিড় বাড়তে থাকে।

তারানাথ ওদিকে প্রাণগোপালকে দেখে এগিয়ে যায়।

প্রাণগোপালকে ঘিরে রয়েছে অনেকেই। অনাদি কর্মকারের মুখে খুশীর আভা। মেয়েদের অনেকেই এসেছে ব্যাপারটা দেখতে।

তর্কতীর্থ বলে,

—পানু ঈশ্বরে বিশ্বাস কর তো এইবার?

—কেন? এই ঘটনার সঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কি কারণ জড়িত থাকতে পারে তা জানে না সে। কি করে এটা সম্ভব হয়েছে তা মাত্র সে আর নীলা জানে। নৃপেনবাবু নিজে এসব ব্যাপারে জেলা ম্যাজিষ্টেটকে বলেছেন।

তবু তর্কতীর্থের দিকে চেয়ে থাকে সে।

তর্কতীর্থ জবাব দেয়,

—ঈশ্বরই সব অন্যায়ের প্রতিবিধান করেন। কালরূপী নারায়ণ। তিনিই মানুষকে সব পাইয়ে দেন, আবার কালরূপে তিনিই সব একে একে কেড়ে নেন। অর্থ, প্রতিষ্ঠা, যশ, পরমায়ু

প্রাণগোপাল জবাব দিল না। হাসে মাত্র

তর্কতীর্থ বলে,

—বিশ্বাস রেখো পানু। শান্তি পাবে।

ভিড় ঠেলে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে আসে মনু।

—পানু ভাই! পানু ভাই—একটা পড়েছে। ইযে ঘটোৎকচ পড়ল গো! এখনও কর্ণবধ হল নাই কিন্তু!

তর্কতীর্থ হাসে—ভালো আছো মনু?

মনু প্রণাম করে—শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদে ভালোই আছি। ইবার মনে হয় আবার বাঁচবো—চোখ পেলে চেয়ে দেখবো নতুন মানুষগুলোকে। বুকের কলজেতে শেল হেনে দিল—মনে হয়েছিল কি হবে বেঁচে দেশজোড়া পাতকের মধ্যে। আজ ভালো হয়েছে—হেসো না ভাই। মায়ের অপমান করেছে যারা তাদের ভুলো না। মা—বাংলা মা, তারই অপমান!···

গাইছে উদাত্ত কণ্ঠে—বন্দে মাতরম্! সুজলাং সুফলাং –

তারানাথের দু চোখে আনন্দের ছায়া। স্তব্ধ জনতা চেয়ে থাকে ওই অন্ধ লোকটার দিকে। ও যেন একটি অফুরাণ প্রাণসত্বা! ওদের সামনে বিগত দিনেরই ছবিটা ভেসে ওঠে, সংগ্রামমুখর সেই দিন।

বিষ্টুর মা এগিয়ে আসে। বুড়ির দুচোখে জল।

—হ্যাঁরে, আমাদের বিষ্টু! হারানো বিষ্টু আর ফিরবে না?

এর জবাব কেউ দিতে পারে না। এমনি উত্তেজনার দিনে প্রতিবাদের মুহূর্তে রক্তে সাড়া জাগাতে শুনে তাকেই বার বার মনে পড়ে। বিষ্টুদা তারই মধ্যে বেঁচে আছে।

তারানাথ বলে, বুঝলে পানু, উপনিষদে আছে।

—অসুনীতে পুর্ণরস্মাসু চক্ষুঃ।

পুর্ণঃপ্রাণমিহ ন দেহি ভোগম্—

যোক্‌পশ্যেম সূর্যউশ্চুরন্তম,

অনুমৃতে মৃড়য়া নঃ স্বস্তিঃ।

হে প্রাণের দেবতা, তুমি চক্ষু দিও, প্রাণ দিও। আমি যুগ যুগধরে সেই উদীয়মান সূর্যকে দেখবো। এই

সূর্য চেতনা মানুষের চিরন্তন সাধনা। মনু কেন—সব মানুষই তাই বাঁচতে চায় প্রাণগোপাল।

ওদের সকলের চোখের সামনে আজ সেই বাঁচার আশ্বাস। বলহরি এগ্রামের আকাশ বাতাসকে বিষিয়ে দিয়েছিল। তার লোভী হাতটা অশান্তিময় করে তুলেছিল বহু অন্তঃপুরের জীবনকে।

সেই বলহরিকে আজ চরম আঘাত হেনেছে তারা।

প্রাণগোপাল ফিরছে বাড়ির দিকে। হঠাৎ কার ডাকে থমকে দাঁড়াল।

—রমা!

…ওদের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে আছে রমা। সেও ওই ভিড়ের মধ্যে ব্যাপারটা দেখতে গিয়েছিল। মনে মনে খুশী হয়েছে রমাও ওই ব্যাপার দেখে। বলহরির ল্যাজে পা পড়েছে এইবার।

রমার মনে খুশীর স্বপ্ন।

নীরোদ আবার ফিরে আসবে, নিয়ে যাবে তাকে। রমা আবার নতুন করে ঘর বাঁধবে। সে ফিরে পেয়েছে তার হারানো সব কিছু।

মুখে তাই আনন্দের আভাস জাগে। বলহরির কারবার বন্ধ হয়ে যাবে এইবার। বিনয়বাবুও দমে গেছেন।

ওদের সেই লোভী হাতটা আর তার জীবনের সবকিছু কেড়ে নেবে না। নিজের যা আছে তাই নিয়ে খুসী হতে পারবে সে।

প্রাণগোপাল দাঁড়াল। ওকে দেখছে। কদিনেই সেই মেয়েটি বদলে গেছে। ওর চোখে মুখে হাসির উছলতা। বেশবাসও ছিমছাম। নিজেকে যেন আবার ফিরে পেয়েছে সে যৌবনবতীরূপে।

সেই রাতের দেখা মেয়ে এ নয়—যে তার সব কিছু নিয়ে জীবনের জুয়াখেলায় পাশ দান আড়তে চেয়েছিল।

রমা বলে।

—আমি ফিরে যাচ্ছি।

—সত্যি!

প্রাণগোপালের কণ্ঠে খুশীর সুর।

রমা বলে।

—ও এসেছিল। বুঝলে, মনে হয় মানুষ দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়েই সব কিছুকে নতুন করে চেনে। নিজেকেও চেনে।

প্রাণগোপাল চুপ করে থাকে। বোধ হয় ওই কথাটা তার জীবনেও সত্যি। নইলে আবার এমনি করে প্রাণগাপাল নতুন মানুষ হয়ে উঠবে কেন? জীবনের সেই ভালো লাগাটুকু হারিয়ে গেলে জীবন মরুভূমির মত উষর আর শূন্য বলেই বোধ হয়।

সেই যন্ত্রণার হাত থেকে—সেই অবক্ষয়ের জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে সে। রমাও আবার নতুন করে বাঁচার আশ্বাস পেয়েছে সেই মানুষটিকে কেন্দ্র করে। রমা বলে,

—সেদিন ও এসেছিল। নতুন চাকরী পাচ্ছে চিত্তরঞ্জনের ওদিকে। অজয় নদীর ধারে একটা ছোট্ট বাসা পাবে। তির তির করে বালির বুকে জল বয়ে যায়—ওপারে ফাঁকা ডাঙ্গা। জায়গাটা খুব সুন্দর। সামনের মাস থেকেই চলে যাবো ওখানে।

প্রাণগোপাল বলে,

—তাই যাও রমা। তবু আবার সব নিয়ে বাঁচবে সেখানে।

চুপ করে রইল রমা। এই স্বপ্ন সে নতুন করে দেখছে বার বার। এই বাঁচার স্বপ্ন তার সারা মন জুড়ে। বলহরির কালোছায়া আর পড়বে না নীরোদের উপর।

—খুব ভালো হয়েছে কিন্তু। বলহরি সামন্ত এইবার বুঝতে পারবে মজাটা।

রমার কথার জবাব দিল না।

রমা বলে।

—গাছে না উঠতেই এক কাঁদি। ধন্যি ছেলে যা হোক।

প্রাণগোপাল প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যায়।

—তাহলে এইবার একদিন তোমার বাসায় যাবো ওদিকে গেলে।

—সত্যি!

রমা মনে মনে খুশী হয়। সেও দেখাতে চায় ওকে তার নিজের ঘর, নিজের সব সুখ আর শান্তিটুকুকে।

—এসো একদিন কিন্তু। তার আগে একটা কথা বলবো?

প্রাণগোপাল ওর কণ্ঠস্বরে একটু রহস্যের আভাষ পায়। কৌতুহলী দুচোখ মেলে বলে,

—নিশ্চয়ই!

হাসছে রমা।

—এইবার বিয়ে থা করে ঘর সংসার পাতো। কতদিন আর এমনি থাকবে বলতে পারো? জীবনে এটার সবচেয়ে বেশী দরকার। এটাও নিশ্চয়ই বুঝেছো। এতটুকু ঘর এতটুকু ভালবাসা—এ না হলে এত জ্বালার মধ্যে বাঁচবে কি করে?

প্রাণগোপাল হাসছে।

—বেশতো কথাটা বলে গেলে।

—অনেক দুঃখেই বুঝেছি ওটা সত্যি, তাই বল্লাম।

বলহরিকে ওরা সদরে চালান দিয়েছে অনেক মামলার চার্জে ফেলে।

বলহরি সামন্ত চুপ করে গেছে। তলিয়ে ভেবেছে সে ব্যাপারটা। বিনয়বাবুই তাকে বিপদে ফেলেছে এবার।

নিজের মনের অতলের সেই লোভ আর পাপগুলো আজ পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে। ধীরে ধীরে নিজের বিরাট লাভের জন্য পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলেছিল। তাকে সামনে রেখে ওই নোংরা ব্যবসার ফন্দী তার মাথায় ঢুকিয়েছিল একে একে বিনয়বাবুই।

বলহরিও সেই লোভ সামলাতে পারেনি। নিজেও মেতে উঠেছিল অর্থের লোভে। ক্রমশঃ তার সামনে সব অন্ধকারের পথগুলো প্রকট হয়ে উঠেছিল।

যেদিন বিনয়বাবুকে ছেড়ে নিজের জন্য কিছু করতে গেছে সেদিন বিনয়বাবুই তাকে বাধা দেয়। তবু বলহরি শোনেনি তার কথা। বিনয়বাবুর কাছ থেকে সে দূরে সরে আসতে চেয়েছে। নিজেই কারবার ফেঁদেছে। নীরোদ আরও অনেকের দলের কাছ থেকে নিজেই মালপত্র কিছু নিয়ে কারবার সুরু করেছিল।

বিনয়বাবুর সেটা সহ্য হয়নি। বলহরি তার চেয়ে বড় হয়ে যাবে এটা সে সহ্য করতে পারেনি। চায়ও নি। তাই তাকে এমনি করে বিপদে ফেলতে চেয়েছে।

বলহরি মনে মনে আজ ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলেছে। নিজে যখন ডুবেছে তখন বিনয়বাবুকেও সে দেখে নেবে। তার অনেক কিছুই গোপন খবর সে জানে। কোথায় তার মালপত্র লুকানো থাকে সে খবর রাখে সে। কতগুলো ব্যবসা বেনামীতে চলে তা ও জানে সে। এবার দেখে নেবে এক হাত।

একটু হাওয়া বুঝে মুখ খুলবে সে। তাই যেন ঝড়ের আগেকার গাছগাছালির মত, আকাশের মত তার মনে মুখে একটা থমথমে ভাব জেগে ওঠে।

জেল হাজতে এনেছে তাকে। বলহরি এখানে ওই উকিলবাবুকে নিয়ে গঙ্গাধরকে আসতে দেখে চুপ করে রইল।

গঙ্গাধর বলে—বিনয়বাবু পাঠালেন আমাকে। জামিনে খালাস করে নিতে।

বলহরি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না। কি ভাবছে সে। বিনয়বাবুর অন্য কোন মতলব আছে না তাকে এমনি খালাস করে নিয়ে যেতে চান—ঠিক বুঝতে পারে না। তবু মনে হয় বাইরে তার যাওয়া দরকার। মামলা চালাতে হবে, তাছাড়া সাক্ষীসাবুদও খাড়া করতে হবে তাকে।

তাই বোধ হয় মুখ বুজে ওকালতনামায় সই করে দিল বলহরি।

গঙ্গাধর কাজ গুছিয়ে ফিরতে পারবে এইবার। তবু বেশ কিছু টাকা এদিক ওদিকে হিসাবের বাইরে খরচ হয়ে গেল। কিন্তু না করেও উপায় ছিল না।

গঙ্গাধর বলে—বিনয়বাবুও সদরে আসবেন। এ সব সাজানো মামলা। ওই ব্যাটা পান্নুর কীর্তিই। এখানে এসে এরই মধ্যে ফিল্ড করে গেছে। দেখে নোব এবার ওটাকে।

...বলহরি সামন্ত তবু ওই কথাটা এত সহজে মানতে রাজী নয়। ব্যবসা করছে এতকাল। এখনও লোক চিনতে পারেনি। এ জগতে কে কার শত্রু মিত্র ঠিক বোঝা যায় না। এটা বুঝেছে বলহরি, এ যুগে বিশ্বাস নামক কোন বস্তুই নেই। ওটা যে করে সে হয় নির্বোধ না হয় অসহায়।

তবু বের হয়ে গেল সে হাজত থেকে। একবার শেষ পর্যন্তই দেখবে সে।

গঙ্গাধর বলে—গ্রামে চলুন সামন্ত মশায়, বাবু বাড়ি যেতে বলেছেন আপনাকে।

তখনও বেলা বেশী হয়নি। কোর্টের সামনে বট অশত্থ গাছের মাথায় দিনের হলুদ রোদ বাসা বেঁধেছে। কলরব করছে পাখীগুলো। উকিল মোক্তাররা ব্যস্তসমস্ত হয়ে খদ্দেরের

সন্ধানে ঘুরছে। তবু খাবারের দোকানে বিক্রীবাটা জোর চলেছে। এখানে মানুষ আসে নানা দুশ্চিন্তা নিয়ে, অভাব তাদের নিত্যসঙ্গী। তবু তাদের পয়সাতেই সাক্ষী মোক্তার উকিলের দল দিব্যি বসে বসে রাজভোগ গিলছেন। কোর্টের সামনে মিষ্টির দোকানে তাই ডাবড় সাইজের রাজভোগ, ছানাবড়াই বেশী থাকে।

বলহরির ক্ষিদে নেই। তবু খাওয়ালো ওদের। গঙ্গাধরের শীর্ণ লিকলিকে দেহটা বোধহয় আগাগোড়াই ফাঁপা। এক আসনে বসে সে গোটা আষ্টেক সিঙ্গাড়া আর ডবল সাইজের রাজভোগ খেলো গোটা দশেক। উকিলের মুহুরীও এসে জুটেছে ওই মচ্ছবে।

বলহরির ভাবনা তখন অন্যদিকে।

গঙ্গাধর বলে—চলুন, এই বাসেই বাড়ি ফিরবো বেলাবেলি।

বলহরি জবাব দেয়—আসানসোলে একটু কাজ সেরে পরশু-দিন বাড়ি যাবো।

—সে কি! বিনয়বাবু আপনাকে বাড়িতেই যেতে বলেছেন বার বার করে। বিশেষ দরকার—

বলহরি চটে ওঠে কথাটা শুনে। ও যেন বিনয়বাবুর কেনা গোলাম। মনে হয় বিনয়বাবু তার মুখ বন্ধ করতে চান। তাই বলে বলহরি।

—তাঁকে বলো পরশুদিন গিয়ে দেখা করবো। এখন আমার দরকারে আসানসোলে যেতে হচ্ছে।

আর কথা বাড়ানোর প্রয়োজন বোধ করে না বলহরি। দাম মিটিয়ে দিয়ে সে উঠে এগিয়ে গেল রিক্সার সন্ধানে।

গঙ্গাধর বিপদে পড়ে। হাতে মিষ্টির ঠোঙ্গাটা নিয়েই উঠে পড়ল সে। তখনও খাওয়া হয়নি। রাজভোগে কামড় দিতে দিতে ওর পিছু পিছু চলেছে।

—মানে তিনি বললেন—

বলহরি জবাব দিল না। একটা রিক্সায় উঠে হুকুম করে।

—ষ্টেশনে চল।

রিক্সাটা বেরিয়ে গেল। রাজভোগ গঙ্গাধরের মাথায় উঠে গেছে। বিপদেই ফেলে গেল তাকে বলহরি। ওকে বিশ্বাস নেই। কে জানে কোথায় ডুব দেবে এইবার। হয়তো মামলার দিন পড়লে আর হাজিরই হবে না। কোথায় গা ঢাকা দিয়ে থাকবে। আর জামিন্‌দার হয়েছে সে নিজে।

গঙ্গাধরের হাত পা কাঁপছে। এমন সুখের খাওয়াটাও বিষবৎ ঠেকে। তবু কি ভেবে বাকী রাজভোগ দুটো শেষ করে কলে মুখ লাগিয়ে খানিকটা জল গিলে বাসষ্টাণ্ডের দিকে এগোল। এখনি বিনয়বাবুকে খবরটা জানাতে হবে।

কি সব শুকনো বিপদে জড়িয়ে পড়লো তা জানে না সে। এইবার তাকে নিয়েই টানাটানি হবে। বলহরির মতলব সুবিধের নয় এটা বুঝেছে।

বিনয়বাবু কোন ধরা ছোঁয়ার মধ্যেই নেই। ওর জামিন নামায় গঙ্গাধরই সই করেছে। এবার তাকেও ছাড়বে না পুলিশ। গঙ্গাধর অজানা ভয়ে শিউরে উঠেছে।

...বিশাখা ওই ঘৃণ্য জীবন থেকে সরে আসতে চায়। ইতিমধ্যেই তার নাম বের হয়েছে। গান ও গায় সে। এতদিন গাইতো সে ভজন—ঠুংরী এইসব। সেই ঘৃণ্য জীবন থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করছে। বিশাখার মনে হয়েছে এইবার যেন পথ পেয়েছে সে। ইতিমধ্যে সহরে এবং আশ-পাশের কারখানার ক্লাবে, সংস্থায় গানের আমন্ত্রণ আসে তার। সে জন্য কিছু কিছু টাকাও পাচ্ছে। কলকাতার আসরেও ডাক আসে।

তবু এতে যেন মন ভরে না। আরও কিছু পেতে চায় বিশাখা। অতীতের ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। ···সুরময় আত্মনিবেদনের মাধুর্যভরা একটি জগৎ।

প্রভাতও দেখেছে বিশাখাকে। তার চেষ্টা, আগ্রহ এবং প্রতিভা প্রভাতবাবুর দৃষ্টি এড়ায় নি। বিশাখা ওই নোংরা পরিবেশের বাড়ি থেকে বের হয়ে এসে মুর্গাসোলের ওদিকে ছোট একটা বাড়ি নিয়েছে। কোন মতে দিন চলে মাত্র। যা কিছু সঞ্চয় ছিল তাই ভাঙ্গিয়ে দিন চালায়।

ওখানে বেশ কিছু রোজগার হতো বিশাখার। সহরের অনেক ধনী কাঁচা পয়সাওয়ালা লোকই আসে ফুর্তি করতে। টাকার কোন দাম নেই তাদের কাছে। কিন্তু বিশাখার সেই জীবনের উপর এসেছে নিদারুণ ঘৃণা আর অপমান। ওখানের জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে সে।

আজ গানের জগতেই হারিয়ে গেছে সে। ধীরে ধীরে উঠছে। কোনরকমে দিনও চলে তার।

প্রভাতবাবুই বলে,

—এইবার পদাবলী কীর্তনই শেখো বিশাখা।

বিশাখাও সারা মন দিয়ে তাই চেয়েছিল। ওই কীর্তনের সঙ্গে তার যেন নাড়ির যোগ। তার জীবনের বহু সুখস্মৃতি জড়িয়ে আছে ওই সুর—ওই আত্মনিবেদনের সঙ্গে। একজনের কথা মনে পড়ে। প্রাণগোপালকে সে আজও ভোলেনি! সব স্মৃতির অতলে তার মুখ উজ্জ্বল একটি বিন্দুর মত জেগে থাকে।

যেন রাতের আকাশে ও জাগর একটা শুকতারা।

ধীরে ধীরে নিজের জীবনকে তারই স্মৃতিতে উজ্জ্বল করে তুলেছে সে। আজ সে নাম করেছে কীর্তনীয়া হিসাবে। সুন্দর সাবলীল ভঙ্গীতে তার মান মাথুর পালা গান সাড়া এনেছে এখানে, কলকাতার আসরেও যায় সে।

সন্ধ্যা নেমেছে। ক'দিন বাইরে পালা গান করে ফিরছে বিশাখা। শরীরটাও ক্লান্ত। আজ বাড়িতে একাই ছিল।

ধোঁয়াটে অন্ধকার নেমেছে ওদিকে,…রাস্তার আলোগুলোকে ঘিরে কুয়াসার ফিকে আবেশ জমে।

দরজার কড়া নাড়ছে কে! এ সময় কারোও সঙ্গে দেখা করতে চায় না বিশাখা। প্রভাতবাবুও নেই এখানে। কেউ হয়তো গানের কথা বলতেই এসেছে।

তাই ঝিকে বলে বিশাখা,

—বলে দে, এখন দেখা হবে না। কাল সকালে আসবেন।

দরজা খুলে ঝি সেই কথাটা বলতে যায়। কিন্তু লোকটা তার কথা শোনে না। তার বাধা সত্ত্বেও লোকটা হুড়মুড় করে এসে ওপাশে বিশাখার ঘরের সামনে গিয়ে হাজির হয়। পর্দা ঠেলে ঢুকে পড়ে।

পায়ের শব্দে বিরক্ত হয় বিশাখা। এ সময় বিশ্রাম করছিল সে। গায়ের কাপড় চোপড়ও এদিক ওদিক হয়ে আছে। এ সময় ওকে এভাবে ঢুকতে দেখে বিরক্ত হয়ে ওঠে।

—আপনি!

অবাক হয়েছে বিশাখা। বিরক্তও হয়েছে এ সময় এখানে ওকে দেখে। বলহরি এগিয়ে আসে। আজ সে ক্লান্ত, মনে তার কঠিন দুশ্চিন্তার বোঝা। তবু সব ভুলে থাকার জন্যই আজ সে এখানে এসেছে। বলহরি ওকে দেখছে।

সেই বিশাখা আজ বদলে গেছে। কয়েকমাস আগে দেখেছিল তাকে। তারপর এদিকে নিজে আসতে পারেনি। নীরোদের দলের সঙ্গে ঝগড়ার পর থেকে বলহরিও সাবধান হয়ে সরে গিয়েছিল। আজকের বিশাখার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে শান্ত একটি শ্রী।

বিশাখার লোকটাকে দেখে মায়া হয়।

—বসুন সামন্ত মশায়। শরীর খারাপ নাকি ?

বলহরি বেশ বুঝেছে এই ক'দিনে তার ভিতর বাহিরে একটা ঝড় বয়ে গেছে। তারই চিহ্ন ফুটে উঠেছে তার মুখে চোখে। তবু বলহরি সেই উৎকণ্ঠা ঢাকবার জন্যই বলে,

—না! ক'দিন খুব খাটা খাটুনি হয়েছে কিনা।

—একটু চা আনি।

বের হয়ে গেল বিশাখা। বলহরি একটু নিশ্চিন্ত হয়। বিশাখা তাহলে শোনেনি তার খবর। ওবাড়ি থেকে চলে এসেছে। এখন সে অন্য জগতের মানুষ।

বলহরির হাতে সময় বেশী নেই। বিশাখার ওই নিটোল দেহটা তার মনের অতলের সেই চাপাপড়া জানোয়ারটাকে জাগিয়ে তুলেছে। ধীরে ধীরে মাথা তুলছে সে।

রাতের আবছা অন্ধকার নেমেছে বাইরে। এদিকটা নির্জন। দূরে দেখা যায় ষ্টেশন ইয়ার্ডের আকাশে তোলা সার্চ লাইটের আভা। তার উর্ধের আকাশ লোহা কারখানার স্লাগব্যাঙ্কের এক ঝলক লাল আভায় উল্‌সে উঠেছে। টুকরো সাদা মেঘগুলো যেন স্থির হয়ে আটকে গেছে আকাশের বুকে। বলহরি সামন্ত মনস্থির করে ফেলেছে। আজ সব হারাতে বসে নিজে জানোয়ার হয়ে উঠেছে। মদের একটা ছোট বোতল পকেটেই ছিল। সেটা বের করে গলায় খানিকটা ঢালতে বেশ চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

বলহরি ভাবছে।

সেই তরল পানীয়টা তার নিস্তেজ দেহের তন্ত্রীতে কি চাঞ্চল্য আনে।

হিসাব করে রেখেছে সে। মাঝ রাতে বোম্বাই মেল—না হয় তুন এক্সপ্রেস আসে এখানে। তার যে কোনটাতে উঠে বসবে। কোন দূর পাহাড় বনের মাঝে ছোট্ট কোন লোকালয়ে গিয়ে

উঠবে। না হয় কাশীতেই পালাবে আপাততঃ। ভিড়ে সেখানেই গা ঢাকা দিয়ে থাকার সুবিধা।

বলহরি বিশাখার পায়ের শব্দে সচকিত হয়ে ওঠে। বিশাখা ঢুকছে হাতে চায়ের কাপ আর কটা সন্দেশ নিয়ে।

বলহরির কথায় ওর দিকে চাইল সে।

—বুঝলি বিশাখা। প্রায়ই বলতিস কাশী যাবি। চল—আজ রাতের গাড়িতে দিনকতক ঘুরে আসি। তীর্থ ধর্মো কিছু করি এবার।

বিশাখা হঠাৎ ওর কথায় অবাক হয়ে শুধোয়।

—ব্যাপার কি বলোতো সামন্তমশায়?

ওর কণ্ঠে সন্দেহের সুর যে রয়েছে বলহরি তা বুঝেছে। তবু সহজ ভাবেই বলবার চেষ্টা করে।

—বাঃ রে, সারাজীবন তো অনেক পাপ করলাম। এ্যা! তুইতো নানা কিছু করেছিস—এবার ঠাকুরের নাম করছিস, তীর্থে যাবি না?

বিশাখার মন চায় এমনি মুক্তি। কিন্তু তার উপায় এখন নেই। এদিকে বাঁকুড়া সহরে দুটো আসর বায়না নিয়েছে। কলকাতায় যেতে হবে, কোন ধনী লোকের বাড়িতে আসর বসবে, তা ছাড়া রেডিওতে অনুষ্ঠান করবে। কলকাতায় এবার তার নাম প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এ সময় সব ফেলে যাওয়া যায় না। তা ছাড়া ওই লোকটার কথা বার্তা কিছুই বিশ্বাস করেনা সে।

বিশাখা বলে—এখন তো সময় হবে না সামন্তমশায়। অনেক বায়না নিয়েছি।

বলহরির সারা শরীরের রক্ত যেন মাথায় ওঠে—সময় নেই। নিশুতি সহর। বলহরি গর্জন করে ওঠে।

—যাবি না! তোর ঘাড় যাবে। আজ সতী হয়েছেন।

বলহরির গর্জনে বিশাখা চমকে ওঠে। পালাবার পথ নেই। বলহরি দরজার সামনে রুখে দাঁড়িয়েছে।

—টাকা গয়না যতো চাস দেব। ভালো কথায় না যাস—

বলহরি এখানে নেমে তার আস্তানা থেকে যা পেয়েছে হাতিয়ে নিয়ে সরে পড়েছে। বেশ জানে হয়তো বিনয়বাবু না হয় তার লোকজন এসে পড়বে সেখানে। হয়তো টাকা কড়ি দিয়ে গুণ্ডাদেরও লেলিয়ে দেবে তার পিছনে। তাই তৈরী হয়ে এসেছে বলহরি।

আজ সে মরীয়া। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে বিশাখা।

গ্রামে বিনয়বাবু গঙ্গাধরের পথ চেয়েছিলেন, বলহরিকে জামিনে খালাস করে আনবে সে। তারপর বলহরির মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা করবেন তিনি। গঙ্গাধর একাই ফিরেছে। আসেনি বলহরি, সে পালিয়েছে। উত্তেজিতভাবে পায়চারী করছেন তিনি। কমলাও দেখেছে কদিন ধরে স্বামীর মনে কি চাঞ্চল্য জেগেছে। মনে হয় তার কারণ ওই শুভব্রতের বিদ্রোহ। বাবার সব কাজেরই প্রতিবাদ করেছে সে কঠিনভাবে।

কমলা সান্তনার সুরে বলে।

—এত কি ভাবছো? শুভো ঠিক নিজের ভুল বুঝতে পারবে।

বিনয়বাবুর কাছে ছেলের ওই প্রতিবাদের চেয়েও আজ বলহরির সমস্যাটাই বড়। তার নিজের সব কিছু নির্ভর করছে তারই উপর। ছেলের সমস্যা তার কাছে মোটেই আজ প্রধান নয়। আজ তার সামনে সন্দেহ, বিবাদ আর বিপদ।

গঙ্গাধরের মুখে খবরটা শুনেই দপ করে জ্বলে ওঠেন বিনয়বাবু।

—চলে গেল? কি করছিলে তুমি? তাকে আটকাতে পারলে না? অপদার্থ!

গঙ্গাধর চুপ করে থাকে। জানে এসময় কথা বললেই রাগ বাড়বে। বিনয়বাবু গর্জন করেন।

—কোথায় গেল সেই বলহরি শয়তানটা?

—আসানসোলের দিকেই যাবে বোধ হয়।

—আর তুমি দাঁড়িয়ে রইলে ছবির মত! তোমাকে কত টাকা বক্‌শিস্ দিয়েছে? কতটাকা খেয়েছো তার কাছে?

—টাকা! কি বলছেন স্যার!

গঙ্গাধর অবাক হয়। উল্টে তারই গেছে কয়েক টাকা।

বিনয়বাবু গর্জন করেন,

—পাঁচটা টাকা দিলে তোমরা মানুষ খুন করতে পারো। এক শয়তানকে দেখলাম, তুমি তার চেয়েও শয়তান। টাকা খেয়ে আমার সব কিছু ভেস্তে দিয়ে এলে? কে আছিস?

বাইরেই দ্বারোয়ান একজন ছিল। ডাক শুনে ভিতরে যেতে বিনয়বাবু বলেন - একে আটকে রাখবি আমি না ফেরা পর্যন্ত।

হুকুম দিয়েই বিনয়বাবু বের হয়ে গেলেন।

গঙ্গাধর জানে আটকে রাখার অর্থ কি? সেই জায়গাটাও চেনে সে। নীচতলাকার অন্ধকার গুদোম ঘরেরও নীচে একটা বড় ঘর আছে। সেখানে অনেক মালপত্র জমে আছে। গোপন মালপত্র, সেখানে যদি দুদশজনকে আটকে রাখে কেউ খবর পাবেনা কোনদিন।

তবু ভাল! দ্বারোয়ানজী বোধ হয় দয়া করে তাকে নীচের অন্য একটা ঘরে রাখল। গঙ্গাধর আকুলি বিকুলি করছে।

—দ্বারোয়ানজী!

দ্বারোয়ান নির্বিকার। গঙ্গাধর তবু বিনয়বাবুর পায়ে ধরে তার অপরাধের ক্ষমা চাইবে। এই ব্যাপার নিয়ে বিনয়বাবু এমনি রেগে উঠবে তা জানলে গঙ্গাধর বলহরিকে ছাড়তো না।

—বাবুর সঙ্গে একবার দেখা করবো দ্বারোয়ানজী।

কিন্তু গঙ্গাধর গাড়ির আওয়াজ শুনতে পায়। বিনয়বাবু তখনই হন্তদন্ত হয়ে গাড়ি নিয়ে বের হয়ে গেলেন। কখন ফিরবেন, কবে ফিরবেন কে জানে?

ক্লান্ত গঙ্গাধর মেজেতে বসে পড়ে। অন্ধকার সেই ঘর। বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যার মুখোমুখি সময়। তাই অন্ধকার ছায়া পড়েছে ঘরের মেজেতে। রাগে অপমানে দুঃখে তার দুচোখ ফেটে জল বের হয়।

নালিশ জানাবারও কেউ নেই।

বিনয়বাবু কারবারী লোক। অনেক কথাই ভাবেন। বল হরিকে যেভাবে হোক আটকাতেই হবে। জামিনে খালাস হয়েই তার কাছে না এসে সরে পড়ার কারণ বিনয়বাবু বেশ বুঝেছেন। ও প্রকাশ্যেই এবার তার বিরোধিতা করবে।

বিনয়বাবুর শত্রুর অভাব নেই। তারাও শক্তিমান। বলহরি যদি নিজে বাঁচবার জন্য তাদের কারও আশ্রয় নেয় তাহলেই বিপদ এবং বলহরির মত ধূর্তলোকের পক্ষে এইটাই করা সম্ভব। তাই তার সন্ধানে আসানসোলেই চলেছেন তিনি।

—একটু জোরে চালাও পিয়ারীলাল।

গাড়িটা দামোদর নদীর ব্রীজ পার হয়ে শাল বনের মধ্যে গড়ে ওঠা নতুন কলোনীর চওড়া রাস্তা ধরে ছুটে চলেছে, বৈকালের শেষ আলো নামছে দিগন্তের বুকে শালবন সীমায়।

আদিম আরণ্যক পরিবেশে আজকের মানুষ বসত গড়েছে, এনেছে জীবনের সাড়া। কলকারখানা গড়ে উঠছে।

মানুষের মনে তবু সেই আরণ্যক হিংস্র ভাবটা যায়নি। ক্ষোভ বেড়েছে, বেড়েছে জটিলতা। তাই সে হিংস্র হয়ে উঠছে। আর অরণ্যভূমির দরকার নেই। প্রয়োজন নেই সেই হিংস্র পশুদের। মানুষ তার অন্তরের আদিম আরণ্যক সত্ত্বাকে খুঁজে পেয়েছে এই সভ্যতার পীঠস্থানে। তাই বনভূমি মুছে গেলেও —বন্যতা হারায় নি, তাকে নতুন করে আবিষ্কার করেছে মানুষ।

বিনয়বাবুর মুখটা শক্ত কঠিন, হিংস্র হয়ে ওঠে।

ওরা ক্ষমা করতে জানে না। সব হারালেও জেদ—প্রতিশোধ স্পৃহা মন থেকে হারায় না।

বিনয়বাবু জানেন কাকে দিয়ে কোন কাজ করানো যাবে। তার জন্য বিভিন্ন জায়গায় তার লোক আছে। এক এক জায়গার দল অন্য জায়গার দলকে চেনে না।

বিনয়বাবু সহরে এসেই প্রথমে তাদের ছু একজনকে বলহস্নির খোঁজ নিতে পাঠান বিভিন্ন জায়গায়। কি ভেবে একজনকে বলেন।

—তুই নীরোদকে একবার ডেকে আন। বলবি জরুরী দরকার। নীরোদ যদি না থাকে—কেষ্টকেই সঙ্গে করে আনবি। এখুনিই। লোকটা এসব কাজে পটু। নীরোদ—কেষ্টাকে সে চেনে। তখুনিই দৌড়ল সে কর্তার হুকুম তামিল করতে।

বিনয়বাবু একাই দোতালায় পায়চারী করছেন।

উত্তেজনা চাপবার ওই একটা উপায়। সখ করে বাড়িখানা এখানে তৈরী করিয়ে ছিলেন বেশ কয়েক বিঘা জায়গার উপর। সহরের কোলাহল নেই। ফাঁকা চারিদিক—একপাশে কতকগুলো শিশু গাছ ঘন অন্ধকারকে জমাট করে তুলেছে। ওপাশে সহরের আলোগুলো দেখা যায়।

শুভব্রত এ বাড়িতে নেই। সব কিছু ছেড়ে সে চলে গেছে সহরের ভিতর, কলেজ হোষ্টেলে একখানা ঘর নিয়ে থাকে। বিনয়বাবুর মনে হয় এসব ছুর্বলতাই, জীবনকে সব দিক থেকে দেখার মত সাহস তাদের নেই। তাই নিজেকে বঞ্চিত ভেবেই ওরা মনে জোর পায়, সব কিছুকেই খারাপ বলে তারা আত্মপ্রশান্তি লাভ করে। এটা এক ধরণের মানসিক রোগই।

কারা আসছে।···বিনয়বাবু চুপকরে দেখছেন ওদের ছুজন ছায়া মূর্তিকে। কেষ্টকে নিয়ে এসেছে তার লোক। নীরোদ দল প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। কোথায় গেছে জানে না কেষ্ট। এখন দল সেইই চালায়। তাই বিনয়বাবুকে জানায় কেষ্ট।

—নীরুদা নেই। ফিরতে দেরী হবে, আমিই এলাম।

কেষ্ট জানে দলের অনেক টাকা বাকী আছে এখানে। নীরুদাও কেমন বদলে যাচ্ছে। তবু টাকাটা যদি সে আদায় করতে পারে কাজ হয়। তাই বিনয়বাবুর ডাক শুনে এসেছে কেষ্ট। নীরোদ দলে না থাক, ভদ্রলোক হয়ে যায় যাক। কেষ্টকে তবু বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। তাই সেই-ই এগিয়ে এসেছে।

বিনয়বাবু দেরাজ খুলে তুটো নোটের বাণ্ডিল আগেই কেষ্টাকে ধরিয়ে দেন। দেখছেন ওর মুখের ভাব। যেন কুকুরের মুখের সামনে কিছু মাংস ফেলে দিয়ে মজা দেখছেন তিনি।

কেষ্ট টাকাগুলো কুড়িয়ে নেয় খুশী মনে। দমকা এত টাকা আসবে হাতে—ভাবেনি সে। বিনয়বাবু বলেন—ওটা আগাম। বাকী এক হাজার কাজ শেষ হলে।

—কাজ! কেষ্টাও পাকাপাকি কথা বলতে চায়।

বিনয়বাবু বলেন।

—বলহরি সামন্ত এখানে পালিয়ে এসেছে। তাকে ধরে আনতে হবে এখানে। যেন কেউ টের না পায়।

—ঠিক আছে! এনে দোব, আজই এনে দোব।

কাজটা এমন কিছু নয়। তাই কেষ্টা তখুনিই রাজী হয়ে বের হয়ে যায়। ওরা জানে বলহরিকে কোথায় পাওয়া যাবে।

বিনয়বাবু হাসছেন আপনমনে। বলহরি আর ওরা তুজনেই তার শত্রু।

তবু টাকার জন্য ওরা সবই পারে। আর তিনি! শুভব্রতের কথা মনে পড়ে।

তিনি ওদের সকলের চেয়ে ও ধূর্ত। কৌশলী! ওরা সবাই বোকা, শুভব্রত তারই সন্তান। সে আরও বোকা। নইলে এসব ছেড়ে যেতে চায় কেউ? ছাড়তে পারবেন না বিনয়বাবু,

এর নেশায় মেতে উঠেছেন, তাই তার কাছে সব পাপপুণ্য আজ একাকার হয়ে গেছে।

নীরোদ! সেই লোকটাকে না জানিয়েই কেষ্টা এসেছে। নীরোদ ও দল ছেড়েই দিয়েছে। বিনয়বাবু কেষ্টা আর নীরোদের মধ্যে ও একটা গোলমাল বাধিয়ে দিতে চান, তাহলেই তাঁর লাভ।

বলহরি নীরোদ আর কেষ্টা।··· তিনজনকেই তিনি ঘায়েল করতে চান একই আঘাতে। বলহরি নীরোদ কেষ্টর দল এরা যদি নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোল করে শেষ হয়ে যায়, তার শত্রু আর থাকবে না ···বলহরিকে পেলেই আপাততঃ খুশি হবেন তিনি।

ড্রাইভারকে বলেন—গাড়ি তৈরী রাখ পিয়ারীলাল, রাতেই ফিরতে হবে। পিয়ারীলাল হুজুরের পুরোনো লোক। সে ও জেনেছে একটা গোলমাল হয়েছে। তবু মাথা নাড়ে সে—জী।

বিনয়বাবু বলহরিকে পেলেই ওকে নিয়ে গিয়ে তুলবেন দেশের বাড়িতে। সেখানে যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে, ওর মুখবন্ধ করতেই হবে। আর মুক্তি নেই ওর।

অন্ধকারে পায়চারী করছেন বিনয়বাবু, রাত হয়ে গেছে।

বিশাখা ভাবেনি আবার তার জীবনে এমনি চরম সর্বনাশ ঘনিয়ে আসবে, ওই লোভী শয়তান তার জীবনকে একদিন বিষিয়ে দিয়েছিল। সেই ছায়া সবুজ গ্রামের বুক থেকে তুলে এনে নরকের পাঁকে ডুবিয়ে দিয়েছিল। প্রাণগোপালের স্মৃতি ও মুছে ফেলেছিল মন থেকে।

সব হারিয়ে গেছে তার। তবু বিশাখা আজ নিজের চেষ্টায় আবার ফিরে পেতে চেয়েছে তার জীবনের শান্তি।

সব হারিয়ে আবার নতুন করে বাঁচতে চেয়েছে সে। ওই শয়তানের বিষাক্ত থাবাটা আবার এসে পড়েছে এখানে। তার থেকে বিশাখার নিষ্কৃতি নেই।

মত্তপ কণ্ঠে বলহরি গর্জাচ্ছে।

—যাবি না? না গেলে টুঁটি টিপে তোকে শেষ করে দোব। সব সাধ মিটিয়ে দোব আজ।

আর্তনাদ করছে বিশাখা। ভীত বলহরির শক্ত হাতটা ওকে কাছে টেনে আনবার চেষ্টা করে। প্রাণপণে মুক্ত হবার চেষ্টা করছে বিশাখা।

হঠাৎ লাথি মেরে কারা দরজাটা খুলে ভিতরে ঢুকলো।

—এই যে স্যার!

বলহরি ওদের দেখেই চমকে ওঠে, বিশাখার হাত ছেড়ে দিয়ে নিজেই এবার পালাবার পথ খুঁজছে। ওদেরই কে একজন ধমকে ওঠে।

- চলুন স্যার! নীচে গাড়ি রয়েছে চুপচাপ উঠুন গিয়ে। গোলমাল করলে—

সেই লোকটা পকেট থেকে রিভলবার বের করে এগিয়ে আসে।

—কেষ্ট! বলহরি আর্তনাদ করে ওঠে।

কেষ্টা জবাব দেয়—কথা বলবেন না। চলুন বলছি।

বিশাখা এককোণে ভীতত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওর চোখের সামনে ওই লোকগুলো শয়তান বলহরিকে ঠেলে নিয়ে চলে গেল, যাবার সময় বলে যায় ওরা,

—দরজাটা বন্ধ করে দিন; আর কাউকে বলবেন না একথা।

বলহরি ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে। এতদিন ধরে এরা তাকে খুঁজছিল, আজ তার কাছে জেলখানা আর বাইরের জগৎ সমান হয়ে গেছে। এরা বোধ হয় শেষ করে দেবে তাকে। গাড়িখানা ছুটে চলেছে,

—কেষ্ট, কোথায় যাচ্ছি?

অন্ধকারে কে জবাব দেয়—শ্বশুর বাড়ি নিয়ে যাবো তোমাকে চলো না।

নীরোদের মনে আজ অন্য কামনা। ওই উত্তেজনাময় রাতের অন্ধকারের সেই নীরোদ আজ নতুন করে বাঁচতে চায়। চাকরীটা নিয়েছে।

বাসাও ঠিক হয়ে গেছে। দলের সঙ্গে সম্বন্ধ আর নেই। ওদেরই সব ছেড়ে দিয়ে এসেছে। কেষ্টা দুঃখ করছিল। কিন্তু নীরোদ ওভাবে বাঁচতে চায়নি।

আজ সামান্য নিয়ে সে বাঁচতে চায়। তাই ওপথ ছেড়ে দিয়েছে। মনের অতলে সেই বিনয়বাবুর উপর প্রতিশোধ নেবার স্বপ্নটা ছিল, কিন্তু আজ কেমন খুশী হয়েছে সে বলহরি সামন্তের খবর পেয়ে। একটু নিশ্চিন্তই হয় সে।

বলহরির মুখ থেকেই এবার বিনয়বাবুর অনেক বিচিত্র জীবনের কাহিনীগুলো প্রকাশ হবে আদালতে। ওরা নিজেরাই মরবে এইবার।

নীরোদ গ্রামে এসেছে। এবার সে রমাকে নিয়ে যাবে বাসায়। শনিবার ডিউটি করে এসেছে, রবিবার ছুটি। রবিবারই ফিরে যাবে।

দুটোদিন তার বিশ্রাম। অনেকদিন পর নীরোদ নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম নেবার কথা ভাবে। আজ তার মনে সেই দুশ্চিন্তার ছায়া নেই; উত্তেজনা নেই।

গ্রামের সবুজ পরিবেশে আজ নিজেকে নতুন করে খুঁজে পায় সে। রমার অবসর নেই। নতুন বাসার কথায় সে মত্ত।

—হ্যাগো, চাল কিছু নিয়ে যাই। আর হাঁড়ি কুড়ি—কড়াই বাসনপত্র উনুন এসব কিনেছো তো? তুমি যে রকম ভোলামানুষ?

নীরোদ হাসে।

—আগেও তো ঘর করেছিলাম। এ যে নতুন বৌএর মত শুরু করলে। রমার সুন্দর মুখে সলজ্জ হাসির আভা ফুটে ওঠে।

—যাঃ কি যে বলো তুমি। সব গুছিয়ে নিতে হবে তো।

বুড়িও মনে মনে খুশী হয়েছে মেয়ের হাসি মুখ দেখে। এতদিন তবু মেয়েটা ছিল তার কাছে। আজ বয়স হয়েছে। কবে আছে কবে নেই তাই মন কেমন করে।

রমাই বলে,

—ওখানে গিয়ে গোছগাছ করে তোমাকে নিতে পাঠাবো। এখানে পড়ে থেকে কি হবে? চলে যেও কিন্তু। আর তোমার ওই পেন্সন! ওটা বন্ধ করে দেবে।

বুড়িরও তাই ইচ্ছা। ওটা নিতে তার বাধে। ভিক্ষার মতই ঠেকে।

কথায় কথায় অনেকেই খোঁটা দেয়। বিষ্টুর মা! সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী সে। এই পেনসন নিতে তার বাধে আজ। ওটা ছেড়ে দেবে।

বুড়ি বলে—তাই যাবো বাছা। আর কটাদিন আছি। তবু তোদের সুখ দেখে যাই। আর সব তো গেল। অ রমা, জামাইকে চা দে। বাছার আবার ঘনঘন চা খাওয়া অব্যেস।

রমাও সে কথা ভুলে গেছল। চা করতে যায়।

আজ তার অবসর নেই। সকলকেই তার সৌভাগ্যের কথাটা জানতে চায় সে। তাই এ বাড়ি ও বাড়ির গিন্নীমা ওপাড়ার ফুলজেঠি দত্তদের সেজ বৌ সকলের সঙ্গে দেখা করতে হয় তাকে।

এতদিন এই গ্রামখানা বিশ্রী লাগতো, এক ঘেয়েমির বিরক্তিতে মন ভরে তুলতো। আজ এই গ্রাম—এখানকার মানুষগুলোকে ভাল' লাগে রমার।

কানা মনু ভিখারী গান বাঁধে—গান গেয়ে ভিক্ষে করে গ্রামে লাঠি ঠুকে। ছায়াঘন পথে রমার পায়ের শব্দে মুখ তুলে চাইল সে।

—অমাদি, না কে গো?

রমা দাঁড়ালো। লোকটার কান খুব খাড়া। মনু গেয়ে ওঠে :

—শ্যাম এয়েছে নিশি ভোরে,
মন নিয়েছে মনচোরে,
ও শ্যাম, সে মনেরে মরি খুজে
মনের ঠিকানা পেলাম না।

অন্ধ বুড়ো যেন এই রুক্ষ মাটির বুকে শেষ সুরের প্রতীক। গলাও এই বয়সে তেমনি মিষ্টি রয়ে গেছে।

মনের সেই আনন্দ মুছে যায়নি। ও এ গ্রামের সুখে দুঃখে জড়িয়ে আছে এখানকার মানুষগুলোর সঙ্গে।

—তাহলে চল্লে অমাদি। আজরাণী হও।

রমা ওর কাছে কথাটা শুনে মনে মনে নিজের সৌভাগ্যে খুশীহয়। বলে—আজই চলে যাচ্ছি মনুদা।

—এসো মাঝে মাঝে অমাদি। তবু তোমাদের সুখ শুনলে ভাল লাগে গো। জেবনটাই তো দুঃখের—কত ছিল, সব হারিয়ে গেল। তবু তার মাঝে সুখী হয়েছে কেউ শুনলে মনে হয়, ঠাকুর এখনও আছেন।

রমা ওর কথাগুলো শুনেছে। মনু বলে।

—নাই কেন গো। ঠিকই আছেন। এত কেঁদেছো প্রেণাম করছো, দয়া হবে না তাঁর? ছুটবাবু বলেন—ওসব বাজে কথা। ঠাকুর লয় ও পাথরের মূর্তি। আজকালকার ছেলে কিনা—তাই বলে ও কথা। চলি অমাদি। মনু ছায়াঢাকা বাঁশবনের নীচেকার পথ দিয়ে কামার পাড়ার দিকে চলে গেল। কোথায় পাখী ডাকছে, নিস্তব্ধতার মাঝে তাদের ডাক কি আবেশ আনে।

রমার মনে পড়ে একজনের কথা। রাধামাধব ঠাকুরের কাছে মানসিক করেছিল। সে ফিরে আসবে, তার নতুন ঘর হবে। সবই হয়েছে ঠাকুরের কথায়।

একবার তাঁকে প্রণাম করে যেতে হবে, আর একজনের সঙ্গে দেখা করার দরকার। সে প্রাণগোপাল।

আজকাল সে ব্যস্ত। দিনরাতই নানা কাজ নানা হাঙ্গামা নিয়ে সে জড়িয়ে পড়েছে।

একদিন যে এই মেয়েটির সামনে সে চকিতের জন্য ধরা দিয়েছিল তারাজ্বলা সন্ধ্যায়—সেই মানুষটি যেন নিজেকে জোর করে ওই সব কাজের মধ্যে সরিয়ে নিয়ে গেছে। হয়ত কিছু ভোলবার জন্যই।

প্রাণগোপালের জন্য দুঃখ হয় আজ।

অনেক কিছুই ছিল ওর। কিন্তু সব ঝরাপাতার মত ঝরে গেছে, হারিয়ে গেছে। আজ একা সে। একা থাকার বেদনা কি তা জেনেছে রমা। আজ নীলার কথা মনে পড়ে।

রমা আনমনেই তবু এইদিকে এসেছে। দিঘীর জল শুকিয়ে গেছে। মরা দিঘীর বুকে জমেছে কাদা আর মরা ঝাঁঝি দামের স্তূপ।

ওপাশে বৃদ্ধ বকুল গাছের কাছে মন্দিরে প্রণাম করছে সে। রাধামাধব আজ ও আছেন। এখানে কতদিন—কত সন্ধ্যায় এসে মাথা ঠুকেছে সে, আজ সব পেয়েছে আবার।

এবার ফিরে এসে একদিন ধূমকরে পূজো দেবে সে আর নীরোদ।

হঠাৎ কার হাসির শব্দে চমকে ওঠে। বেলা বেড়ে গেছে। সামনে নাট মন্দিরটার খানিকটা ধ্বসে পড়েছে। মন্দিরের সারা গায়ে কালো শেওলার আস্তরণ। মেরামতও হয়নি কতদিন।

ভগ্নপ্রায় মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রাণগোপাল, —পানুদা!

প্রাণগোপাল হাসছে—ঠাকুরকে প্রণাম করতে এসেছিলি?

মুখ নামাল রমা। আজ তার মনে আনন্দ, তাতে লজ্জার আবেশ নেমেছে, রমা জানায়।

—আজই চলে যাচ্ছি। ও নিতে এসেছে।

—তাই নাকি!

খুশী হয় প্রাণগোপাল। রমা তবু জীবনে সব ফিরে পেয়েছে। তাই বলে—সুখী হ রমা।

রমা ওর দিকে চেয়ে থাকে। নির্জনতার মাঝে দুটি প্রাণী অতীতের হারানো সেই দিনগুলোর মাঝে যেন ফিরে যায়। রমা বলে।

—পারো তবে বিয়ে থা করো। এমনি করে নিজেকে শেষ করো না তিলে তিলে। হাসছে প্রাণগেপাল।

—পাকা গিন্নী হয়ে গেলি যে?

রমার কথাটা যেন হেসে উড়িয়ে দিতে চায় সে। রমার চোখেমুখে নীরব ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে, বলে।

—হাসবার কথা বলিনি পানুদা!

প্রাণগোপাল চিরকালই অমনি থেকে গেল। নিজের সম্বন্ধে নির্লিপ্ত উদাসীন। আবার নিজের চারিদিকে নানা কাজের জাল বুনে ফেলেছে। গ্রামের সীমা ছাড়িয়ে তার কাজের পরিধি আরও বেড়ে গেছে। ওরা বাইরের মানুষ, ঘরের ছোট্ট সীমানা বাঁধতে পারে না তাকে।

— শুনছি নাকি ভোটে নামছো?

প্রাণগোপালকে ওরা এইবার জোর করেই দাঁড় করাতে চায়। এখানকার লোকরাই বেশী চাপ দিচ্ছে। অনাদি গোপগাঁয়ের মধু ঘোষ—আরও অনেকে। সদর থেকেও তার উপর চাপ আসছে। বিনয়বাবুকে তারা আর চায় না। এতকাল ধরে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে সে শুধু নিজের জন্য নানা অসাধু উপায়ে।

তাকে আর প্রশ্রয় দিতে কেউই চায় না। বিশেষ করে বলহরির ব্যাপারটাও ওরা জেনে ফেলেছে। প্রাণগোপাল রাজী হয় নি।

কিন্তু এড়াবার পথ নেই। নীলাও বারবার তাকে বাধা দিয়েছে। রমার কথায় জবাব দেয় প্রাণগোপাল।

—দেখি। কি হয়। বুঝলি ঘর—সুখ—আনন্দ তোরা পা, তাতেই আমার তৃপ্তি। আমার পথ আলাদা। তোর ঠাকুর দেবতাকে ঘুস দিতে পারিনি কি না, তাই বোধ হয় এই শাস্তি।

আজ এত খুশির মধ্যে ও মনে হয় ওর জন্য কোথায় বেদনাবোধ করে সে। রমা বলে—ওদিকে গেলে একবার দেখা করো কিন্তু। রিভার সাইড রোডের তিন নম্বর বাসা।

··প্রাণগোপালের সময় নেই। নতুন গাঁয়ের বটতলায় মিটিং আছে। দেরী হয়ে গেছে। সাইকেল নিয়ে ছুটল সে। দাঁড়াল না।

নীলাও কথাটা ভেবেছে। স্কুলের সেই দমবন্ধ করা পরিবেশটা সহজ হয়ে উঠেছে। এবার বলহরিকে দূর করেছে প্রাণগোপাল। তার এতদিনের পাপগুলোকে সারা দেশের মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরেছে। বিনয়বাবু ও অসহায় অবস্থায় পড়েছেন। উপর থেকে তাকে ও এবার সমর্থন করবে না।

প্রাণগোপালকে সে এবার কাজে নামিয়েছে।

তারানাথের বয়স হয়ে গেছে। হাঁপানির টান ও বাড়ে। বৃদ্ধ—তালপাতার পুঁথিগুলোয় আর যেন আশ্বাস খুজে পায় না। ···সব কিছুর উপর বিরক্তি এসে গিয়েছিল।

হঠাৎ সেই বিরক্তি হতাশা মন থেকে মুছে যায় বলহরির খবরের পর। সে বিশ্বাস করে আবার বেঁচে থাকা যায়।

—বুঝলি নীলা মনু সংহিতায় বলে।

নীলা পরীক্ষার খাতা দেখছিল। এবার তার মনের বোঝাটাও হাল্‌কা হয়েছে। দাদুর কথায় বলে।

—আবার মনু সংহিতা! কোন মনু দাদু? আমাদের গাঁয়েও—

বুড়ো চটে যায়।

—ইয়ার্কি করছিস মনুসংহিতা নিয়ে? আজকের দিনে অনাচার অকল্যাণ বাড়বে স্পষ্টই তারা বলে গেছেন।

নীলা লাল পেন্সিলটা তুলে শুধোয়।

—প্রতিকারের বিধান?

বুড়ো চটে ওঠে নাতনীর কথায়, ছুপাতাপড়ে ওদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আজ ওরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। বলে মানুষই ইশ্বর।

বুড়ো বলে।

—প্রতিকার কি খুঁজেছিস ওর মধ্যে? না জানলি কোন দিন কি ছিল, কি সম্পদ আছে তোদের? পরের ধার করা বুলি আর ভিন্ন দেশের কথা মত তোরা তোদের সমস্যা দূর করতে চাস? আমগাছে আমড়া ফলে না এটা ভাবিস না।

নীলা উঠে গেল। বুড়োকে ঘাঁটাতে চায় না।

বৈকাল নামছে। প্রাণগোপাল মিটিং এ গেছে এখন ও ফেরেনি। নীলার ক'দিন স্কুল নেই। বাড়িতেই রয়েছে। তারানাথ বের হয়েছে—একটু বিকালে ডাঙ্গা দিয়ে ঘুরে আসে বুড়ো।

হঠাৎ রমাকে ঢুকতে দেখে ওর দিকে চাইল নীলা। রমার সাজ বেশ আজ আলাদা, সে সেজেছে।...সিঁথিতে সিন্দুরের আভা, সুন্দর মুখখানাকে আরও মিষ্টি দেখায়। ওর মনের সেই বেদনাটা আজ হাসির আভায় ভরে গেছে।

নীলা শুনেছে তার কথা।

—আয়। বোস।

রমা বলে—দেরী করতে পারবো না নীলা। আজ রাত্রেই যেতে হবে,

—তাই নাকি! খুশী ভরা কণ্ঠে নীলা সায় দেয়—তাই যা রমা,

রমা ওর দিকে চাইল। ওকথাটা বলতে কষ্ট হয় কোন

খানে। তবু আজ সে যা পাবার নয় সেটাকে অনায়াসেই ছেড়ে দিয়ে যেতে পারে।

—একটা কথা বলছিলাম নীলা।

নীলা ওর কণ্ঠস্বরের গাঢ়তায় বিস্মিত হয়েছে। এ যেন অন্য কোন কথা বলবে সে। নীলা ওর দিকে ডাগর দুচোখ মেলে চাইল। সন্ধ্যার ফিকে অন্ধকার নামছে। পাখী ডাকা সন্ধ্যা।

রমা বলে—তোরা বিয়ে কর নীলা।

নীলা চমকে ওঠে। একথাটা তার মনে জাগেনি তা নয়। তবে বিয়ের কথা ভাবেনি সে, প্রাণগোপালকে ভাল লাগে তার। তার সান্নিধ্যে এসে নিজেও মনের হারানো জোরটাকে খুঁজে পেয়েছে নীলা, আশ্বাসটুকুকেও।

প্রাণগোপালের চোখেও দেখেছে সেই পরিবর্তন। আজ সে নতুন উদ্যমে এগিয়ে এসেছে। নীলা চুপ করে রমার কথাটা ভাবছে।

রমা বলে।

—ও বড় একা, তাই কেবল ভুলই করবে আর সব হারাবে, অনেক হারিয়েছে ও নীলা। তাই কথাটা তোকে বললাম, ভেবে দেখিস।

নীলা তারাজ্বলা আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। অন্ধকারে দু একটা তারা ফুটে উঠছে। রাতের অন্ধকার জমে ওঠে গাছে গাছে। বকুল গন্ধটা তীব্রতর হয়ে ওঠে। তার মনেও অমনি একটি আশার সুরভি।

সে ও পেতে চায় অনেক কিছু। দুহাত ভরে পেতে চায়। নিজের শূন্য জীবনে তাই ওই মানুষটিকে প্রয়োজন। এটা সে যেন আজ বারবার অনুভব করছে সারা মন দিয়ে।

অন্ধকারে সাইকেলের বেল শুনে নীলা উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। এ বেল তার চেনা।...পায়ের শব্দ ওঠে।

বাড়িতে এসে ঢোকে প্রাণগোপাল।

—নীলা!

ডাকছে সে নীলাকে। ওর মনে আজ জয়ের নেশা। সব বাধা পার হয়ে আবার সে সকলের সামনে দাঁড়াবে। আজ নতুন গ্রামের বিরাট হাটতলায় কয়েক হাজার লোকের সামনে দেখেছে সেই ভালো লাগা ছবিটা।

বিনয়বাবুর দিন ফুরিয়ে আসছে। ওরা সেটা ও বুঝেছে।

বলহরি সামন্ত ও আর নেই। এবার তারাই নিজেদের নেতা ঠিক করে নেবে। হাজার কণ্ঠে সেই শপথই জেগে উঠেছিল সেই বিরাট শোভাযাত্রায়।

এসেছিল চাষী সাধারণ মানুষ—আবালবৃদ্ধ বণিতা।

প্রাণগোপাল তাদের সামনে দাঁড়িয়েছিল আজ সেই প্রীতির পরিচয়ে, খুশি ভরা কণ্ঠে বলে সে।

—নীলা! আজ গেলে না। বিরাট মিটিং। ওদের চোখে মুখে কতো আশা। পারবো তার মান রাখতে?

নীলার কাছে ওই মানুষটি অভয় চায়। নীলা ওর জীবনের সঙ্গে কোথায় নিবিড় ভাবে জড়িয়ে পড়েছে। বলে সে,

—নিশ্চয়ই পারবে। পারতে হবে তোমায়।

রমার কথা মনে পড়ে। নীলার মনের সেই কামনাটাকে ওই রমাই যেন জাগিয়ে দিয়েছে নতুন করে। নীলা বলে

—বসো। এতদূর থেকে এলে, কিছুই তো খাওনি।

খিদেও পেয়েছিল প্রাণগোপালের, পাঁচ মাইল মাঠ ভেঙ্গে সাইকেলে করে আসছে। বাড়িতে ও কেউ নেই। ললিতা মাসীর বয়স হয়েছে। রাতের বেলায় চোখেও দেখে না। তাই রান্না ও হয় না। দিনের শুকনো ভাত তরকারী থাকে, না হয় দুধ মুড়ি গুড়ই খেতে হয়।

আজ গরম গরম লুচি আর বেগুন ভাজা করেছে নীলা।

উনুনের লাল আলোর আভা পড়েছে নীলার মুখে, ফর্সা টকটকে রংটা লালচে হয়ে উঠেছে। নীলার মনে খুশির আবেশ। কি বলে চলেছে সে।

শান্ত স্তব্ধ সন্ধ্যায় এমনি একটি সুন্দর ছবি প্রাণগোপালের মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করে। একটি ঘর একটি নিভৃত পরিবেশ আপন করে পাওয়া একটি মানুষের ছবি ফুটে ওঠে তার কল্পনায়, খাবার এগিয়ে দিয়ে বলে নীলা।

—খাও, এত কি ভাবছো ?

—এমনি।

নীলা হাসতে হাসতে বলে,

—মাঝে মাঝে এতকি ভাবো বলতো ? জীবনে কোন দায় দায়িত্ব নিলে না, এড়িয়ে চলেছো সব কিছুই। তবে এতো ভাববার কি আছে ? প্রাণগোপাল শোনায়,

—নিতে যেন ইচ্ছে করে নীলা। এতদিন ভয়ে আর হতাশার জন্যই জীবনের সব দাবীকে এড়িয়ে গেছলাম। আজ মনে হয় ভয়টা নিছক কাল্পনিক। ওতে নিজেকেই ঠকানো হয় মাত্র।

—সত্যি !

নীলার ডাগর কালো দুচোখের তারায় কি নেশা ফুটে ওঠে।

ঢুকছে তারানাথ।

—এই যে ভায়া, এসে পড়েছো ? শুনলাম তোমারই জয় জয় কার। বিরাট মিটিং, এলাহি শোভাযাত্রা হয়েছিল।

নীলা বলে—এত রাত অবধি কোথায় ছিলে দাদু ?

তারানাথ বসতে বসতে শোনায়,

—দেখলাম বিনয়বাবুকে বৈকালেই হন্ত দন্ত হয়ে গাড়িতে বের হয়ে গেল। বাজারে এসে শুনলাম গঙ্গাধরকে নাকি পাওয়া যাচ্ছেনা। সদর থেকে ফিরেছে তারপর আর কেউ দেখেনি তাকে। বেচারার মেয়ে ছেলেরাও খুঁজতে বের হয়েছে।

—তাই নাকি! অবাক হয় প্রাণগোপাল।

—কি ভাবছে সে। তখনও কৈফিয়ৎ-এর সুরে বলে চলেছে তারানাথ তর্ক তীর্থ।

পথে দেখা হয়ে গেল রমার সঙ্গে। জামাই এর সঙ্গে চলেছে তার চাকরীর স্থলে। বড় ভালো লাগলো দিদি ভাই; মেয়েটা অনেক দুঃখ পেয়েছে, এবার সুখের মুখ দেখুক।

নীলা চুপ করে কি ভাবছে।

প্রাণগোপাল খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ে। তারানাথ বাধা দেয়।

—ওকি হে? খাওয়া হয়ে গেল তোমার?

প্রাণগোপাল কথাটা ভাবছে। গঙ্গাধরকে পাওয়া যাচ্ছে না। ওর ছেলে মেয়ে স্ত্রী খোঁজাখুঁজি করছে। প্রাণগোপাল যেন ওখানে যাবার দরকার বোধ করে। কে জানে কোন বিপদ আপদ হল কিনা।

বলহরি বিনয়বাবুদের গতিবিধি কেমন রহস্যজনক। তার সঙ্গে গঙ্গাধরের এই অন্তর্ধানটাও রহস্যাবৃত বলেই ঠেকে।

বলে প্রাণগোপাল,

—গঙ্গাধর গেল কোথায়? বিনয়বাবুকেই সেই প্রশ্নটা করতে হবে। ওকে ধরতেই হবে যতো রাত হোক?

নীলা চমকে ওঠে। তার মনে ভয় জাগে।

একা যেওনা ওখানে? না—

নীলা ওর হাতটা চেপে ধরে কি উত্তেজনায় বসে। কাঁপছে তার সারা দেহ। ওই স্পর্শটুকু প্রাণগোপালের সারা মনে একটা বিচিত্র সাড়া আনে।

এমনিকরে কেউ কোনদিনই তার জন্য ব্যাকুল হয়নি।

—নীলা।

নীলা ওর কাছে এগিয়ে এসেছে। তারানাথ পূজোর ঘরে গিয়ে

পূজোয় বসেছে। স্তব্ধ চারিদিক। ওর হাতে নীলার হাতখানা। নীলা বলে সজল ব্যাকুল চোখে,

—না। একা তুমি যাবেনা ওখানে। ওরা সব পারে। বারবার নিজেকে কেবল বিপদেই জড়াবে ? কেন ?

প্রাণগোপাল ওকে কাছে টেনে নেয়। উষর বন্ধ্যা জীবনে আজ প্রাণগোপাল সব পাবার আশ্বাস খোঁজে। ওকে বলে,

—না, না। অনাদি, ফটিক আরও অনেকেই থাকবে। ভয়ের কিছুই নেই। থানাতেই খবর পাঠাবো। দরকার হলে পুলিশও থাকবে সঙ্গে।

...নীলা দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে ; প্রাণগোপাল বের হয়ে গেল। অন্ধকারেই সাইকেল চড়ে চলে যায় সে। গ্রামের পথ ঘাট তার নখদর্পণে। তারানাথ পূজোয় বসেনি তখনও। ওদের কথাগুলো শুনছে। দেখেছে ওদের দুজনের চোখে কি অপরিসীম ব্যাকুলতা। নীলার জন্য ভাবনা হয় তার।

রমাকে দেখেছে আজ। ভালো লেগেছে। মেয়েদের সম্পূর্ণতা আর একজনকে ঘিরে। প্রাণগোপালকে ভালো লাগে তারানাথের। একালের অনেকের মত ও মেকি নয়। খাঁটি সোনাই।

ওদের প্রচেষ্টা সফল হোক। নীলা যদি সুখী হয় ওকে নিয়ে তারানাথ বাধা দেবে না। তারার আলোয় দেখা যায় নীলার সুন্দর মুখখানা। কি বেদনায় ও ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। তারানাথ সরে গেল। ও যে ওদের দেখেছে এত নিবিড়ভাবে এটা জানতে দিতে চায়না।

বলহরি সামন্ত প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। গাড়ির মধ্যে ওকে মুখ বন্ধ করে তুলে হাত বেঁধে নিয়ে চলেছে। পথ তার চেনা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা এসে পড়ে সহরের বাইরে বিনয়বাবুর বাড়িতে।

...বলহরি এবার বুঝতে পারে কোথায় কার ইঙ্গিতে ওরা তাকে নিয়ে এসে ফেলেছে।

...বিনয়বাবুও তৈরী ছিলেন। বলহরিকে নিজের গাড়িতে তুলে হুকুম করেন,

—সোজা বাড়ি চলো ড্রাইভার। কেষ্টো তুমিও এসো গাড়িতে। বলহরির দুচোখে ভয়ের চিহ্ন। কেষ্ট জানে কাজটা সে খারাপই করেছে। নারোদকেও জানায়নি। টাকাটা সেইই নিয়েছে।

তবু তার মনে হয় দলের অবস্থা ভালো নয়। নিরোদও বদলে গেছে। দল থাকে কি না থাকে, তার ঠিক নেই। এ সময় নগদ তবু হাজার চারেক টাকা হাতিয়ে নিলে সুবিধাই হবে তার।

বিনয় বাবু বলেন।

—কেষ্টো, ওকে গ্রামে পৌঁছে দেবে চল। বাকী টাকা ওখানেই দেবো। কাল—না হয় আজ রাতেই ফিরে আসবে গাড়িতে।

বলহরির চোখে মুখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে ওঠে। এত করেও সে বিনয়বাবুর হাত এড়াতে পারেনি। পারেনি ওই নীরোদের জন্যই। তার দলবল তারই ইঙ্গিতে বলহরিকে ধরে এনে আজ বিক্রী করেছে।

গাড়িখানা ছুটে চলেছে সহর ছাড়িয়ে গ্রামের দিকে। বিনয় বাবুর কঠিন মুখখানার দিকে চেয়ে থাকে বলহরি। আজ তার কঠিন একটা বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। জেলে হাজতে যেতে ভয় পায়নি, বিনয়বাবুর ওখানে যেতে সে ভয় পায়।

কেষ্টা সামনের দিকে চেয়ে আছে।

হেড লাইটের এক ঝলক আলোয় শালবন ভূমি সচকিত হয়ে ওঠে। জি-টি রোডে রাতের অন্ধকারের বুকে ধারালো ইস্পাতের

ফলার মত ওই আলোগুলো বিঁধছে, আর্তনাদ ওঠে আকাশে বাতাসে।

দুর্গাপুরের কারখানার আলো দূরের নিওন সাইন এর লাল নীল আলোর মায়াজাল পার হয়ে ওরা ছুটছে। পথ এখনও অনেক দূর।

বলহরি গাড়ির মধ্যে বসে আছে। ওরা দুলছে গাড়ির ঝাঁকুনিতে। সারাদিন ধকল গেছে বিনয়বাবুর, বলহরি হাতের বাঁধনটা খুলে ফেলেছে। এদিক ওদিক হাতড়াচ্ছে। সিটের উপর ঠাণ্ডা বস্তুটায় হাত পড়ে। ওটাকে চেনে বলহরি। তার অনেকদিনের সঙ্গী। ওটাকে ওরা ছিনিয়ে নিয়েছিল।

রিভলভারটাকে টেনে নেয় হাতের মুঠোয়। চুপচাপ বসে আছে বলহরি, সুযোগ খুঁজছে।

গাড়িটা চলেছে চড়াই উৎরাই পার হয়ে শালবনের দিকে, এর পর সুরু হয়েছে আদিম অরণ্য ; দূরে আবছা চাঁদের আলোয় দেখা যায় কালো পিচঢালা রাস্তাটা মৃত সরীসৃপের মত পড়ে আছে। শালবন সুরু হয়েছে টিলার উপর থেকে। গাড়িখানা গোঁ গোঁ শব্দে আর্তনাদ তুলে চড়াই এ উঠছে, ওদিকে পড়বে উৎরাই। তার দুদিকে শালবন, বহু নীচে একটা তিরতিরে জল বয়ে যাওয়া ছোট পাহাড়ী নদী।

বলহরির এসব পথ মুখস্থ।

নীরোদ চলেছে রমাকে নিয়ে। সেই পুরোনো জিপখানা এখনও রেখেছে নীরোদ। এবার তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, বিক্রী করে তবু যা হোক কিছু পাওয়া যাবে।

রমার মনে কি বিচিত্র একটি স্বপ্নের আবেশ জাগে।

আলোয় উল্লাস ওঠা এই বনভূমির দিকে চেয়ে থাকে। এসব সে কোনদিনই দেখেনি।

সবই তার কাছে নোতুন—বিচিত্র আর স্বপ্নময়। নীরোদ গাড়ি চালাচ্ছে।

রমা বলে—একটু আস্তে চালাও না?

হাসে নীরোদ—কোন ভয় নেই।

রমা আজ কোন ঝুঁকি নিতে চায় না। তার চোখের সামনে একটি মানুষকে ঘিরে সবপেয়ে বাঁচার আনন্দোজ্জ্বল সেই ছবি ফুটে ওঠে।

হঠাৎ জিপটা চড়াই এর মুখে থেমে যায় বনের মধ্যে।

—কি হ'ল?

রমা ওর দিকে চাইল। নীরোদ গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে গিয়ে বনেটটা খুলেছে, জানে ওর গোলমাল কোথায়। বোধহয় স্পার্কপ্লাগ এর কিছু ঢিলে হয়ে গেছে।

একটা গাড়ি আসছে। অন্ধকারে পড়েছে হেড লাইটের আলো। গাড়িটা বেপরোয়া ভাবে রাস্তার এদিক ওদিকে চলছে, যে কোন মূহুর্তে লাফিয়ে পড়বে সেটা পাশের খাদে। চমকে ওঠে নীরোদ। গাড়িখানাকে ওরা থামাবার চেষ্টা করছে।

বলহরি এই বনের মধ্যেই তার পালাবার পথ খুঁজছে! অতর্কিতে লাফ দিয়ে উঠে পিছন থেকে ড্রাইভারের গলা টিপে ধরেছে, ড্রাইভার ও তৈরী ছিল না।

অতর্কিত ওই আক্রমণে হকচকিয়ে গেছে সে। গাড়ি থামাবার চেষ্টা করে। তবু যেন দম বন্ধ হ'য়ে আসছে তার। হাত কাঁপছে—গাড়িটা উৎরাই থেকে নামবার মুখে বিকল হয়ে গেছে।

চীৎকার করেন বিনয় বাবু! বলহরির দুচোখ জ্বলছে। ও যেন ক্ষেপে গেছে, বাধা দিতে যাবেন—বলহরি রিভলবার তোলে, গর্জন করে ওঠে—খবরদার!

গাড়িখানা একপাশে গিয়ে একটা গাছের গায়ে আটকে গেছে। কেষ্টও লাফ দিয়ে নামে, বলহরি তার আগেই রাস্তায় নেমে ওপাশের জঙ্গলের দিকে পালাতে চায়। বিনয়বাবুর উপরই তার রাগটা বেশী। আজ সে ওকেই চরম আঘাত হানতে চেষ্টা করে।

আবছা অন্ধকারে রিভলভার থেকে গুলি ছুঁড়ছে বলহরি। একটা, দুটো।

সেই সঙ্গে পালাবার চেষ্টা করে সে।

ওপাশের গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে আসে নীরোদ। গুলির শব্দ সে চেনে। রাতের অন্ধকারে বনের পথে এসব কাণ্ড হয় তাও জানে সে। তার সেই সুপ্ত বিদ্রোহী মনটা গুলির শব্দে সচকিত হয়ে উঠেছে।

তার গাড়ির হেড লাইটটা জ্বেলে দিতেই দেখতে পায় সামনেই বলহরি সামন্তকে। দুচোখ জ্বলছে তার, হাতে উদ্যত রিভলবার।

রমা অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে।

—ওগো। যেওনা, যেওনা তুমি।

বলহরির সামনে এসে পড়েছেন বিনয়বাবু। কেষ্টাও এগিয়ে এসেছে। হাতে তার একটা লোহার রড আর বলহরির হাতে রিভলবার।

বিনয়বাবু ও বুঝতে পেরেছেন আজ তারই হাতে গড়া ওই দৈত্যটা তাকেই শেষ করবার জন্যই মেতে উঠেছে। বলহরি গর্জায়।

—সরে যা। ওই বিনয়বাবুকেই শেষ করে দোব আগে। বাধা দিলে তোদের ও ছেড়ে যাবো না। একটা খুন করলে ও ফাঁসি—পাঁচটা খুন করলেও তাই।

নীরোদ দেখেছ বিনয়বাবুর ফ্যাকাসে বিবর্ণ মুখখানা। মৃত্যুকে যেন চোখের সামনে দেখছেন তিনি। এতকাল দাপটে সব

চালিয়ে এসেছেন—নিজের প্রাধান্য—ব্যক্তিত্ব। অন্তরের লোভী সত্বাটা তার মনে এনেছিল দুর্জয় সাহস আর হিংস্রতা।

কিন্তু সব কিছুর দাম যে এমনি একটি মাত্র বুলেট তা ভাবেন নি। শুভব্রত তাকে অস্বীকার করেছে। মূল্যহীন তুচ্ছ করে গেছে তার সব সঞ্চয়কে। আজ ওই শয়তান বলহরি এসে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। এত ব্যাকুলতা—এত লোভ পাওয়া সব কিছুই অর্থহীন শূন্য বলেই মনে হয়।

তাঁর বলহরি সামনে, ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে বিনয়বাবুর অন্যতম শত্রু নীরোদ গুণ্ডা।

কেষ্ট নীরোদকে এখানে দেখবে ভাবেনি। চমকে ওঠে সে।

—নীরুদা।

নীরোদের কাছে ছবিটা পরিস্কার হয়ে ফুটে ওঠে। বিনয়বাবুর বদলা নিতে হবে তাকে। বলহরির খবর সে শুনেছে। দুটোকেই বাঁচিয়ে রাখতে হবে তাকে। দেখবে এর শেষ কোথায়।

স্থির দৃষ্টিতে সে বলহরির দিকে চেয়ে থাকে। জ্বলছে তার দুচোখ। বলহরির সময় নেই। একটা গুলি করেছে সে। বিনয়বাবুর পাশ দিয়ে গুলিটা বের হয়ে গিয়ে একটা গাছের ডালে লেগেছে। সশব্দে কয়েকটা পাতা ছিটকে পড়ে উড়ে গেল বাতাসে।

বিনয়বাবুর দিকে লাফ দিয়েছে বলহরি, নীরোদ এর জন্য তৈরী ছিল। বিনয়বাবুকে এক ধাক্কায় পিছনে ফেলে নিজেই বলহরির উপর লাফিয়ে পড়ে চকিতের মধ্যে।

এবার আর গুলিটা ব্যর্থ হয় নি। বলহরির সামনে রাস্তার উপর লুটিয়ে পড়ল নীরোদের আহত দেহটা। যন্ত্রনায় ছটফট করছে। রমা চীৎকার করে ওঠে। ওই আহত দেহটাকে তুলে নেবার চেষ্টা করে।

—নীরুদা!

কেষ্ট ডাকছে। বিনয়বাবু তখনও ভয়ে কাঁপছেন। বলহরি এই সুযোগে অন্ধকার বনের মধ্যে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে দৌড়তে থাকে তাড়া খাওয়া জানোয়ারের মত।

রমার সেই আর্তনাদ তখনও কানে আসে। কাঁদছে সে। বিনয়বাবু চোখের সামনে দেখেছেন তার মত একটা লোককে বাঁচাবার জন্য নীরোদ গুণ্ডা আজ নিজের প্রাণ দিয়ে গেল। ওদের ঠিক চিনতে পারেন নি এখনও।

মনে হয় এমনি করে দয়া কুড়োনোর যোগ্য সে নয়। —নীরোদ।

রক্তাক্ত দেহটা নড়ছে মাত্র, মুখ দিয়ে অস্পষ্ট একটা আর্তনাদ বের হয়। ওরা ওকে তুলে নিয়ে সদর হাসপাতালের দিকেই চলে গেল সেই রাত্রে।

রমার দুচোখে জল নামে। অজয়ের বালিয়াড়ির ধারে ছোট্ট একটা বাসা—সবুজ গাছ গাছালির নীচে সেই নতুন সহরের ছোট্ট ঘরের কল্পনা সব চোখের জলে ঝাপসা হয়ে গেছে। এ যেন কি সর্বনাশ হয়ে গেল তা ভাবতেও পারে নি সে।

কাল বিকাল থেকে লোকটাকে পাওয়া যাচ্ছে না। গঙ্গাধরকে ফিরতে দেখছে ওরা, কালো বাউরীর রিক্সায় সে বাস থেকে নেমে গ্রামে এসেছে। নিতুকর্মকার দেখেছে তাকে বিনয়বাবুর বাড়িতে ঢুকতে। তার পর থেকেই কোন পাত্তা নেই তার।

প্রাণগোপাল শুনেছে গঙ্গাধরের বৌ মেয়েছেলেদের কান্না। লোক জুটে গেছে।

অনাদি দলবল নিয়ে বনের এদিক ওদিকে খুঁজেছে। কিন্তু রাতের অন্ধকারে কোন পাত্তাই পায় না তার। কেউ বলে —বোধ হয় বিনয়বাবুর সঙ্গে সহরে গেছে গাড়িতে।

কিন্তু তেমন কোন খবর ও মেলে না। সারা রাত কাটে উৎকণ্ঠায়। জলজ্যান্ত মানুষটা কোথায় গায়েব হয়ে যাবে?

অনাদি বলে।

—ওই বিনয়বাবু বলহরিকে বিশ্বাস নেই দাদা। প্রমান সাক্ষী সব মুছে ফেলার জন্য ওরা গঙ্গাধরকে গুম করে ও দিতে পারে।

—রাতের বেলায় আর খোঁজ করে কি হবে? সকালে দেখা যাক কি হয়।

ওরা একটি রাত মুখ বুজে প্রতীক্ষা করছে। অন্ধকার সরে যাক। দিনের আলোয় ওরা এইবার বিনয়বাবুর বাড়িতেই হানা দেবে। অনাদি বলে।

- রাতের বেলায় ও বাড়ির চারিদিকে কিছু লোকজন রেখে দিই। যদি ওরা সরাবার চেষ্টা করে নজরে পড়বে।

কথাটা মন্দ নয়। সেই ব্যবস্থাই হয়ে যায়। বিনয়বাবু—বলহরির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে দাঁড়াবার লোকের অভাব আজ হয় না।

রাতের অন্ধকারে নেমেছে গ্রামে। বাঁশবনে হু হু হাওয়া বয়। কোথায় জোনাকি জ্বলছে। ঘুমন্ত গ্রামের মাঝে জেগে ওঠে গঙ্গাধরের বৌ—মেয়ের কান্নার সুর।

ওদের মনে ভয়টাই বড় হয়ে ওঠে, অবাক নিষেধ করেছিল তারা গঙ্গাধরকে। অভাব দুঃখ তারা সইবে তবু ওসবের মধ্যে যেন না যায় গঙ্গাধর।

কিন্তু তা শোনেনি সে, অভাব ও তাদের ঘোচেনি। সার হয়েছে ওই নোংরা বদনাম কুড়োনো। তার জন্য এমনি করে এত দাম দিতে হবে তা জানতো না গঙ্গাধরের বৌ।

রাতের অন্ধকারে তারাগুলো জ্বলছে।

এতটুকু আলো এ ঘরে পৌঁছে না। গঙ্গাধর স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। আজ সে অপমানিত। ভীত! মনে হয় আগেকার সেই দিন গুলোই ছিল ভালো। কি এক উন্মাদনায় সেও গ্রামে গ্রামে ঘুরতো। সেদিন অভাব ছিল, কিন্তু এমনি দৈন্য আর মানুষকে অপমান করার রীতি ছিল না।

গঙ্গাধর সেদিন তাই পেয়েছিল অনেকের প্রীতি ভালবাসা। তার দিন সুখে দুখে চলে যেতো; দশগ্রামের লোক তাকে ব্রাহ্মণ বলে শ্রদ্ধাও করতো। জপ তপ নিয়েছিল। কুষ্ঠি ঠিকুজী করতো। সম্মানের সঙ্গেই বেঁচেছিল তখন

এখন! তার তুলনায় সে অনেক নীচে নেমে গেছে। লোক এখন দেখলে মাথা নোয়ানো দূরের কথা, ডেকে কথাও বলেনা।

কেউ তাকে বলে কুকুর! পা চাটা লোকের একজন।

এসব কথা শুনেছে গঙ্গাধর।

বিনয়বাবু তাকে আজ সবচেয়ে বেশী অপমান করেছেন। ওরা তাকে মানুষ বলেই গ্রাহ্য করে না। কুকুরকেও খেতে দেয়, আদর করে। আর সে বিনয়বাবুর কাছে কুকুরের চেয়েও অধম কোন এক শ্রেণীর জীব।

এভাবে বেঁচে থাকার লাভ নেই। নিজের উপর এসেছে বিজাতীয় ঘৃণা ধিক্কার আর দুঃসহ লাঞ্ছনা। তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে এই অপমান।

এই প্রাণপাত পরিশ্রমের কোন মূল্যই নেই।

রাত নেমেছে বোধহয়। ঘরের মধ্যে আলোও আসেনা। বাইরে স্তব্ধতা নেমেছে। ওরা একঘটি জল তাকে দিয়ে গেছে, তৃষ্ণাও নেই তার।

মনভরা গ্লানি তার সব ক্ষুধা তৃষ্ণাকে শেষ করে দিয়েছে। প্রবৃত্তিগুলো কেমন নিস্তেজ হয়ে গেছে।

বাঁচার ইচ্ছেও নেই।

গঙ্গাধর এই জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছে। এ তার কাছে অন্ধকার ভরা দুঃসহ একটা বোঝা মাত্র। মুক্তি পেতে চায় সে।

হঠাৎ কড়িকাঠের দিকে নজর পড়ে। একটা দড়ি ঝুলছে তাতে। এককালে এটা ভাণ্ডার ঘর ছিল। শিকে থেকে ঝোলানো থাকতো জিনিসপত্র, এখন সেসব নেই।

সেই দিনের পূর্ণতার চিহ্ন হিসাবে ঝুলছে ওই শক্ত নারকেল দড়ির শূন্য শিকেটা।

মৃত্যু!

আজ তার কাছে ওইটুকুই যেন অন্ধকারময় এ জীবনে শান্তির সন্ধান আনে। সব আশা তার মিটে গেছে। এ জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে গঙ্গাধর আজ তার নিষ্কৃতির পথ খুঁজছে।

তার সারাদেহে অসহ্য যন্ত্রনা। গঙ্গাধরের চিন্তা করার শক্তি অসাড় হয়ে আসছে। চোখের সামনে শান্ত সবুজ একটি ক্ষীণ আলোময় চেতনা ধীরে ধীরে অতলান্ত অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে।

সকাল বেলাতেই বিরাট বাড়িটার সামনে লোক জমে গেছে। গ্রামের আশপাশের, অন্য গ্রামের ছেলে মেয়ে লোকজনও এসে জুটেছে। খবরটা ইতিমধ্যে হাওয়ায় ভেসে গেছে ; গঙ্গাধর ঠাকুরকে নাকি বিনয়বাবু গুম করে ফেলেছেন।

মরিয়া হয়ে চীৎকার করছে তারা।

প্রাণগোপাল এসে পড়ে। অনাদির লোকজনও তৈরী ছিল। তারা সারারাত পাহারা দিয়েছে বাড়ির চারদিকে।

বিনয়বাবু তখনও ফেরেন নি।

দ্বারোয়ান—চাকর বাকরের দল ওই ক্রুদ্ধ জনতার চীৎকারে ভয় পেয়ে গেছে। যে দ্বারোয়ানটা কাল ওকে আটকেছিল—সেও মুখ বন্ধ করে লুকিয়েছে কোথায়।

ওদের চীৎকারে কমলা বের হয়ে আসে। প্রাণগোপালের বাবার ছোট বোন, নিজের পিসীমা উনি।

তবু আজ প্রাণগোপালের কাছে ও অনেক দূরের মানুষ। সেই সম্পর্কটা বিনয়বাবু অস্বীকার করে এসেছেন এতদিন। প্রাণগোপাল ও সেটাকে বদলাতে চায়নি।

আজ ও তাই প্রাণগোপাল নিস্পৃহ কণ্ঠে শোনায় কমলাকে।

—ওরা বলছে গঙ্গাধরকে কাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। এই বাড়িতেই তাকে নাকি আটকে রাখা হয়েছে।

ভিড়ের মধ্য থেকে কারা চীৎকার করে।

—খুন করা হয়েছে। গুম খুন। আমরা এ বাড়ি তল্লাসী করবো।

কমলা অবাক হয়—সে কি কথা! একটা মানুষকে এখানে, এ বাড়িতে খুন করা হয়েছে? মিথ্যে কথা পানু।

—কথাটা মিথ্যে হলেই ভালো। তবু একবার দেখা দরকার। আমরা ক'জন ভিতরে যাবো।

ভিড়ের মধ্যে একটা গুঞ্জরণ ওঠে।...বেলা বেড়ে উঠেছে। সকালের রোদ হলুদ হয়ে গাছ গাছালির মাথায় লুটিয়ে পড়েছে। নীলা ও ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসে,

ভিড় বাড়ছে ক্রমশঃ। উত্তেজিত জনতা আজ রেগে উঠেছে, প্রাণগোপাল—অনাদি—তাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, এমন সময় হঠাৎ জনতার মাঝে একটা চীৎকার শোনা যায়।

ওরা ভিতরে ঢুকেছে। প্রাণগোপাল আর ও কজন।

পিছনে বনের দিক থেকে গাড়িখানা তখন আসছে। বিনয়বাবু ফিরছেন সদর থেকে।

রমার চোখের জল শুকিয়ে গেছে।

অনেক স্বপ্ন দেখেছিল সে। সব আজ ব্যর্থ হয়ে গেছে। নীরোদকে ওরা বাঁচতে দেয়নি, হাসপাতালে আজ ভোরেই মারা গেছে সে। মানুষের সব শুভ ইচ্ছা—কল্যাণবোধকে ওরা এমনি করে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেছে।

রমার দুচোখে যেন অগ্নিজ্বালা।

বিনয়বাবুকে দেখে ওরা পথ ছেড়ে দেয়। ওরা শুনেছে ঘটনাটা!

…বিনয়বাবু চমকে ওঠেন। তারই বাড়ির নীচেকার ঘরে ওরা গঙ্গাধরকে আবিষ্কার করেছে।

গঙ্গাধরের প্রাণহীন দেহটা অন্ধকার ঘরে কড়িকাঠের ওই শিকের দড়ির সঙ্গে ঝুলছিল। বিস্ফারিত হয়ে গেছে তার দুই চোখ। মৃত দেহটা কাঠ হয়ে গেছে।

সব আতঙ্ক ষড়যন্ত্র আর অত্যাচারের হাত থেকে আজ মুক্তি পেয়েছে হতভাগ্য লোকটা।

বিস্মিত হয়ে গেছে হতচকিত জনতা, দেখেছে তাদের চোখের সামনে জীবনের এই অপচয় আর অপমৃত্যু। গঙ্গাধরের বৌ—ছেলে মেয়েরা কাঁদছে।

সরে এল প্রাণগোপাল।

চারিদিকে এই পরাজয় আর মৃত্যুর ছায়া নেমেছে। বিষ্টুদার মায়ের বুক ফাটা কান্নার শব্দ ওঠে বাঁশ বনের আড়ালে। রাতের অন্ধকারে বনের মধ্যে ওর জামাই মারা গেছে, ব্যর্থ হয়ে গেছে রমার সেই স্বপ্ন দেখা,

ভাঙ্গা বাড়িগুলো আজ জনশূন্য। বলহরির কারখানায় তালা ঝুলছে। ধ্বসে পড়েছে দরদালান। হঠাৎ ওই ভাঙ্গা মন্দিরের সামনে কাকে দেখে চমকে ওঠে প্রাণগোপাল,

মন্দিরে দেবতার সামনে মাথা খুঁড়ছে রমা। কান্নাভেজা কণ্ঠে দেবতাকে আজ অভিযোগ জানায়।

—একি করলে ঠাকুর!

—রমা।

প্রাণগোপালের ডাকে মুখ তুলে চাইল সে। ওর সব স্বপ্ন মুছে গেছে। বাঁচতে চেয়েছিল ওরা। নীরোদও। কিন্তু সে ও প্রাণ দিয়েছে বিনয়বাবুর মত একটা লোককে বাঁচাতে গিয়ে। প্রাণগোপাল দেখছে ওকে। রমা ব্যাকুলকণ্ঠে জানায়।

—সব হারিয়ে গেল আমার! কি অপরাধ করেছিলাম দেবতার কাছে—

প্রাণগোপাল রুদ্ধকণ্ঠে বলে।

—দেবতা!...কার উপর বিশ্বাস করে বার বার ঠকেছিস রমা? ঠকছি তুই আমি—আমরা সবাই। হাত পা গুটিয়ে দেবতার দোহাই পাড়ছি!

...ওর সারা দেহে কি উত্তেজনা।

—মিথ্যা! মিথ্যে সব!...

হঠাৎ মন্দিরে ঢুকে সেই শালগ্রাম শিলাকে তুলে নিয়ে সামনের ওই গোবরের স্তূপের উপরই ছুঁড়ে ফেলে দিল প্রাণগোপাল।

—ওই ছাখ ছুড়ে ফেলে দিলাম ওই পাথরকে। ...এবার নতুন বিশ্বাস অন্য কোথাও খুজে নিয়ে বাঁচতে চেষ্টা কর রমা।...

—পানু!...একি করছো পানু! নারায়ণ—নারায়ণ বৃদ্ধ তারানাথ তর্কতীর্থ এই পথে আসছিল, সে এগিয়ে আসে। ...পানু বলে

—ওসব শুধু পাথর. শুধু মাত্র পাথরই তাই ফেলে দিলাম।

তারানাথ শিলারূপী নারায়ণকে তুলে নেয় সযত্নে। বৃদ্ধের চোখে জল নামে। রমা কাঁদছে।

...ওপাশে দেখা যায় আগুনের লেলিহান শিখা। হাজারো কণ্ঠের গর্জন ওঠে, ক্ষিপ্ত জনতা বিনয়বাবুর খড়ের পালুই এ্ আগুন লাগিয়েছে, বাড়ি চড়াও হয়েছে। ওরা এতদিন সহ্য করেছিল। আজ দুর্বার তেজে ফেটে পড়েছে। পুড়িয়ে শেষ করে দেবে সব কিছু।

—পান্নু!...ওই আগুনের দিকে চেয়ে আছে প্রাণগোপাল। মুখে চোখে তার কাঠিন্য! কি ভেবে দৌড়ল সে ওই দিকে।

এই সর্বনাশের রূপ দেখে সে ও শিউরে উঠেছে। এ সে চায়নি, একে সে সমর্থন করে না।

—থামাও। থামাও! ও চীৎকার করছে আর ছুটছে ওই দিকে।

বিনয়বাবু থর থর করে কাঁপছেন। নিজের সর্বনাশকে চোখের সামনে দেখে কঠিন স্বার্থপর মানুষটা আজ অসহায় বোধ করেন নিজেকে। সব কিছু তার ব্যর্থ হয়ে গেল। মিথ্যা হয়ে গেল এমনি করে।

জ্বলছে আগুনের শিখা। একটার পর একটা ধানের পালুই জ্বলছে। সাজানো ফুল গাছগুলো পুড়ে গেল। আগুনের তাপে পুকুরের মাছগুলো মরেছে। লাফ দিয়ে গরম জলে তারা ভেসে উঠেছে।

সব যাক, ওই বৈভব, ওই প্রতিষ্ঠা সব কিছু।

বিনয়বাবু সেই সর্বনাশকে দাঁড়িয়ে দেখবেন। প্রাণগোপাল ওই আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। হাজারো মানুষ সেই আগুন নেভাবার চেষ্টা করছে। গ্রামকে বাঁচাতে হবে।

—মানুষ বাঁচে। সর্বনাশের সঙ্গে যুদ্ধ করে সে মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা করে। বাঁচে কি আশা আর স্বপ্ন নিয়ে। দিন কেটে যায়, অমঙ্গলের দিন। আবার সব ভুলে নোতুন মানুষ এই পৃথিবীকে এর মানুষকে ভালোবাসে।

…কথাটা বলেছিল তারানাথ তর্কতীর্থ প্রাণগোপালের বিয়ের আসরে। নীলা আর প্রাণগোপালের পরনে আজ নোতুন পোশাক।

বেনারসী শাড়ি—কনে চন্দনে নীলাকে সুন্দর দেখাচ্ছে। যজ্ঞ বেদিতে আগুন জ্বলছে। হোমের পবিত্র অগ্নিশিখা

—ওঁ মম ব্রতে তু হৃদয়ং দদাতি।

তারানাথ বলে,

—যে শালগ্রামকে তুমি আস্তাকুড়ে ফেলেছিল পানু, তাকে বিশ্বাস আর প্রেমের মর্যাদায় আবার প্রতিষ্ঠিত করেছি আমি। সেই শিলারূপী সর্বংসহা নারায়ণকে সাক্ষীকরে তোমাদের বাঁচতে হবে।

…গ্রামের রূপ বদলেছে আবার। বিনয়বাবু ওই ঘটনার কয়েকদিন পরই হার্টফেল করে মারা যান। মৃত্যুর পর উইলে তার সব বিষয় টাকা দিয়ে গেছেন স্কুলকে আর নোতুন গড়ে ওঠা হাসপাতালকে।

…বলহরি এখন জেলে। গ্রামের বাতাসে আর সেই বিষাক্ত মদের গন্ধ নেই। বাতাসে ভেসে আসে বুড়ো বকুল গাছের মিষ্টি ফুলগন্ধ।

বিনয়বাবুর বিরাট বাড়িতে হাসপাতাল শুরু হয়েছে। সেই কুখ্যাত কাছারি বাড়ি পরিণত হয়েছে স্কুলে। হাজারো শিশু তরুণের কলরব ওঠে।

প্রাণগোপাল এখন অন্যতম কর্মকর্তা। শুভব্রত ও বাবার মৃত্যুর পর গ্রামে আসে এখন। আজ বিয়ের আসরে সেও এসেছে।

এসেছে বহু মানুষ। এ যেন নোতুন করে জীবনকে, সেই হারানো বিশ্বাসকে নিজের অন্তরে নোতুন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার দিন।

বুড়ি ললিতাও বেঁচে আছে। আজ সে মনে মনে খুশী হয়েছে। চোখের সামনে ফুটে ওঠে গৌসাই বাড়ির আগেকার সেই সমৃদ্ধির দিনগুলোর ছবি। যদু গোঁসাই বেঁচে থাকলে সুখী হতেন।

প্রাণগোপালের সাধনা ব্যর্থ হয়নি। নোতুন সাড়া সে এনেছে গ্রামে। মানুষগুলোর অন্তরে এনেছে আশার আলো।

বিশাখাও হারিয়ে যায়নি নরকের অতলে। সে আজ নাম করেছে।

রেডিওতে শুনেছে ললিতা তার কীর্তন; খুশী হয়েছে মনে মনে। লজ্জায় আসতে সে পারেনি এখানে। না আসুক।

তবু সুখে থাক সবাই।

জীবন শুধুমাত্র ব্যর্থতার বেদনাতেই ভরা নয়। এর উষর রুক্ষতার মাঝে মানুষ তবু তৃপ্তির সন্ধান পায়, বাঁচার সাধনা করে। ওরা তাই হারায়নি, হেরে যায়নি।

দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছে রমা, ওরা সুখী হোক। শান্তি নামুক এই গ্রাম সবুজে। শান্তিময় হোক এর আরক্তিম ধূলিকণা ফুলগন্ধময় বাতাস আর এ মাটির হতাশ্বাস মানুষগুলো। সেই বিরাট পাওয়ার হিসাবে রমার নিজের কোন চাওয়া নেই। তবু সে খুশী হবে।

সেই খুশীর সুর উঠছে আকাশ বাতাসে।

গান গাইছে অন্ধ মনু। আজ ওই অন্ধ মানুষটাও প্রাণের আবেগে ভরে উঠেছে। লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে আসে।

—পানু ভাই! আবার নোতুন গায়েন গাইবো ইবার। সরেশ গায়েন। সেই বিষ্টুর দুই আসমানে তোলা হাজার হাত ফুলে ওঠা বুকের ছাতি, সেই এগিয়ে চলার গায়েন, সেই ছবিটা ভুলিনি পানু ভাই। সেই এগিয়ে যাবার গান আবার গাইবো পানু। তোমরা এগিয়ে যাবে। বিষ্টু নাই, আমিও থাকবোনা সেদিন। তবু তোমাদের চলা থামবে না,—পথ বদলাবে তবু চলা থামবেনা।

অন্ধ মন্নুর কণ্ঠে সেই অতীতের হারানো স্থুর ওঠে,

—উষার দুয়ারে হানি আঘাত

আমরা আনিব নয়া প্রভাত।

আমরা ঘুচাব তিমির রাত

বাধার বিন্ধ্যাচল—

বৃদ্ধের চির তরুণ কণ্ঠস্বর সেই হারানো গৌরবের দিনকে আজ নোতুন অর্থবহ রূপে প্রকাশিত করে। আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে সেই সুর।

সমাপ্ত